অপরাজিতা

শক্তিপদ রাজগুরু

প্রভা প্রকাশনী

আবাহনী
১১, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া, নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর, উঃ ২৪ পরগনা

প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩

মুদ্রাকর :
অজিত দাস-ঘোষ
বাসন্তী প্রেস
৩৭, বিডন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

পলাশপুর মফঃস্বলের একটা সদর শহর। আগে এই পলাশপুর সদর শহর হলেও কিছুটা গ্রাম্য পরিবেশ ছিল। শহরটাতে তখন আজকের আধুনিক জীবনের ছাপ তেমন পড়েনি। ফাঁকা জায়গা ছিল অনেক। লালমাটি শালের জঙ্গল। অবশ্য শালবন ছিল শহরের কিছুটা দূরে, একটা পাহাড়ও দেখা যায় এখানের আকাশে হেলান দিয়ে রয়েছে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে পাহাড়ের বুকে শাল পিয়ালের বনও দেখা যায়।

ট্রেনলাইনটা গেছে শহরের পাশ দিয়ে। তখন কর্ডলাইন হওয়ায় সেই লাইনের গুরুত্ব তেমন ছিল না। দিনান্তে কয়েকজোড়া ট্রেন যাতায়াত করতো। পলাশপুর স্টেশনে নেমে এদিকের আশপাশ অঞ্চল থেকে আসা বেশ কিছু সাধারণ মানুষ, কোর্ট কাছারিতে, না হয় বাজারে তাদের কাজ সেরে আবার বিকেলের দিকেই তারা ফিরে যেতো। সোজা কলকাতা যাবার ট্রেন ছিল মাত্র দুখানা — একটা সকালের দিকে, অন্যটা রাতে। তখনই কিছু যাত্রী ব্যাবসায়ীদের ভিড় হতো। ওইসব ট্রেন চলে গেলে অন্ধকার হয়ে পড়তো পলাশপুর — অন্ধকারে শুধু জেগে থাকতো স্টেশনের দু-একটা বাস আর সিগন্যালের লাল আলো গুলো।

সদর শহর। তাই কোর্ট কাছারি তো ছিল। সেখানে আবার মামলার অভাব ছিল না। ফলে সিভিল - ক্রিমিনাল দুরকমই কেস কাছারি হতো এখানে। দূর গ্রামাঞ্চল থেকে মক্কেল - সাক্ষীদের নিয়ে অনেক পথ পার হয়ে আসতো কোর্টের আগের দিন। উকিল বাবুদের মধ্যে যাদের প্র্যাকটিশ বেশ চালু আছে তাদের সকলেরই বাড়ির বাইরে একটু জায়গা থাকতো। লম্বা টানা ঘর — তার লাগোয়া সেরেস্তা। মক্কেলদের থাকার ব্যাবস্থা ছিল ওই চালাঘরে। সেই সঙ্গে মক্কেলদের তালিম দেওয়া — কি কি বলতে হবে আগে তাও উকিল বাবু শিখিয়ে দেন — যাতে প্রতিপক্ষ উকিলের জেরায় তারা ভেঙে না পড়ে। কালীপদবাবু ছিলেন পলাশপুর কোর্টের নাম করা উকিল। বেশ দশাসই চেহারা। গোলমত মুখ — খাড়ার মত নাক আর তার গলার স্বরও ছিল তেমনি ওজনদার। তার গোলমুখে একজোড়া কাবলী বিড়ালের ল্যাজের মত পুরুষ্টু গোঁফ। তার হুঙ্কারে প্রতিপক্ষের সাজানো সাক্ষীর পিলে চমকে যেতো।

মফঃস্বলের কাছারিতে কাছারিতে যেমন উকিল মোক্তাররা থাকতেন — তেমনি থাকতো কিছু পেশাদার মিথ্যা সাক্ষী দেবার লোকও, নরহরি তাদেরই একজন। নরহরির ছিল কাছারির ওদিকে বটতলায় একটা চায়ের দোকান। অবশ্য দোকানে সে বসে না। দোকান চালাতো ওর ছোট ভাই ভজহরি। নরহরি উকিল বাবুদের দালালি করতো। সে

মাঝে মাছে গ্রামের দিকেও যেতো, বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোরে আর সেখান থেকে মক্কেলদের ধরে — তাদের জটিল সব মামলার নিস্পত্তি করে দেবে।

নরহরি এমনিতে বেশ বলিয়ে কইয়ে লোক। চেহারাটাও বেশ সুন্দর ছিল এককালে। পরে অবশ্য নেশাভাং করতো, আর ইদানিং সে গাঁজার নেশা করতো। নরহরির এই গুণকীর্তির কথা জেলার অনেক গ্রামেই ছড়ানো। নরহরি শুধুমাত্র মামলার জন্যই টো টো করে ঘুরতো না - সে অন্যদিকে ছিল ঐসব এলাকায় পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের লোক।

এদেশে স্বাধীনতার পর ঘোষিত হয় তাদের গ্রামে চিকিৎসা কেন্দ্র হবে। সরকার থেকে সেখানে ডাক্তার ওষুধ সবই পাওয়া যাবে। গ্রামের গরীব সাধারণ মানুষ সকলেরই উপকার হবে এই কথা ভেবে কেউ জমিও দেয়। সেখানে গড়ে ওঠে সুন্দর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডাক্তারের কোয়াটার - রোগীরাও আসে। ওষুধ পায়। কিন্তু এখন সেসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিণত হয়েছে পোড়ো বাড়িতে। দরজা জানলা কারা খুলে নিয়ে গেছে। অনেক গ্রীলও ভেঙে পড়েছে। ওযুধ আর পাওয়া যায় না। এখন ডাক্তার বলতে হাতুড়ে দু-চারজন। তাদের চিকিৎসাতে রোগ আর সারে না। যদি কেউ সারে তার বরাত জোর। নইলে মরেই যেতে হয় রোগীদের।

নরহরি সেবার গেছে কুসুম গ্রামে। সেখানে দত্তদের একটা বড় সম্পত্তি নিয়ে মামলা চলছে তাদের এক শাসাঁলো শরিকের সঙ্গে। নরহরি দত্তদের পক্ষে উকিল ফিট করেছে শহরের নামী উকিল কালীপদবাবুকে। মামলা এখন দত্তদের দিকেই ঝুলে আছে। তাই নরহরি এসেছে দত্তবাবুর কাছে মামলার খবর নিয়ে। সামনের সপ্তাহে মামলার দিন পড়েছে। দত্তমশাইয়ের সাক্ষীর সংখ্যাও অনেক। তাই তাদের তাড়াও দিতে হবে। নরহরি এসেছে দত্তমশাইয়ের কাছে ওই সব খবর নিয়ে আর সেই দিনই গ্রামের বড় ব্যবসায়ী হরিশবাবুর দাদার অর্থ্যাৎ তাদের বাড়ির কর্তার খুব অসুখ। গ্রামের রমেন ডাক্তার দেখছিল, অসুখের বাড়াবাড়ি দেখে সে ও হাল ছেড়ে দিয়েছে। বলে —

সদরে বড় ডাক্তার কিরণ বাবুকেই কল দ্যান। কেস সুবিধার বুঝছি না। দূর গ্রাম, রাস্তা একটা আগে হয়েছিল। এখন সেই রাস্তাটা অবশ্য আছে তবে মেরামতের অভাবে প্রায় দুর্গম হয়ে উঠেছে। হরিশবাবুরাও ধনী লোক। দাদার চেষ্টাতেই এত বাড়বাড়ন্ত। তার চিকিৎসার জন্য ওরা খরচ করার কার্পণ্য করবে না। কিন্তু কিরণবাবু শহরের সবচেয়ে নামী ডাক্তার। বয়স কম — সবে কলকাতা থেকে পাশ করে তাদের বাড়ি যেখানে সেখানে প্র্যাকটিস করছে। তবে তিনি নাকি একেবারে ধন্বন্তরী। রোগীদের শুধু চোখ দেখেই ওষুধ দেন। আর সেই ওষুধ নাকি অব্যর্থ।

এই ক'বছরেই এখন শহরের সেরা ডাক্তারে পরিণত হয়েছে। আর এখন তার

ভিজিট শহরেই নাকি একশো টাকা আর গ্রামের দিকে কল এলে নিদেন পক্ষে পাঁচশো টাকা - তারপর গাড়ির তেল, ড্রাইভার খরচ আলাদা। তবে তিনি সহজে নাকি গ্রামের দিকে আসতে চাননা।

দত্তমশাইয়ের বন্ধু হরিশবাবু। বন্ধুর বিপদে দত্তমশাইও চিন্তিত হন। নরহরিও সেদিন এসেছে দত্তমশাইয়ের কাছে। সে সব শুনে বলে,

— এত ভাবছেন কেন? কিরণ ডাক্তারকে আমি নিয়ে আসছি — তবে জানেন তো টাকার খাই। নামকরা ডাক্তার — সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। টাকাতো চাইবেই।

নরহরি শুধু মামলার জন্য ডাক্তারদের চামচেগিরি করেনা। সে শহরের নামী ডাক্তারদের জন্যও মফঃস্বলের রোগীদের নিয়ে যায় আর দুপক্ষের কাছ থেকেই সে কমিশন পায়। নানা পথেই নরহরি কিঞ্চিৎ উপার্জন করে এইসব পরোপকার করে।

দত্তমশাই বলেন,

— সে কি হে নরহরি! তুমি পারবে কিরণবাবুকে আনতে?

নরহ্যর বলে,

— আপনাদের বাপমায়ের আশীর্বাদে শহরে আমার চেনাজানা কয়েকজন আছে দত্তমশাই। আমি আজই যাচ্ছি — সকালে কিরণবাবুর চেম্বার শেষ হলেই দুপুরে খাওয়ার পর ওকে আনবোই। তবে — আর কি বলতে যাচ্ছিল নরহরি।

হরিশবাবু ব্যবসায়ী লোক। লোকের মুখ দেখে তিনি মানুষ চিনতে পারেন। আর হাঁ করলে তার কথাও জানতে পারেন। হরিশবাবু শ''পাঁচেক টাকা নরহরির হাতে দিয়ে বলে,

— ডাক্তারবাবুকে ধরেই আনুন। যা টাকা চাইবেন তাই দেব।

নগদ পাঁচশো টাকা পেয়ে নরহরি বেরিয়ে পড়ে। শহরের বড় রাস্তার ওদিকেই বড় একটা দিঘী। তার ওপারেই উকিল পাড়া। শহরের ছোট বড় মাঝারী মাপের উকিলদের বসবাস ওদিকেই। ওদিকটাকে তাই উকিল পাড়া বলে। আর শহরে অন্যদিকে একটা ছোট নদী বয়ে গেছে। নদীতে অন্যসময় সামান্য একটু জলধারা তির্ তির্ করে বয়ে যায়। পড়ে থাকে শূণ্য বালুচর — শহরের এপাশটা কিছুটা ফাঁকা আছে। ওপাশে সদর হাসপাতাল — এদিকে বেশ কিছু ডাক্তারের বাড়ি।

এই শহরে কালীপদ যেমন নামী উকিল তেমন ডাক্তারের মধ্যে কিরণবাবুও বেশ রাশভারী চিকিৎসক। ওর বাবাও ছিলেন ডাক্তার। এখনও দূর গ্রামের লোক এম বি মদন ডাক্তারেব নাম জানে। ওই মদনবাবুই ছিলেন তখনকার দিনে কয়েকজন এম বি ডাক্তারের অন্যতম। তখন সবাই ছিলেন এল-এম এফ। অনেকে তাদের বলতো লম্ফ ডাক্তার। সেই মদনবাবু তখনকার দিনে ডাক্তারি করে প্রভূত অর্থ, বাড়ি, বাগান, ব্যাঙ্কে টাকা এসব করে

ছিলেন। আর একমাত্র সন্তান কিরণকেও তিনি ডাক্তার বানিয়েছিলেন। ছেলে পড়াশোনাতেও ভাল ছিল। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ভয়ানক জেদী। অবশ্য কিরণবাবু ওটা পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সুত্রেই। তার বাবা মদন ডাক্তারও ছিল ভীষণ জেদী। একগুঁয়ে সাধারণ মানুষ। নিত্যপূজা করতেন, ঈশ্বরবিশ্বাসী লোক। তার স্ত্রী মিনতি দেবী একবারে ওর বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। নিরীহ কম কথা বলেন।

কিন্তু তাদের একমাত্র সন্তান কিরণ মায়ের মত মোটেই শান্ত ও ভদ্র নয়। সে বাবার চেয়েও একগুঁয়ে ও ধর্মাচরণেও বেশী গোঁড়া। কিরণ এম বি বি এস পাশ করে আসার পর মদনবাবু ওর বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছেন। মদনবাবুর ও বয়স হয়েছে। একছেলে কিরণই বাবার চেম্বারের পাশে নতুন চেম্বার করে বসে। আর দুচারটে জটিল কেস ওর চিকিৎসার গুণে সেরে উঠতে তারও নাম প্রচার হতে শুরু করে। মদনবাবুরও শরীর ভেঙে পড়েছে। ছেলের বিয়ে থা দিয়ে এবার তার রাজ্যপাট সারা এলাকার এমনকি আশেপাশের জেলায় তার রুগিদের ভার ছেলের হাতে তুলে দিয়ে নিজে বিশ্রাম নিতে চান। এমন দিনে শহরের নবু ঘটকই একটি সুপাত্রীর সন্ধান আনে। পাত্রীর বাবা কালীপদবাবু শহরের প্রধান উকিলদের অন্যতম। বয়স হয়েছে। তবুও এখনও তিনি দাপটের সঙ্গে ওকালতি করছেন।

তার ওজনও কম নয়। ওকালতি করে নিজের বিশাল বাড়ি করেছেন। আর শহরের অদুরেই নদীর ধারে সুন্দর ফার্মও করেছেন। একটা অস্টিন গাড়িতে চড়ে কোর্টে যান — তার মেয়ে লবঙ্গলতিকার জন্যও উকিলবাবু একজন সুপাত্রের সন্ধান করছেন। নবু ঘটক শহরের পরিচিত ঘটক। আর তার আসল পেশা কোর্টের মুহুরী। সেই সম্বন্ধটা এনেছিল।

মদনবাবুর স্ত্রী মিনতিদেবীও এই শহরেরই মেয়ে। তার বাবাও ছিল উকিল। তার ছেলেবেলা কেটেছে ওই উকিল পাড়াতেই। এখনও তার দাদা থাকে ওদিকেই। তাই নির্মলা ও পাড়ার খবর ও রাখে। কালীপদবাবুর মেয়ে লবঙ্গলতিকাকেও দেখেছে সে। কালীপদবাবু এমনিতে মোটা সোটা ধরনের চেহরার মানুষ। তার গিন্নীও বেশ ওজনদার মহিলা — আর তাদের মেয়ে এমনিতেই ছোটখাটো চলমান ঢিবি। সুতরাং বয়সকালে সে যে পাহাড় হবে তা নিঃসন্দেহ। আর তেমনি ডানপিটে। এখন স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে পড়ছে। পথ দিয়ে সে যখন যায় তখন মাটি কেঁপে ওঠে আর তেমনি রুক্ষ মেজাজ সেই মেয়ের।

সেবার রকে বসা কিছু ছেলে তাকে 'বেবি এলিফ্যান্ট' বলে ছিল, মানে বাচ্চা হাতি। লবঙ্গলতিকা চটে গিয়ে একটা ছেলেকে এইসা চড় মেরেছিল যে ছেলেটা রক থেকে ছিটকে পড়ে ড্রেনে। কপাল ফেটে গেছিল। ছেলেটার বাবা ছিল টাউন থানার দারোগা। দারোগাবাবু ছেলের রক্তপাত দেখে এফ আই আর করে পুলিশ নিয়ে কলেজ থেকে লবঙ্গলতিকাকে এ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে যায়।

আর তারপরই যেন মৌচাকে ঢিল পড়ে। কালীপদ উকিল ও দুঁদে উকিল — তার মেয়েকে ইভটিজিং করবে, আর মেয়েরা প্রতিবাদ করলে পুলিশ এ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে যাবে? কালীপদ উকিলও মেয়েকে কোর্ট থেকে জামিনে ছাড়িয়ে এনে নিজে পুলিশে রিপোর্ট করে ইভটিজিং এর জন্য সেই দারোগানন্দন এর বিরুদ্ধে। তাকে এবার কোর্টে টেনে আনে। সারা শহরে ঢি ঢি পড়ে যায়। কলেজে মেয়েরাও এবার মিটিং মিছিল শুরু করে ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে। ওই পুলিশনন্দনের এই অত্যাচারের জন্য আন্দোলনও শুরু করে। মাঠে ময়দানে জনতার জমায়েত হয়। সেখানে লবঙ্গলতিকা তার বিপুল বপু নিয়ে শূণ্যে হাত তুলে ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ এর ভঙ্গীতে লেক্‌চার দেয়। লবঙ্গলতিকার উদাত্ত কণ্ঠস্বর আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তি, নারীর অধিকার কায়েম করতে সে নাকি তার দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দান করে দেবে। শহরে তিনচার খানা সাপ্তাহিক পত্রিকাও বের হয়। তাতে সরকারী কিছু বিজ্ঞপ্তি আর ঝরঝরে কিছু দোকানের বিজ্ঞাপন আর সামান্য দুএকটা খবর থাকে, সেই কাগজওয়ালারা নারী স্বাধীনতার অগ্রণী মহিলা হিসাবে লবঙ্গলতিকাকে তুলে ধরে।

এমন জবরদস্ত দারোগাকেই হিমসিম খাইয়ে দেয় লবঙ্গলতিকা স্রেফ হাঁক ডাক করে। তার জ্বালাময়ী ভাষণ গুলোও ছাপানো হয়েছে পত্রিকায়। দারোগা এখন কেঁচো হয়ে গেছে। উলটে তার ছেলেরই না সাজা হয়ে যায়। ছেলেটা বাবার তদ্বিরে সবে চাকরীতে ঢুকেছে সহকারী ইঞ্জিনীয়ার হয়ে। ছেলেটা এমনিতে ভালো, হয়তো ওই দেহ দেখে মুখ ফসকে কথাটা বলে ফেলেছিল।

দারোগাবাবুও ভেবেছে কথাটা। পালটি ঘর — দারোগাবাবুও দারোগাগিরি করে ইদানিং একটা বাড়ি করেছে। এদিক ওদিকে বেশ কিছু জমিজমাও কিনে রেখেছে। ক্যাশও ভালই রয়েছে — একমাত্র ছেলে। দারোগাবাবু নিজে একদিন কালীপদবাবুর বাড়ি যান স্ত্রীকে নিয়ে। কালীপদবাবু এখন মেয়ের কেস লড়ছেন। তাই প্রতিবাদী পক্ষকে বাড়িতে দেখে বলেন,

— কি প্রয়োজন? কেন এসেছেন এখানে?

লবঙ্গলতিকা তখন তার ঘরে। দুতিনটে মেয়েকে নিয়ে পরবর্তী মিটিং এর দিন স্থির করছে। কি ভাষণ দেবে তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এসময় সে দেখে আসামীর বাবা মা এসেছেন তাদের বাড়িতে। কালীপদবাবুর ওইরকম আপ্যায়ন দেখে কালীবাবুর স্ত্রী স্বামীকে বলে,

— একি গো? ওনারা এসেছেন বাড়িতে। ভদ্রলোকের বাড়িতে ভদ্রলোকইতো আসবে।

কালীবাবু গোঁফ নাড়া দিয়ে গর্জন করে,

— এটা ভদ্রলোকের বাড়ি তা মানছি। কিন্তু ওরা আদৌ ভদ্রলোক নয় তা জানি বলেই বলছি।

কালীবাবুর স্ত্রী তবু ওদের এনে বসায়। দারোগাবাবু বলেন,

— কালীবাবু আমি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। যা হবার তা হয়ে গেছে। এসব কথা ভুলে যাদের জন্য এই ভুল বোঝাবুঝি তাদের মধ্যে গোলমালটা মিটিয়ে দিই। ব্যস, সবকিছু মিটমাট হয়ে যাবে শান্তিতে।

কালীবাবু প্রশ্ন করেন, — মানে?

আমার ছেলেও টেকনিক্যাল ডিপ্লোমাধারী। এখন এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে। এসব চাকরীতে ইয়ে মানে বাড়তি ইনকামও আছে — ও আমার একমাত্র সন্তান। কলকাতায় সম্প্রতি বাড়ি করছি।

কালীবাবু গর্জে ওঠেন বুনো মোষের মতো।

— মানে? বড়লোকী দেখাতে এসেছেন আমাকে?

— না - না। দুই পরিবারকে নিয়ে শহরে অনেক কথা উঠেছে। তাই ভাবছি যদি আমার ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেন তাহলে সব ঝামেলার শেষ হয়ে যাবে।

কালীপদবাবু গর্জে ওঠেন।

— কি বললেন? বিয়ে দেব আমার মেয়ের আপনার ওই ফড়িং মার্কা ছেলের সঙ্গে। আর টাকা বাড়ি দেখাচ্ছেন কালীপদ উকিল কে।

দারোগাবাবু এতকাল লোককে শাসিয়ে গর্জিয়ে এসেছেন। কিন্তু কালীপদবাবুর মত লোকের পাল্লায় পড়েননি। কালীবাবু তখন গলা সপ্তমে তুলেছেন। গোঁফগুলো রাগে বিড়ালের মত ফুলে আছে। ওর স্ত্রী আর ওকে থামাতে পারে না। কালীবাবু গর্জন করে।

— ব্যস কথা শেষ হয়েছে। এবার আসুন দারোগবাবু। উঠুন — আমার মেয়েকে ট্যাপ করে কৌশলে ঐ হাজতের প্রতিশোধ নেবার মতলব। আপনার মত ঘুঘু দারোগার অনেক প্যান্টলুন খুলেছি আদালতে - যান। যান।

ওদের বের করে দেয় বাড়ি থেকে। এবার ওই কালীবাবুর স্ত্রী ঘরে ঢুকে হায় হায় করে ওঠে। একটা ভালো সম্বন্ধ যেচে এসেছিল — আর ছেলেটাও সরকারী চাকরী করে। পণ বা অন্য কিছু দাবী দাওয়াও ছিল না। মেয়েটার বিয়ে হয়ে যেত। তা ওসব না ভেবে, কালীবাবু এমন সুপাত্রকে ঘর থেকে তাড়ালো। শহরময় নানা কথা উঠেছে মেয়ের নামে। মাও চায়না যে লবঙ্গলতিকা শহর দাপিয়ে মিটিং করে বেড়াক। কাগজে তার নাম ছাপা হোক তেজস্বিনী মেয়ে বলে। আজ তাই কালীবাবুর স্ত্রী বলে স্বামীকে,

— হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে, একটা সুপাত্র যেচে এল আর তাড়ালে তাদের।

কালীপদবাবু বলে,

— ওদের চেননা? ব্যাটা দারোগার বাচ্চা এসেছিল একটা মতলব নিয়ে। লবঙ্গের কেসের শাস্তি ওকে দেবোই — একটা কেসে জিততে পারলে একশো টাকা ফিস বাড়াতে পারবো।

লবঙ্গও এবার আসরে নামে। সে বলে,

— বাবা ঠিকই করেছে মা।

— যেমন বাপ তার তেমন মেয়ে। তুমি এবার শহরে ধ্বজা ওড়াবে। বলি বিয়ে থা আর কেউ করবে, তোমার মত জাঁদরেল মেয়ের ঘর বর হবে?

কালীপদ উকিল দেখেছে মেয়েকে বেশ গরম গরম ভাষণ দিতে। মেয়েটার ব্যক্তিত্ব আছে। খোদ দারোগাকেও হিমসিম খাইয়ে দিয়েছে। কালীবাবুও ভেবেছে কথাটা। শহরের কাছারিতে অনেক উকিল আছে একটাও লেডি উকিল নেই। আর কালীবাবু বলে,

— বিয়ে থা না হয় না হবে।

— তাহলে কি করবে তোমার ঐ তেজস্বিনী মেয়ে।

— লবঙ্গকে আমি ল'কলেজে ভর্তি করবো। ওকে আমি ল'পড়াবো। আইন পাশ করে ও হবে আমার জুনিয়র। আমি ওকে তালিম দিয়ে আইনের ফাঁক ফোকর সব শিখিয়ে দেব। লবঙ্গ হবে পলাশপুর বার এর নাম করা মহিলা উকিল। ওর জেরার সামনে সকলের প্যান্টালুন হলুদ হয়ে যাবে। আর জজ ব্যারিস্টাররা ওকে সমীহ করে চলবে। কথাটা লবঙ্গ ও মনে করে। অবশ্য গিন্নী তখনও ফুঁসছে।

— নিজেতো আদালতে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলে দাগী চোর ডাকাতদের প্রশ্রয় দাও। তাদের খালাস করে মহাপাপ করো। ভালো মানুষের সর্বনাশ করো। এবারে মেয়েকেও সেই পূর্ণ্যকর্ম করাতে চাও।

কালীবাবুর গিন্নী সুপাত্র হাতছাড়া হওয়ার দুঃখটা বেশী অনুভব করে। আর এটা হলে ঐ মামলার ব্যাপারটা চুকে যেত। কিন্তু তা হয়নি। মামলা শেষ অবধি গড়িয়েছে। জজ সাহেবও দেখে একদিকে ওই তরুণী রায়বাঘিনীর বিরাট দেহ অন্যদিকে ছোটখাটো একটা নিপাট নিরীহ ছেলে। কপালে এখনও ব্যান্ডেজ রয়েছে। ওর শাস্তি আগেই হয়ে গেছে। মেয়েটাই ওকে শাস্তি দিয়েছে। জজসাহেব প্রকাশ্যে আদালতে ছেলেটাকে মেয়েটার কাছে মাফ চাইতে বলেন। ছেলেটাও মাফ চায়। জজসাহেব কেস ডিসমিস করে দিতে এবার কালীবাবু বাইরে এসে ফুঁসে ওঠেন,

— সাজা হল না কেন? আমি আপীল করবো।

অবশ্য তার জুনিয়র বলে,

— স্যার। এই জজসাহেবের এজলাসে আমাদের অনেকগুলো কেস চলছে। ওকে চটানো কি ঠিক হবে? ওর রায়ের বিরুদ্ধে হায়ার কোর্টে গেলে উনি যদি পরে আমাদের কেসগুলোর ব্যাপারে —

কালীপদবাবু সাবধানী লোক। সে বুঝেছে জলে বাস করে কুমীরের সাথে বিবাদ করাটা ঠিক হবে না। আর তাছাড়া ঐ কেসের পর দারোগাও চেষ্টাচরিত্তি করে ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেছে এখান থেকে। শত্রুর নিপাত হয়ে গেছে। তাই কালীবাবু আপাততঃ রণে ভঙ্গ দিয়ে অন্য কাজে মন দেন। তবে তার কথা সে রেখেছে।

লবঙ্গ বি. এ. পাশ করার পর ল'কলেজে ওকে পড়াতে পঠিয়েছে কালীপদ বাবু। গিন্নীও বাধা দেয়। কিন্তু কালীপদবাবু বলেন,

— মেয়ের ফিউচারের জন্য ভাবতে হবে না।

লবঙ্গও বলে,

— তাই পড়বো বাবা। উকিলই হবো।

কালীবাবু বলে,

— সেই সঙ্গে একটু দলটল করবি। যে দলের পালে বেশী হাওয়া সেই দলেই ভিড়ে গিয়ে একবার যদি এম. এল. এ. হতে পারিস। মহিলা কোটায় মন্ত্রীত্ব তোর বাঁধা। আর একবার মন্ত্রী হতে পারলে জীবনে আর কিছু করতে হবে না। পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাবি।

লবঙ্গলতিকা ও অন্য মেয়েদের মত স্বামীর ঘরে বন্দী হয়ে নিজের জীবনকে বরবাদ করতে চায় না। সে যুগপৎ উকিল কাম লীডার অর্থ্যাৎ টু-ইন-ওয়ান হতেই চায়। তাই ল'পড়তে কলকাতায় চলে যায়। ওখানে লেডিজ হোস্টেলে থেকে ল'পড়ার ব্যাবস্থাও পাকা হয়ে গেছে।

মদন ডাক্তারের স্ত্রী মিনতিদেবী মাঝে মাঝে তার বাপের বাড়িতেও আসে। তার এক ভাই ডাক্তার, সে মিলিটারীতে চাকরী নিয়ে মিলিটারী হাসপাতালে রয়েছে। মিনতিদেবী এলাকার খবর রাখে। মাঝে মাঝে আসেও। সেদিন কালীবাবুর বাড়িতে কি যেন উৎসবের আয়োজন হয়েছে। মিনতিদেবীও এসেছে। সে দেখে কালীপদ মেয়েকে স্টেশন থেকে আনছে। মেয়ে ল'পাশ করে উকিল হয়ে ফিরছে। আজই কালীপদ উকিল ওকে বার কাউন্সিলে নিয়ে গিয়ে ঘটা করে নাম রেজিস্ট্রি করিয়ে আনছে।

সেইজন্যই বাড়িতে উৎসবের আয়োজন। মিনতিদেবীও দূর থেকে দেখে লবঙ্গ লতিকাকে। গাড়ি থেকে নামছে সে — দেহ এখন আরো বিপুলাকার হয়ে বর্তুলাকার হয়েছে। ওই জাঁদরেল মহিলা এবার বার কাঁপিয়ে ওকালতি করবে। কালীবাবুর বাড়িতে

শাঁখ বাজছে। মিনতির সারা গা জ্বলে ওঠে ওইসব দেখে। মেয়ে বড় হচ্ছে বিয়ে থা দিয়ে সংসারী কর তা নয় ওকে নিয়ে আদিখ্যেতা।

কালীপদবাবুর গৃহিনীও চটে ওঠে স্বামীর এসব কান্ড দেখে। সে চেয়েছিল মেয়ে বিয়েথা করে ঘরসংসার করুক। এখনও তবু বিয়ের বয়স আছে এরপর আরও বিপুলাকার হলে সব পাত্রই মেয়ে দেখে ভয়ে পালিয়ে যাবে।

মদন ডাক্তারের ছেলে কিরণও এম. বি. বি. এস. পাশ করে এই শহরেই এসেছে তাদের বাড়িতে। ডাক্তার হিসাবে তার এখন বিরাট নাম। ছেলে হিসাবেও সে ভালো, ভদ্র, বিনয়ী। তবে জেদ চেপে গেলে তার অন্য মুর্তি। কিরণ এর গুণও কিছু আছে। পরোপকারী সে, একেবারে পেশাদার ডাক্তার হতে পারেনি সে। আর তার সেই প্রয়োজনও নেই।

মিনতিদেবীও তার বাপের বাড়ির প্রভূত সম্পত্তি পেয়েছেন। শহরের একটা বড় বাজার এসেছে তাদের দখলে। তার আয়পয়ও কম নয়। আর মদনবাবু সারা জীবন ডাক্তারি করে কম রোজগার করেননি। নিজে সেকালের একটা হুডখোলা অস্টিন গাড়িতে চড়েন। ওটাই তার পয়মন্ত গাড়ি। ওই গাড়ির দৌলতেই নাকি তার এসব হয়েছে।

অবশ্য ছেলের জন্য তিনি নতুন মডেলের গাড়ি কিনে দিয়েছেন প্রচুর টাকা খরচ করে। সেই গাড়িতে কিরণ চড়ে। মদনবাবু চড়েন তার সেই সাবেকি আমলের গাড়িতে। শহরে কিরণ তরুণ মহলের মধ্যে নামডাক করেছে। শহরের দুচারটে ক্লাবের সঙ্গেও জড়িত সে। সেখানে চক্ষু অপারেশন — স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির — কখনও রক্তদান শিবির - এর আয়োজনও করা হয়।

কিরণ সেদিন শহরের একটা ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গেছে। শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও এসেছেন। কিরণ মঞ্চে বসে। সে এলাকায় [illegible] জনসেবামূলক কাজকর্ম করে। তারই স্বীকৃতি হিসাবে সেদিন তাকে সম্বর্দ্ধনা জা[illegible]বে। কিরণ দেখে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছে লবঙ্গলতিকাও। সে এখন উকিল। যেমন [illegible] চেহারা আর তেমনি উদাত্ত কণ্ঠস্বর। আড়াল থেকে ওর কণ্ঠস্বর শুনলে মনে হ[illegible] পুরু[illegible] কণ্ঠস্বর। সে শূন্যে হাত তুলে পুরুষদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে চলেছে। স্বার্থপর পুরুষ সমাজ আজকের নারী স্বাধীনতার সংগ্রামকে ব্যহত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে চলেছে — লবঙ্গলতিকা তাদের ঐ হাত গুঁড়িয়ে দিতে চায়।

কিরণ শুনছে তার ভাষণ। তার মনে হয় লবঙ্গ যেন পুরুষ জাতির মুন্ডপাত করতেই জন্মেছে। মেয়েরাও চড়চড় করে হাততালি দেয়। মিটিং - এর পর ক্লাবের ঘরে বিশেষ অতিথিদের জলপানিরও আয়োজন করা হয়েছে। মঞ্চে তখন নাচ গান চলছে। লবঙ্গ-

লতিকা কিরণকে দেখছে। বলে,

— মেয়েদের জন্য চিকিৎসার বিশেষ কিছু ব্যবস্থা শহরে আছে?

— কেন থাকবে না?

— ছাই আছে। আমি এবার আন্দোলন করবো মেয়েদের জন্য কম ফিজ নিতে হবে। ওই লোভী ডাক্তারদের চেম্বার অবরোধ করা হবে। কিরণ বুঝতে পারে এ মেয়েটা কেবল লড়াই করতে চায়। লবঙ্গ গজরায়।

— আমি নারী বাহিনী নিয়ে এবার ওই ডাক্তারদের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করবো। দরকার হলে নাম ধরে কোর্টে কেস করবো।

কিরণ এসেছিল হালকা মন নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসরে। ওই বিপুল আকার মহিলার শাসানিতে সে ও মনে মনে রেগে উঠেছে। সেই রাগ চেপে বেরিয়ে আসে।

মদন ডাক্তারের কাছে তখন নবু ঘটক ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করেছে। মদনবাবুও চান ছেলে কিরণের বিয়ে থা দিয়ে তাকে সংসারী করতে। এদিকে কালীপদবাবু মেয়েকে এক নম্বর উকিল বানাতে চান, তার জন্য ডাকাত - গুন্ডা - মস্তানদের কেসে দাঁড় করিয়েছেন লবঙ্গকে। লবঙ্গও এজলাসে লড়াই করছে।

কালীপদবাবুর স্ত্রীর এসব ভালো লাগে না। দেখে বাইরের ঘরে শহরের যত মস্তান গুন্ডাদের ভিড়। লবঙ্গ তাদের কেস নেয়। তাদের গুন্ডামিকে আইনতঃ স্বীকৃতি দেবার জন্যই যেন আইন খুঁজছে। তার কাছে আসে শহরের বেশ কিছু বুদ্ধিজীবি নেতা। তারাও ওইসব মস্তানদের আশ্রয় দাতা। তারাই চায় লবঙ্গের কাছে আইনী সাহায্য।

কালীপদবাবুর স্ত্রী বলেন,

— তোমার মেয়ে ওসব গুন্ডা মস্তানদের দলে নাম লিখিয়ে শহরের ফুলনদেবী হবে? ছিঃ ছিঃ —

কালীপদ বলে,

— ওকে আমি ফৌজদারী কেসের নাম্বার ওয়ান উকিল বানাবো।

— না। ওকে বিয়ে - থা দাও। একমাত্র মেয়ে আমাদের কি বংশও থাকবে না। জল পিন্ডি কে দেবে তোমাকে?

এবার তার ওই মাংসল দেহের মধ্যেকার হৃদয় নামক বস্তুটাতে কেমন সাড়া জাগে। হাজার হোক সেও একজন মেয়ে। সেও চায় একজনকে ভালোবাসতে। অনেক মুখের ভিড় তার মনে আসে। সেই ফড়িং মার্কা চেহরার দারোগার ছেলে এখন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তখন লবঙ্গের মনে হয় সেও এবার ঘর সংসার করবে, ওসব করেই

ওকালতি - দেশসেবা - নারীমুক্তি আন্দোলনের কাজও চালিয়ে যাবে।

লবঙ্গ কিরণকেও দেখেছে। তার সঙ্গে কথাও বলেছে, তারও মনে হয় সেদিন কিরণকে ওভাবে শাসানো তার ঠিক হয়নি। সেদিনও একটা মিটিং-এ দেখা হয়ে যায় লবঙ্গে-র কিরণের সাথে। কিরণ অবশ্য ওই মহিলা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। তাই কিরণ মঞ্চে ভাষণ দিয়েই নেমে আসে। লবঙ্গও আজ চায় কিরণের সাথে একটু নম্র ভাবে কথা বলতে। কিরণ আজ ওর গাড়িটা আনেনি। লবঙ্গ প্ল্যান করে ওকে আজ নিজে তার বাড়িতে পৌঁছে দেবে।

ততক্ষণে লবঙ্গের ভাষণ শুরু হয়ে গেছে। আর শ্রোতারাও আজ অবাক হয়। লবঙ্গের ভাষণে সেই তেজোদৃপ্ত ভঙ্গী, সেই জোর আজ নেই। বরং সে মেয়েদের কর্তব্যপরায়ণা হবার জন্য আহ্বান করে। সমাজকে সুখী করতে মেয়েদেরও যে অনেক কিছু করার আছে, তাদেরও হাসিমুখে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এসব কথাই বলে।

লবঙ্গ লক্ষ্য করে অন্যদিন তার ভাষণে ঘন ঘন হাততালি পড়ে — হল গরম হয়ে ওঠে। আজ আর তার বক্তৃতা তেমন জমে না। লবঙ্গের মনে আজ অন্য সুর বাজে। যে সুরটা লবঙ্গের নিজেরই অজানা। ভাষণ শেষ হয়,

— হুঁ তাইতো। এবার কালীবাবুরও হুঁস হয়।

— ওকে এই শহরের কোন ভালো ছেলের সাথেই বিয়ে - থা দাও। তাহলে লবঙ্গ এই শহরেই থাকবে — কোর্টে ওকালতি করতে পারবে। এখন বিয়ে - থা ঘর সংসার করেও তো অফিস কাছারি করে। তোমার মেয়েও তাই করবে।

কালীবাবুও কথাটা এবার ভাবছেন। বলেন,

— তেমন সুপাত্র কোথায় পাব?

তার স্ত্রী বলেন,

— তার সন্ধান করছে নবু ঘটক। ওকেই সব জিজ্ঞাসা করো। তারপর ছেলে পছন্দ হলে মেয়ের বিয়ে দাও।

সেইমত কালীবাবু নবু ঘটককেও ডেকেছে আর তার মুখে সেই সুপাত্রের খবরও পায়। কালীবাবু মদন ডাক্তারকে চেনে। শহরের নামী ডাক্তার। তার ছেলে কিরণকেও দেখেছে। নতুন একটা গাড়ি হাঁকিয়ে মাঝে মাঝে শহরের রোগী দেখে না হয় কোন ক্লাবের অনুষ্ঠানে যাতায়াত করে। সব বিবেচনা করে কালীবাবুও মত দেয় বলে স্ত্রীকে,

— না ঠিকই বলেছ তুমি। ছেলেটা ভালোই। ওর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ডাক্তার হিসাবে ওর বেশ সুনামও হয়েছে এর মধ্যে।

— এবার মেয়েকেও বলো। একবারতো সেই দারোগাবাবুর ইঞ্জিনীয়ার ছেলেকে তাড়ালো। অবশ্য সে ছেলে এখন ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে, গাড়ি নিয়ে ঘোরে। সেদিন হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছিলে। এবার মেয়েকে মাথা ঠান্ডা করে চলতে বলো।

মায়ের কথাগুলো পাশের ঘর থেকে লবঙ্গও শুনছে। লবঙ্গ সেদিন মঞ্চ থেকে নেমে কিরণের খোঁজ করে। কিন্তু কিরণ তার আগেই যেন লবঙ্গের হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য একটা রিক্সা ডেকে তাতে করেই পালিয়েছে।

একজন বলে,

— কিরণবাবুতো আগেই চলে গেছেন।

লবঙ্গলতিকা আজ রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। রাগও হয় কিরণের উপর। আজ তাকে খুশী করার জন্যই লবঙ্গ তার ভাষণের রীতিও বদলেছে। নিজের বৈশিষ্টকে বিসর্জন দিয়েছিল। স্বপ্ন দেখেছিল লবঙ্গ এই চাঁদনী রাতে সে আর কিরণ গাড়ি নিয়ে নির্জন নদীর বালুচরে গিয়ে পাশাপাশি বসবে। লবঙ্গের বঞ্চিত মন আজ কিরণকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু কিরণ লবঙ্গের সেই চাওয়ার কথাটাও ভাবেনি — লবঙ্গকে সে এড়িয়ে গেছে ইচ্ছে করেই। এটা আজ লবঙ্গের কাছে অপমানেব ব্যাপার বলেই মনে হয়। লবঙ্গ দুঃসহ রাগে জ্বলতে জ্বলতে নিজের গাড়িতে গিয়ে ওঠে।

কিরণ সেদিন সন্ধ্যেবেলায় লবঙ্গের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল। কিন্তু ওদিকে মদন ডাক্তারের কাছে সেইদিন কালীবাবু নিজেই আসে। মদন ডাক্তার কালীবাবুকে বেশ খাতির করেই বসায়। হাজার হোক ভাবী কুটুম্ব, জলখাবারের প্লেটও আসে। কালীবাবুও ভোজনরসিক ব্যক্তি, মিনতিদেবীও এসেছেন। তার ব্যপারটা ভালো লাগে না। লবঙ্গ এ বাড়ির বৌ হয়ে এলে তার মত নিরীহ শাশুড়ির কি অবস্থা হবে সেটা ভেবেই ঘাবড়ে গেছে সে।

কিন্তু মদন ডাক্তার যখন কথা বলতে চায় তখন স্ত্রীর মৃদু আপত্তি ছাড়া আর কিছুই করার নেই। তবু মিনতি বলে,

— ওই কোর্ট কাছারি করা একটা বিশাল মেয়েকে কিরণের বৌ করে আনবে? যদি পরে কোন গোলমাল হয়?

মদন ডাক্তার বলে,

— না - না। লবঙ্গলতিকা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সেদিন তো মিটিংএ মেয়েদের কর্তব্য — সংসারের দায়বদ্ধতা নিয়ে যা ভাষণ দিল তাতে মনে হয় এবার সে বদলে গেছে। হাজার হোক মেয়েতো মায়ের জাত। স্নেহ, মায়া মমতা, কর্তব্যবোধ যাবে কোথায়? চলো—

মিনতিদেবী তবু ভরসা পায় না। কিন্তু কিছুই বলতে পারে না। এসেছে কালীবাবুর

সামনে। কালীবাবুতো আজই বিয়ের দিনক্ষণ পাকা করতে চান। সে বরপণও ভালোই দেবে। আর লবঙ্গকে পঞ্চাশ ভরি সোনা দেবে। কিরণকে একটা গাড়ি দেবে — তাছাড়া ওদের ওই একমাত্র মেয়ে। কালীবাবুর সবকিছু তো সেই পাবে। তার পরিমাণও কম নয়।

মদন ডাক্তার বলে,

— টাকা কড়ির দরকার নেই। ওরা শান্তিতে থাকুক তাই চাই। আর কিরণকে নিয়ে একদিন আপনার ওখানে যাবো। আজকালকার ছেলে ওর মতামতটাও জানা দরকার।

তারপর মদনবাবু বলে,

— কিরণ আমার খুবই অনুগত। আমার বিশ্বাস সে আমার কথার অবাধ্য হবে না। তবু আজকালকার ছেলেমেয়ে — স্বাধীন তারা, তাদের মতামতও জানা দরকার। আর আপনার বাড়িতে গিয়েই শুভদিনের তারিখটা ঠিক করা হবে।

কালীপদ বলে,

— তাহলে সেইদিনই মেয়েকে আশীর্বাদ করেও আসবেন।

মদন ডাক্তার বলে,

— তাহলে সামনের রবিবার শুভদিন — ওইদিনই যাবো।

কালীপদর বাড়িতে সেই রবিবার ছোটখাটো উৎসবই শুরু হয়ে গেছে। আজ তার মেয়ের পাকা দেখা — আশীর্বাদ। তারপরই শুভকাজ শুরু হয়ে যাবে। লবঙ্গও মনে মনে খুশী হয়েছে। সেদিন কিরণ তাকে এড়িয়ে পালিয়েছিল। এবার তার বাবাই কৌশলে কিরণকে জালে জড়িয়ে নিয়ে আনবে লবঙ্গের কাছে। লবঙ্গের গান গাওয়ার শখ কোন দিনই হয়নি। ছেলেবেলায় তার বাবা একজন গানের মাষ্টারও রেখেছিলেন — কেনা হয়েছিল দামী স্কেল চেঞ্জিং হারমোনিয়াম। কিন্তু কয়েকদিন সা-রে-গা-মা সাধার পর ঐ গানের মাষ্টার বলে,

— উকিলবাবু, গান লবঙ্গের হবে না। ওকে গান শেখাতে গেলে আমি এতদিন যা শিখেছি তাই ভুলে যাবো। আমি তাই আর আসছি না।

সেই থেকেই লবঙ্গের গানও আর শেখা হয়নি। তবু লবঙ্গ আজ যেন একা বারবার গুণগুণ করে গাইতে চেষ্টা করে — একটুকু ছোঁয়া লাগে - একটুকু কথা শুনি।

লবঙ্গও স্বপ্ন দেখছে। তাদের বিয়ে হচ্ছে। লবঙ্গ একটা দামী বেনারসী শাড়ি পরবে আজ। নিজেকে সাজিয়ে তুলবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়িটা গায়ে ফেলে দেখছে। কিরণকে সে অবাক করে দেবে। একদিন কিরণ ওকে এড়িয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে লবঙ্গই।

কিরণ খবরটা পেয়ে চমকে ওঠে। মাকে বলে,

— বাবা যা খুশী করবেন — তুমিও বাধা দেবে না? ওই স্টীম রোলারকে ঘরে

আনতে হবে বৌ করে?

মিনতি এবার ছেলেকে বিদ্রোহ করতে দেখে মনে মনে খুশীই হয়। নিজে স্বামীর কথায় বিদ্রোহ করতে পারেনি। তবে একজন গুন্ডা মস্তান পার্টির উকিলকে ঘরের বৌ করে আনতে মিনতির মন সায় দেয়নি। মিনতি বলে,

— আমি কি করবো?

কিরণের সেই জেদী সত্ত্বাই এবার জেগে উঠেছে। চোখের সামনে জেগে ওঠে লবঙ্গের সেই বিশাল দেহ — মনে পড়ে তার দৃপ্ত রণ হুঙ্কার। কিরণ বলে,

— বাবাকে বলো ওসবে আমি নেই। ওই মেয়েকে বিয়ে করে আমার জীবন বরবাদ করতে পারবো না।

মিনতি খুশী হয় কিরণের কথায়। কিরণ বলে,

— আজই আমি কলকাতায় ফিরছি মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের জরুরী মিটিংএ। বাবাকে বলে দিও।

কিরণ যেন ওই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেই বেরিয়ে যায়। মদন ডাক্তার কোন দুর গ্রামে কলে গেছে। ফিরতে রাত হবে। কিরণ এই অবসরে বেরিয়ে পড়ে।

এসব খবর তখন কালীবাবুর বাড়িতে এসে পৌছায়নি। গ্রামে তখন হাঁকডাক করে ছোটখাটো ভোজের আয়োজন হচ্ছে। নবু ঘটক ও রয়েছে। সেই রান্নার কাজের তদারক করছে। বেশ কিছু উকিল বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন কালীবাবু। পুরোহিত ঠাকুরও এসেছে। আশীর্বাদের শুভলগ্ন বিকেল চারটেতে। পাড়ার মেয়েদেরও ডেকেছে মল্লিকা। এর মধ্যে লবঙ্গের দু-চারজন কলেজের বান্ধবীও এসেছে। লবঙ্গকে তারা সাজাচ্ছে। লবঙ্গ আজ নিজেকে কনের সাজে সাজিয়ে তুলতে চায়। বাড়িতে হৈ চৈ কোলাহল চলছে।

মদন ডাক্তার অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছে। পুরোনো গাড়িটা মাঝে মধ্যে গড়বড় করে। আজও মাঝমাঠে বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ হয়ে পড়েছিল, গাড়ির ইঞ্জিন চেষ্টা করে চালু করে ফিরেছে অনেক রাতে। মদন ডাক্তার ক্লান্ত — খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ে। সকালে দেখে এবার কিরণ বাড়িতে নেই। খোঁজ খবর করতে এবার চমকে ওঠে মদন ডাক্তার।

— সেকি। আজ তার পাকা দেখা সব জেনে আজই সে কলকাতা চলে গেল। এখন কি হবে? আমার মান ইজ্জত কি ধুলোয় মিশিয়ে দেবে।

মিনতি বলে,

— তখনই বলেছিলাম ওই কোর্ট কাছারি করা মেয়েকে ঘরে এনোনা। ছেলের মত নেই। ছেলেও এখন স্বাধীন। তোমার চেয়েও পশার তার কম নয়। সে তো নিজের পথে চলবে। ওই জয়ঢাকের মত মেয়েকে সে বিয়ে করবেনা।

মদন ডাক্তার কি করবে ভেবে পায় না। কালীপদ দুঁদে উকিল — তার বিষ নজরেই পড়তে হবে এবার ছেলের জন্য। এমন একটা জটিল পরিস্থিতিতে পড়তে হবে এটা স্বপ্নেও ভাবেনি মদনবাবু। তাই সে'ও এই পরিস্থিতিব মোকাবিলা কি করে করবে তাই ভাবছে। আর সকালেই দুর মফঃস্বল থেকে ডাক এসেছে কোন বড় জোতদারের খুব অসুখ। এখুনি যেতে হবে সেখানে। মদন ডাক্তার এবারে যেন বের হবার একটা পথ পেয়েছে। সে তার বাড়ির কাজের লোককে একটা চিঠি দেয়। সে ওই চিঠি কালীবাবুর বাড়িতে পৌছে দেবে।

কালীবাবুর বাড়িতে তখন সমারোহ চলছে। বাজার থেকে বড় বড় মাছ এসেছে। তিনরকম মাছের আইটেম হবে। এর মধ্যে শহরেব সেরা দোকান থেকে দই, তিন চার রকমের মিষ্টি এসবও এসেছে। ওদিকে লবঙ্গের বান্ধবীর দলও লবঙ্গকে সাজাচ্ছে। নবু ঘটক তখন ভটচার্য মশায়ের সঙ্গে অতিথিদের জন্য বরণ ডালা — প্রদীপ এসব সাজাচ্ছে। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত মদন ডাক্তারের চিঠি এসে পড়ে।

কালীপদবাবু বাইরের ঘরে আরও কয়েকজন উকিল বন্ধুকে নিয়ে চা খাচ্ছিল। সেই উকিলেরা এর মধ্যে উকিল আর ডাক্তরের সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেছে। কালীপদবাবুকে চিঠি পড়ে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে একজন প্রশ্ন করে,

— কি ব্যপার হে কালীপদ? কার চিঠি?

কালীপদ এবার বিকট শব্দে গর্জে ওঠে,

— শালা বিশ্বাসঘাতক ডাক্তারের বাচ্চাব কাউকে ছাড়বো না। আমাকে পাকা কথা দিয়ে এখন বাপ বেটার দুজনেই শহর ছেড়ে কেটে পড়েছে। শালা রোগী দেখতে গেছে। আমাকে ডুবিয়ে গেল, মেয়েটাকেও।

এর মধ্যে অন্যান্যরাও চিঠিটা পড়েছে। কালীপদ জানিয়েছে কিরণ জরুরী মিটিং-এ কলকাতায় গেছে। আর উনি নিজে গেছে কোন সম্পন্ন রোগীকে দেখতে দূরে কোন গ্রামে। আজ তাদের যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

বাড়িতে সানাই বাজছে সকাল থেকেই। বিয়ের উৎসব আজ থেকেই শুরু হয়েছে। আর এই সময় কিনা এই কথা। চিঠির খবর সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। কালীপদবাবুর স্ত্রীও আর্তনাদ করে ওঠে।

— একি সব্বনেশে কথা গো। মেয়েটার অদৃষ্ট নিয়ে এই ভাবে ছিনিমিনি খেলবে ঐ মদন ডাক্তার আর তার ছেলে। ওগো - কিছু একটা করো। লোকসমাজে মুখ দেখাবে কি করে?

নবু ঘটকও খবরটা শুনে চমকে ওঠে। নরহরিও রয়েছে এ বাড়িতে। সেও কালীবাবু উকিলের টাউট গিরি করে — তাই তার অনুগতই। লবঙ্গও খবরটা শুনেছে। আজ তার

মনে হয় কিরণ ইচ্ছা করেই তাকে চরম অপমান করেছে। সেও ঘোষণা করে,

— এ বিয়েতে কাজ নেই।

কালীপদ গজরায়,

— ওই শালা ডাক্তারের এগেনস্টে আমি মামলা করবো মানহানির। ব্যাটা বেইমান।

কালীপদবাবুর স্ত্রী মল্লিকা বলে,

— ওসব পরে হবে। আশীর্বাদের দিনক্ষণ ঠিক হয়েছে এই দিন নষ্ট হয়ে গেলে মেয়েটার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আর ঐ কিরণ ছাড়া কি শহরে সুপাত্র নেই? তোমার কি টাকার অভাব?

নবু ঘটকের কাছে সারা শহর — সারা জেলার সুপাত্রের ঠিকুজী কুষ্ঠি ছবি থাকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে নিশীথবাবুর ছেলে শহরের ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। নিশীথ বাবুও কোর্টের উকিল। কালীপদর খুবই পরিচিত। বার - এর এ্যাডভোকেটরাও এবার জেগে ওঠে। এ যেন উকিল সমাজেরই অপমান করেছে ওই মদন ডাক্তার আর তার ছেলে। এই অবসরে জবাবই দেবে এবার উকিল সমাজ।

নবুঘটক বলে,

— আমি যাচ্ছি নিশীথবাবুর বাড়ি। আজ রবিবার ওর ছেলের ব্যাঙ্ক বন্ধ, ছেলে বাড়িতেই আছে। দেখ যদি কিছু করা যায়। কালীবাবুও নিশীথের ছেলে নিখিলকে চেনে। ভালো ছেলে আব অবস্থাও মন্দ নয়। তাছাড়া তার সর্বস্ব পাবে ওই মেয়ে লবঙ্গ।

কালীপদবাবুও দেখাতে চায় মদন ডাক্তারকে যে তার মেয়ের বিয়ে সে যখন তখন দিতে পারে। কিরণের মত ছেলের সে পরোয়া করে না।

কালীবাবু বলে,

— দ্যাখ হে নব যদি মান সম্মান বাঁচাতে পারো। বলো নিশীথবাবুকে টাকার জন্য ভাবতে হবে না। যা লাগে যত হাজার লাগে আমি দোব। হাজার কেন — তার খরচের জন্য দু'লাখ টাকা তুলে দেব ব্যাঙ্ক থেকে। যদি সে আমার মান সম্মান বাঁচায়।

করিতকর্মা উকিলবাহিনী এবার কালীপদর মেয়ের বিয়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। আজই এই শুভ লগ্নে আশীর্বাদ সারতেই হবে। মদন ডাক্তারকে তারাও দেখিয়ে দেবে যে উকিলদের ক্ষমতাও কোন অংশে কম নয়।

ওদের সমবেত চাপে এবার নিশীথবাবুকেও রাজী হতে হয়। অবশ্য নিশীথবাবু ছেলের বিয়ের জন্য সম্বন্ধও দেখছিলো। এই পাত্রী অন্য সব দিক থেকে ভালো। বিরাট পয়সাওয়ালা লোক কালীবাবু — আর চেনাজানাও। তাই নিশীথ বাবুরও আপত্তি হয় না।

কালীবাবুর বাড়িতে আবার সানাই বেজে ওঠে। রান্নার কাজে ব্যস্ততা দেখা যায়।

লোকজনের কোলাহল ওঠে। শাঁখও বেজে ওঠে। লবঙ্গের পাকা দেখা। আশীর্বাদ মায় বিয়ের শুভদিনও ঠিক হয়ে গেল। কিরণের বদলে পাত্র এখন নিশীথবাবুর ছেলে নিখিল। ডাক্তারের বদলে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার।

মদন ডাক্তার দুর গ্রামের কল সেরে বাড়ি ফেরে রাত্রে। মিনতিই সব খবর রেখেছিল। তার বৌদি খবরটা দেয় যে লবঙ্গের বিয়ের আশীর্বাদ হয়ে গেছে নিশীথ উকিলের ছেলে নিখিলের সঙ্গে -- সেও মনে মনে খুশী হয়েছে। মদন ডাক্তার রাত্রে বাড়ি ফিরেছে। সেও এখন ভীত সন্ত্রস্ত। কালীপদ উকিলকে বিশ্বাস নেই। সে নির্ঘাৎ কোন মামলায় না জড়ায় তাকে। মিনতি বলে,

— ঘাড় থেকে পেত্নী নেমেছে গো।

মদন ডাক্তার বলে,

— মানে!

-- ওই কালীপদবাবুর মেয়ে লবঙ্গের আশীর্বাদ হয়ে গেছে অন্য পাত্রের সঙ্গে। শুনলাম সামনের সোমবারই বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। ছেলে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার।

মদন ডাক্তার এবার নিশ্চিন্ত হয়। সে বলে,

— তুমি শুনলে কোথা থেকে? সব ঠিক তো?

মিনতি বলে,

— ও বাড়ি থেকে বৌদি ফোন করেছিল। বেশ ধুমধাম করেই ওর আশীর্বাদ হয়েছে। দারুণ খাইয়েছে কালীবাবু।

মদন ডাক্তার এবার বলে,

— তাহলে একটা ঝামেলা চুকলো। যা বিপদে ফেলেছিল তোমার ছেলে। শেষে উকিল ব্যাটা যদি কোর্ট কাছারি করত বিপদই হতো তখনই। তা কিরণকে এবার বলো -- ফিরে আসতে।

মিনতি বলে,

— তা বলছি। তবে বাপু এবার তোমার ছেলের বিয়ের ব্যবস্থাই করো। নাহলে সবাই ভাববে লবঙ্গের সঙ্গে বিয়ে হয়নি। আর বিয়েই হবেনা ছেলের।

মদন ডাক্তার বলে,

— না - না। এবার বিয়েই দেব তোমার ছেলের। বেশ নামী একটি মেয়ের সঙ্গে। খুঁজে দ্যাখো যদি তেমন মেয়ে তোমার সন্ধানে থাকে। দেনা পাওনার কোন প্রশ্নই নেই — তবে মেয়ে পছন্দ মত হতে হবে। মিনতিও ভাবছে কথাটা। এতদিন ধরে সেও কথাটা বলতে পারেনি। তারই এক বান্ধবী এখানের স্কুলের শিক্ষিকা। স্বামী নেই। একমাত্র মেয়ে

নন্দিতাকে নিয়ে তার সংসার। নন্দিতাও এবার বি-এ পাশ করেছে। সুন্দরী নম্রস্বভাবের মেয়ে।

মিনতি বলে স্বামীকে,

— নন্দিতা কে তো দেখেছ?

মদন ডাক্তার বলে,

— হ্যাঁ, বড় ভাল মেয়ে।

— ওর মা তো কিছু দিতে পারবে না। তবে নন্দিতা খুব ভালো মেয়ে, আমাদের পালটি ঘর — ওকে যদি কিরণের বৌ করে আনি -- মদন ডাক্তারও কথাটা ভাবছে। সেও জেদী লোক। দেখেছে কালীপদও একই দিনে তার মেয়ের আশীর্বাদ সেরেছে — আর সাতদিনের মধ্যে বিয়েও সারবে। মদন ডাক্তারের ও মনে হয় — সেও শহরের লোককে দেখিয়ে দেবে যে ওই হাঁড়ির মত মেয়েকে বাতিল করে সত্যিই একটি গরীব ঘরের মেয়েকে বিনাপণে সাতদিনের মধ্যে ওই একই লগ্নে তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে।

ব্যাপারটা শহরে সাড়াই তুলবে। মদন ডাক্তার বলে,

— ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলো। কিরণ কাল ফিরলে তাকে ও বলো যে ওই মেয়ের সঙ্গেই তার বিয়ে হবে। সামনের সোমবার ওই লগ্নে বিয়ে হবে। ব্যাটা উকিলকে দেখিয়ে দিতে চাই আমিও কিছু করতে পারি। কিরণ পরদিন ফিরেছে কলকাতা থেকে।

সে ও শোনে যে সেই স্টিমরোলার লেডি লবঙ্গলতিকার বিয়ের ঠিক হয়েছে অন্য ছেলের সঙ্গে।

কালীপদ উকিল মেয়ের বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত। শহরের লোকদের সে দেখিয়ে দেবে ওই লগ্নেই মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। আর কিরণ ডাক্তারের মত ছেলের তার দরকার নেই ওর মেয়ের জন্য। এবার মদন ডাক্তার ও এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছে। ছেলের বিয়ে সেও দেবে। তবে কোন বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে নয়। মদন ডাক্তারও অনেক সমাজ কল্যাণ মূলক কাজ করে এমন অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। কিরণ গরীব রোগীদের বিনা পয়সায় অথবা কম পয়সায় চিকিৎসা করে। বহুকল্যাণ মূলক কাজের সঙ্গেও সে যুক্ত আছে। তাই কিরণ বিয়ে করবে ওই অসহায় সামান্য এক শিক্ষিকার মেয়েকেই।

কিরণও নন্দিতাকে দেখেছে। এ বাড়িতে মায়ের কাছে আসে। কিরণেরও ভালো লাগে শান্ত সুন্দরী মার্জিত রুচির এই মেয়েটিকে, লবঙ্গের মতো বুলডোজার টাইপের নয়। তাই সেও মায়ের কথায় এই বিয়েতে রাজী হয়। আর মদন ডাক্তারও ঘোষণা করেন।

— এই সোমবার গোধূলি লগ্নেই বিয়ে হবে।

নন্দিতার মা স্কুলের শিক্ষিকা।

স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েকে নিজে মানুষ করেছে। ভাইদের আশ্রয়ে থাকে। তার নিজের বাড়ীও নেই। আর সেও ভাবেনি যে কিরণের মত এমন সুপাত্রের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে হবে। কিছু খরচ তো করতেই হবে। ওরা অবশ্য কিছু চায়নি।

তবু নন্দিতার মা বলে মিনতিকে,

— জানিস তো আমার অবস্থা। স্কুলে লোনের দরখাস্ত করতে হবে। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লোনও নিতে হবে। এত কম সময়ের মধ্যে ওসব তো হবে না।

মিনতি বলে,

— ওর জন্য তোকে ভাবতে হবে না। টাকার যা দরকার আমিই দেব।

— কি বলছিস মিনতি? তা কি করে হয়?

— এই সোমবারই মেয়ের বিয়ে হবে। টাকা আমি দেব — তুই বরং লোন পেলে তখন দিয়ে দিবি। বিয়ের তারিখ পিছোনো যাবে না। আর এই টাকার কথা জানবো শুধু তুই আর আমি। তুই আর অমত করিস না।

নন্দিতার মা আর অমত করতে পারে না। মদন ডাক্তারই সব ব্যবস্থা করে। শহরের নামীদামী লোকেদেরকে নিমন্ত্রণ করেছে। নিমন্ত্রণ করেছে শহরের সংবাদ পত্রের লোকেদের ও। বিনাপণে বিয়ে দিচ্ছে এমন কৃতী ছেলের। যার জন্য এই শহরের দু - চারজন দশলাখ টাকা অবধি দর দিতে গেছল। সেই কিরণের মত ছেলের বিয়ে হচ্ছে বিনাপণে।

কালীপদ উকিল মেয়ের বিয়ে ধূমধাম করে দিলেও ওই মদন ডাক্তার তাকে টেক্কা দিয়ে গেছে। এই নিয়ে শহরে বেশ সাড়া পড়ে যায়।

সময়ের সাথে সাথে সবই বদলায়। মানুষের কাছে আজ যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় কিছুদিন পর নানা ঘটনা প্রবাহে সেই গুরুত্বটা হারিয়ে যায়। মানুষ ভূলে যায় অনেক কিছুই। দিন মাস বছর কেটে যায় স্বাভাবিক নিয়মে। সময় বসে থাকেনা। বসে থাকেনা জীবন প্রবাহ। নদীর গতির মত সেও গীতিময়। নানা পথ ধরে সে বয়ে চলে সাগরের দিকে। জীবন প্রবাহও তেমনি বয়ে যায়।

মদন ডাক্তার. কালীপদবাবুদের জীবন প্রবাহ বয়ে গেছে মৃত্যুর মহাসাগরের দিকে। শহরের রূপ ও এখন অনেক বদলে গেছে। বদলেছে কিরণ ডাক্তারের জীবন যাত্রাও। কিরণ বাবুর সংসারে এখন নন্দিতাই গৃহিণী। মিনতি সংসারের সবভার নন্দিতার হাতে তুলে দিয়ে এখন নিজে পূজা আর্চ্চা নিয়েই থাকেন। কিরণের এক মেয়ে করুণাময়ী আর একমাত্র ছেলে প্রতাপ। প্রতাপ স্কুলে পড়ছে — পড়াশোনায় সে ভালোই আর করুণা

কলেজে পড়ে। তবে মিনতি বলে,

— ওরে কিরণ, করুণার বিয়ের চেষ্টাই কর বাবা। আর পড়ে কাজ নেই। নন্দিতাও তাই চায়। সেও চায় মেয়ের ঘর সংসার হোক।

কিরণের এখন খুবই নাম ডাক। এই শহরে এখন মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে। কিরণ তবু এই অঞ্চলের মধ্যে এখন সেরা ডাক্তার। বয়স হয়েছে — অবশ্য এমন কিছু বয়স নয়। আর তার স্বাস্থ্যও বেশ নিটোল। প্র্যাকটিস করে সময় পায়না। সে এখন শহরের নামী ব্যক্তি। জমজমাট পশার। পৈত্রিক বাড়িটাকে এখন নতুন করে গড়ে তুলেছে। আরও কিছুটা জায়গা নিয়ে সেখানে সুন্দর বাগান গড়ে তুলেছে। দামী গাছ গাছালি বাহারী রকমারী ফুলগাছও আনিয়েছে সে কলকাতার নার্সারী থেকে। একটা জুঁই গাছ লাগিয়েছে। সেটা এখন সবুজ লতার মতো একতলা ছাড়িয়ে দোতলাব দিকে চলেছে। বারোমাস সেই পুঞ্জীভূত সবুজের জালে সাদা জুঁই ফুল ফুটে থাকে আর বর্ষার সময়ে আকাশ বাতাস জুঁই ফুলের সৌরভে ভরে থাকে। কিরণের দেহেও প্রৌঢ়ত্বের ছাপ এসেছে। মুখটা দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেশ গোলগাল হয়ে উঠেছে। চোখে সেল ফ্রেমের চশমা। সেও তার বাবার মত গোঁফ রেখেছে। বেশ সতেজ পুরুষ্ট গোঁফ। পবণে সাবেকী গলাবন্ধ কোট।

কিরণের মা বলে,

— ওসব পোযাক কি পরিসরে?

কিরণ বলে,

— মা ডাক্তরকে হতে হবে অসাধারণ। তার পোষাকও হবে তেমন যাতে রোগী ডাক্তারকে দেখেই ভরসা পায়। তাই বাবার মত পোষাকই ভালো।

আরও আশ্চর্যের কথা কিরণ আজকের দিনেও নতুন গাড়ি নিয়ে বেরোয় না। বাবার সেকেলে গাড়িটা তার বেশী পছন্দ। তার অবশ্য অন্য একটা কারণ আছে। সেবার কিরণের গাড়িটার কিছু মেরামতের জন্য গ্যারেজে গেছে। বাবার পুরোনো গাড়িটাকে বাবা মারা যাবার পরও সে বিক্রী করতে দেয়নি। তাই ড্রাইভার রেখে সে তার গাড়ি চালায়।

সেদিন দূরে একটা গ্রাম থেকে কল আসে। ওই অঞ্চলের দু-তিনটে গ্রামেই যেতে হবে। সব কটাই বেশ সিরিয়াস ধরনের রুগী। ওদিকে শহরে আরও দুতিনজন নতুন ডাক্তার বসেছে। তাদের ডিগ্রীর লেজুড়টাও বেশ বড়সড়, ওরাও এখন ডাক্তারীর কম্পিটিশনে নেমেছে। ওদেরই একজন দেখছিল ওই রোগীদের কিন্তু রোগ সারছিল না — বরং রোগীর অবস্থা খারাপের দিকেই চলেছে। তারাই শেষ অবধি সেই পুরোনো কিরণ ডাক্তারকে ডেকেছে। সেদিন কিরণের গাড়িটা গ্যারেজে। অথচ তাকে যেতেই হবে। তার ড্রাইভারই বলে,

— ডাক্তারবাবু পুরোনো গাড়িটা তো ঠিকঠাকই রয়েছে। বলেন তো এই গাড়িটা নিয়ে

যাই। বড়বাবু বলতেন ওটা খুব পয়মন্ত গাড়ি! কিরণ বলে।

— ওই গাড়ি ঠিকঠাক যাবে তো।

— ভাববেন না ডাক্তারবাবু। আমি ঠিক চালিয়ে নিয়ে যাবো। মাঠে ঘাটে ওই গাড়ি ভালোই চলে।

সেদিন কিরণ বাবার ওই সাবেকী গাড়িতে চড়ে গেছল। বেশ জানে কিরণ ওই রোগীদের ঠিকমত সুস্থ করে তুলতে পারলে ওই নবাগত ডাক্তারদের হাঁকডাক ওই অঞ্চলে হঠিয়ে দিতে পারবে। বাবার নাম স্মরণ করে কিরণ গাড়িতে ওঠে। মাঠ-প্রান্তর পার হয়ে রাস্তার ধুলো উড়িয়ে গাড়ি পৌঁছে যায় রোগীদের গ্রামে। গ্রামের লোকজনও সেই গাড়িটাকে দেখে — মদন ডাক্তারও আসতো ওই গাড়িতে। টাকার জন্য চাপও দিতনা — রোগীদেরও ভালো করে দেখতো — আর ওযুধ দিতোও ধন্বন্তরীর মতো। রোগীরাও সেরে উঠতো।

কিরণ রোগীদের দেখে ওযুধ দেয়। গ্রামের লোকও খুশী। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার কিরণ ভেবেছিল তিনজন রুগীই বাঁচবে কিনা। কিন্তু ওদের সকলেই সেরে ওঠে। ওই অঞ্চলের বহুগ্রামে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। আর ওইসব নতুন পাশ করে আসা ডাক্তারও দেখে গ্রাম থেকে অনেকে যায় কিরণ ডাক্তারের কাছে। কিরণ এখন তার নতুন মডেলের গাড়িটা গ্যারেজে রেখে ওই সাবেকী অস্টিন গাড়িতেই যায় বিকট শব্দ তুলে। সামনের সিটে ওর কম্পাউন্ডার হরিপদ আব বেচু ড্রাইভার, পিছনের সিটে থাকেন কিরণ, আর গ্রামে গেলে গ্রামের রোগীরা খাতির করে কেউ লাউ-কুমড়ো - মর্তমান কলা এসব তুলে দেয়। কিরণ তাদের এই আবদারকে উপেক্ষা করতে পারেনা। নন্দিতা বলে,

— একি ডাক্তারী গো। কলা - কুমড়ো - লাউ এসব ভিজিট নাও।

কিরণ বলে,

— লোকে দেয়। না বলতে পারি না। ওদের অনেককে এমনিই দেখি ওযুধ পত্র দিই। গরীব মানুষ টাকা তো দিতে পারে না, তুলে দেয় গাড়িতে, আর বেচুটা শয়তান নাম্বার ওয়ান। ও তুলে নেয়। অবশ্য বেচু ড্রাইভারের স্বার্থ এতে পুরোপুরি আছে। বেচু বেশ দশাসই চেহারার মানুষ। তার স্ত্রীও ওসব পেয়ে খুশীই হয়। বেচু সব বাড়ি নিয়ে যায়। কম্পাউন্ডার হরিপদও ওসবে ভাগ পায়।

তাই তারাও উদ্যোগী হয়ে গ্রামে গেলে এসব ধরনের প্রণামীও আদায় করে। কিরণ নিষেধ করলেও শোনেনা।

এবার নন্দিতারও শরীরটা ভেঙে পড়েছে। মিনতির ভাবনা হয়। সে কিরণকে বলে,

— কি ওযুধ দিয়েছিস রে কিরণ! বৌমার অসুখ যে সারছে না।

কিরণও বুঝেছে নন্দিতার অসুখ সারছে না। শরীর ভেঙে পড়েছে। তার দেহে বাসা বেঁধেছে অনেক রকমের রোগ।

তাই নন্দিতা বলে,

— তুমি করুণার বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লাগো।

শহরের রূপ এখন বদলেছে। এখন শহরে উঠেছে বহুতল বাড়ি। শহরের পরিধিও বেড়েছে। শহরের সীমা এখন চলে গেছে অনেক দূর অবধি। গাড়ি ঘোড়াও বেড়েছে। বেড়েছে ব্যবসা পত্র ও আর রাজনৈতিক দাদাদের দৌলতে অনেকেই এখন মুঠো মুঠো টাকাও ওড়াচ্ছে হাওয়ায়। নবু ঘটক আর আগেকার মত চলমান জীবনের লোক নয়। শহরের ওদিকে একটা ঘরও নিয়েছে। সাইনবোর্ডও লাগিয়েছে — 'ভাগ্যগণনা ও যোটক বিচার করা হয়'। পথেই ওদের পৈত্রিক কালীমন্দির। এতদিন ঐ মন্দিরটা টিকেছিল কোনমতে। নবু ভটচায সকাল সন্ধ্যে ছোট রেকাবিতে কিছুটা আতপচাল, দুটো বাতাসা আর ফুল জল দিয়ে মায়ের পূজো করতো। শহর জাগ্রত হবার পর মায়ের প্রতি লোকজনের ভক্তি হঠাৎ গেল বেড়ে। দুনম্বরী থেকে দশনম্বরী কারবার যত বাড়তে লাগলো, এক শ্রেণীর মানুষও তখন থেকে দুবেলা মায়ের মন্দিরে এসে মাথা ঠুকে প্রণামীর থালায় টাকা দিতে লাগলো।

নবু ভটচায এবার প্রণামীর বহর দেখে মায়ের সামনের থালার আয়তনও বাড়িয়ে দিল। আর ভোর থেকে মায়ের মন্দিরে ভিড় শুরু হলো। দুপুরে ভোগ বিতরণ আর সন্ধ্যায় আধ ঘন্টা ধরে খোল-করতাল — কাঁসরের সঙ্গে সন্ধ্যারতি চলতে লাগল। বহু ভক্তের সমাগমও হল। প্রণামীর থালাও ভরে ওঠে। নবু ভটচায আড়চোখে প্রণামীর থালার দিকে চায় আর আরতির সময় বাড়াতে থাকে। তাতে প্রণামীও বেশী পড়ে।

শনি মঙ্গলবার আর অমাবস্যার রাতে তো বিশেষ পূজোর আয়োজন থাকে। হোম হয়। মায়ের দয়ায় নবু ভটচায এখন বেশ ফুলে ফলে ভরে উঠেছে। তবে এসবের মধ্যেও সেই ঘটকালিটা ছাড়েনি। বরং তার সঙ্গে যোটক বিচার — কুষ্ঠি বিচার এসব ফি বাবদ মোটা টাকাই নেয়। তাই নিজেকে আর গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়না। তারই কিছু চর অনুচর ওই সব খবর ছবি ঠিকুজী নিয়ে আসে। তার জন্য ছেলে মেয়ের অভিভাবকদের কাছ থেকে উলটে রেজিস্ট্রেশন ফিও নেয় নবু ভটচায। নবু ভটচার্যের সুদিন আগে ছিলনা। তখন তার দিন আনি দিন খাই অবস্থা। তার মা নবুকে বলে,

— বিয়ে থা কর বাবা। আমার বয়স হচ্ছে। সংসারের কাজ আর করতে পারছিনা। তারপর ওই মন্দিরের সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালা — পূর্বপুরুষ এর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই —

মন্দির করে গেছে। এখন বিগ্রহ নয় — নিগ্রহে ঠেকেছে। দুবেলা আতপচাল — বাতাসাই বা যোগাব কোথা থেকে। ধূপ প্রদীপের খরচ নেই।

নবু প্রথমে বিয়ে করতে চায়নি। বলে,

— দেখছো তো খরচ খরচাই চলছে না। নিজেরই কাজ নেই। আবার বিয়ে করে ঘরে আনাবো আর একজনকে? খাওয়াবো কি?

নবু তখন ঘটকালি শুরু করেছে। অনেক ছেলেমেয়ের খবর সে রাখে। এর মধ্যে দুচারটে বিয়েথাও দিয়েছে। কিছু প্রণামী — ঘটকালি বাবদ কিছু আয়ও হয়েছে।

এমনি দিনে মা-ই জোর করে নবুর বিয়ে দেয় সরমার সাথে। ওই পাড়ারই মেয়ে। ওর বাবা একটা ছোট কারখানায় কাজ করে। তবে সরমা দেখতে শুনতে মোটামুটি। মেয়েটা ওই বুড়ির কাছেও আসতো। নবুর মা একা আর মন্দিরের কাজও করতে পারে না। মন্দির ধোয়া মোছার কাজটাও সরমাই করে। বুড়ি এখন দেখে গরীবের ঘরের মেয়ে স্বজাতি পালটি ঘর। তাই নবুকেও জোর করে।

সরমা এবাড়িতে আসে বৌ হয়ে। সরমা সেদিন এই সংসারে একটা আশ্রয় পেয়ে খুশীই হয়েছিল। এখন দিন বদলেছে। বুড়ি শাশুড়ীও মরে গেছে। সে বড় অভাব আর কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। ঠিকমত ওযুধপত্রও পায়নি। তবু সরমা তার যত্নআত্তি করেছিল। বুড়ি মারা যাবার পর, তাঁর আশীর্বাদেই নবুর দিন বদলেছে। মা কালীও তাকে দয়া করেছে। এখন নবুর বাড়ি ঘরের অবস্থাও বদলেছে। পৈত্রিক ভিটের মন্দির থেকেও কম আয় হয়না। প্রণামীই পড়ে হাজার টাকার — তারপর অন্যসব জিনিষপত্রতো আছেই।

টাকা কড়ি — ফলমূল তো বিস্তর পড়ে। ওসব দোকানের লোক আসে তাদের ঐগুলো কমদামে বিক্রী করে দেয়। আবার ওইসব জিনিষই ফিরে আসে — আবার বিক্রী করে।

নবু এখন অফিসে বসে দামী আতস কাঁচ দিয়ে দামী খদ্দেরদের হাত দেখে আর গড়গড় করে ভবিষ্যৎ বাণী করে যায়। যেন ওদের ভূত ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষভাবেই দর্শন করছে সে। শহরের উঠতি মস্তান লম্বুও আসে।

লম্বু এখন শহরের কোন নেতা কাম ব্যবসায়ীর গদিতে কাজ করে। অবশ্য কাজ করার মতো লেখাপড়া লম্বুর জানা নেই। ছেলে বেলা থেকেই সে মারপিট — গুন্ডামিই করতো, স্টেশন চত্বরে থাকতো। আর মালগুদামের ফাইফরমাস খাটতো। সাইডিং-এ থাকা ওয়াগন থেকে মাল টানতো। তার দলবলও জুটে যায়। স্টেশন থেকে শহরে আসার পথটাও ছিল নির্জন। গুদাম — দুএকটা কারখানা — আর জলাভূমি। ওই পথে রাতের ট্রেনে ফিরতে হয় বহুলোককে। লম্বুর দল মাঝে মাঝে ছিনতাইও করতো। লম্বুর দল ক্রমশ

এবার বোমাটোমাও ব্যবহার করতে শেখে। সেবার ওয়াগন লুট করতে গেছে ওরা। পুলিশ গুলি চালাতে এবার ওই লম্বুর দলও বোমা ছোঁড়ে। একজন পুলিশকে জখমও করে তারা। লম্বুর দল ধরা পড়ে। থানাতেও আনা হয় তাদের। এমন দিনে শহরের অন্যতম নেতা বীরেনবাবুই ওদের ছাড়িয়ে আনে। সামনে ভোট। বীরেনের দলও ভোটের জন্য তৈরী হচ্ছে। প্রতিপক্ষও কম যায় না। তারা শহরের শাসনভার এদ্দিন আগলে রেখে নিজেদের আখের গুছিয়েছে। তারা এত সহজে ছাড়তে চায়না।

বীরেনের দল এখন শহরে মাথা তুলেছে। তারাই কুরসির দখল চায়। ওদের দলে রয়েছে শহরের অনেক মানুষই, তাদের মধ্যে রয়েছে ওই লবঙ্গলতিকাও। বীরেনের দলের সে একজন সক্রিয় সদস্যা। বয়স হয়েছে তবু এখনও দাপটের সঙ্গে শহরে ওকালতি করছে। আর দেশ সেবার কাজ করছে।

সেদিন বীরেনবাবু বলে লম্বুদের,

— কি রে লম্বু, মুখ রাখতে পারবি তো? দলকে জেতাতে পারলে তোর পাকা চাকরী হয়ে যাবে। পুরসভায় কর্মীদের দলের বড় সরদারই হয়ে যাবি তুই।

লম্বু জানে পুরসভার এসব কাজে রয়েছে একগাদা পয়সা। পঞ্চাশজন কর্মী কাজ করে — অফিসে, দেখাতে পারবে সত্তরজন। বাকী কুড়িজনের মজুরী ওদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। লম্বুই পাবে তার অর্দ্ধেক। তাছাড়া জিনিসপত্র না কিনে বিলও পাশ করানো যাবে। এমন লুঠের চাকরীর জন্য লম্বুও এবার জাগ্রত হয়ে ওঠে। এর মধ্যে তার ছেলেরা হাজার খানেক টাকাও পেয়েছে। আরও পাবে।

তারা এখন দল বেঁধে মিটিং মিছিলে যাচ্ছে। খেলার মাঠে লবঙ্গলতিকা দলের প্রচারে মিটিং করছে। তার তেজস্বিনী ভাষণ মাইকে ছড়িয়ে পড়ছে। লবঙ্গলতিকা দু-চারবার লম্ফ ঝম্পও করেছে। ইদানীং তার দেহের ওজন একটু বেড়েছে। আর মঞ্চ তৈরী করেছেন যিনি তাকেও বলা হয়নি যে লবঙ্গলতিকা দেবী ভাষণ দেবেন। ফলে সে সাধারণ মঞ্চই করেছিল। আর তারপর ঐ মহিলা দুচারবার দাপাদাপি করতে এবার নড়বড়ে মঞ্চটাই মড়মড় করে ভেঙে পড়ে। ওর বিপুল দেহভারে।

লম্বুর দল এবার আসরে নামে — কোন দল লবঙ্গকে আহত করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে। তাই নিয়ে বিরোধীদের নামেই ওরা প্রচার করে। লবঙ্গ দিদি গুরুতর আহত। এবার তাই ওকে ভোটে জেতাতেই হবে। দেশসেবার জন্য লবঙ্গদি প্রাণই দিতে গেছল।

বীরেনবাবুর দল সেবার পুরসভার ভোটে বিপুল ভোটেই বিজয়ী হয়। আর এই বিজয়ে যে লম্বুর অবদান অনেক তা বীরেনবাবুও স্বীকার করেন। লম্বুর দল বুথ জ্যাম করে — বোমাবাজি করে ভোটারদের বুথে আসতেই দেয়নি। বীরেনবাবুদের জয়ী করেছে।

বীরেনবাবু বলে,

— একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিস লম্বু — সামনের ভোটে এবারকার মতো হৈ চৈ করে নয়। বৈজ্ঞানিক প্রচার করতে হবে। ওসব আমিই শিখিয়ে দেব।

লম্বুর চাকরীটাও হয়েছে। ফলে লম্বু এখন নবুর মায়ের মন্দিরে ঘনঘন আসে। মাকে ভালো করে প্রণামী দেয় — সরমা ওকে প্রসাদও দেয়। আর লম্বুও এবার প্রসাদের লোভে প্রায়ই আসে মন্দিরে।

কিরণবাবুই নবুকে খবর পাঠায়। হাজার হোক পুরোনো লোক সে। নবুও আসে কিরণ ডাক্তারের বাড়িতে। কিরণ বলে নবুকে —

— আমার মেয়ে করুণার জন্য একটা ভালো পাত্রের খোঁজ করুন ভটচায মশায়।

মিনতি দেবী বলে,

— ছেলেটা যেন ভালো হয়। সরকারী চাকুরে হলে ভালো হয় নবু।

— আমি সাতদিনের মধ্যে খবর আনছি কাকীমা।

কিরণ ডাক্তার বলে,

— হ্যাঁ, তাই আনো। তারপর আমি নিজে পাত্র দেখতে যাবো।

খবরটা আনে নবু ভটচায।

বিজিত এর পরিবার বিষ্ণুপুর শহরের নামী পরিবারদের অন্যতম। বিজিত পড়াশোনাতে ভাল — বেশ চটপটে, হাসিখুশী ভরা তরুণ। সে এখন দেবাদুনের ফরেস্ট অফিসারের ট্রেনিং নিয়ে ঘাটশিলার ওদিকে বনদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। কিরণবাবুও খবরটা পেয়ে নিজেই গাড়ী নিয়ে বিষ্ণুপুরে যান বিজিতদের বাড়ি। আরও একটা সুবিধা হয় ওদিকের একটা রোগীর মারফত বিজিতের সমস্ত খবর ও পান তিনি।

কিরণবাবু করুণার জন্য সত্যিই একটা ভালো পাত্রই পেয়েছেন। সারা বাড়ি বিয়ের উৎসবে মেতে ওঠে। নবু ঘটক অবশ্য এই বিয়ের ব্যাপারে বেশী কিছু করে নি। পাত্রপক্ষের সন্ধান দিয়েছিল মাত্র। তবু কিরণবাবু তাকে তার প্রাপ্য দিয়েছিল। মিনতিও খুশী — কিরণের স্ত্রী নন্দিতাও বিজিতের মত ছেলেকে জামাই হিসাবে পেয়ে খুশী হয়। করুণাকে সে সৎ পাত্রে দিতে পেরেছে।

করুণা তার নিজের ঘরে চলে যায়। নন্দিতার শরীর আরও ভেঙে পড়েছে। আর তার ছেলে প্রতাপই এখন সর্বেসর্বা। করুণা চলে যাবার পর মিনতি, নন্দিতা এখন প্রতাপকে নিয়ে পড়েছে। প্রতাপ এবার উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছে। পড়াশোনা খেলাধূলাতে তার বেশ নাম ডাক। কিরণ বাবুও চান প্রতাপকে ডাক্তারী পড়াবেন। তাদের জেলা শহরেও একটা মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে। শহরের বাইরে বিস্তীর্ণ জায়গা ছিল। এদিকের শক্ত মাটিতে

চায-বাসও হয়না। সেই বিস্তীর্ণ পতিত প্রান্তর পড়ে থাকতো অসীমশূন্যতার মাঝে। এখন সেই বিস্তীর্ণ পরিত্যক্ত প্রান্তরের রূপ বদলেছে। সেখানেই গড়ে উঠেছে কলেজ বিলডিং - ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল। বড় আধুনিক হাসপাতাল। বহু রোগীও থাকে ওখানে। মেডিক্যাল কলেজ এখন বেশ পরিচিতি লাভ করেছে। কিরণবাবু চান প্রতাপ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে মেডিক্যাল কলেজে পড়বে। তিনি বলেন এখানেই ভর্তি করবেন প্রতাপকে। তাহলে সে বাড়িতে থেকেই যাতায়াত করতে পারবে। আর ডাক্তারী পাশ করলে সবাই জানবে ও বনেদী ডাক্তারই।

কিরণবাবু পেয়েছিল তার বাবা মদন ডাক্তারের গড়ে দেওয়া রাজ্যপাট। এবার প্রতাপও পাবে তেমিন করেই উত্তরাধিকার সূত্রে কিরণের গড়ে যাওয়া ডাক্তারি পাশের সিংহাসন। প্রতাপ এমনিতে শান্ত নম্র ছেলে। কিরণবাবু তার বয়স বাড়ার সাথে সাথে বদলে গেছে। এখন বেশীর ভাগ সমসয়ই সে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে যুক্ত। আর ইদানীং সে তার গুরুদেবের একটু বেশী অনুগত হয়ে পড়েছে। শহরের প্রান্তে গুরুদেবের আশ্রমের একটি শাখা আছে। তাদের গুরুদেবের প্রধান আশ্রম কলকাতার কাছে বেলঘরিয়ার এদিকে গঙ্গার ধারে। তবে এখানেও সেই গুরুদেবের প্রচুর শিষ্যসেবক তৈরী হয়েছে। তাদের আগ্রহেই তৈরী হয়েছে ওই মন্দির — আশ্রম সেবাকেন্দ্র। কিরণ বলে,

— প্রতাপ মন দিয়ে পড়াশোনা করো।

কিন্তু মানুয ভাবে এক আর হয় এক। কোন এক অদৃশ্য দেবতা, কোন অন্তরাল থেকে অঘটন ঘটিয়ে মানুষের সব হিসাব নিকাশগুলো ওলট পালট কবে দেয়। নন্দিতার অসুখ আর কমে না। কিরণ শহরের আরও দুতিনজন নামী ডাক্তারকে ডাকে। তাদের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসাও চলতে থাকে। নার্স — ওযুধপত্র — সেবা যত্নর ত্রুটি হয়না নন্দিতার। বাড়ির কর্ত্রী কিরণের মা মিনতি দেবীও বাড়িতে পূজো হোম যজ্ঞ করেন বৌমার মঙ্গলের জন্য।

প্রতাপও ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কিরণবাবু নন্দিতার অনুরোধে বিজিত করুণাকেও এনেছে। নন্দিতা বুঝতে পারে তার জীবন প্রদীপের তেল ফুরিয়ে আসছে। একদিন হঠাৎ নিভে যাবে — তার জীবনের সব আলো। তাই যেন যাবার আগে সে প্রিয়জনদের দেখে যেতে চায়।

কিরণের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে চলে গেল নন্দিতা তার সুখের সংসার পিছনে ফেলে। কিরণ স্তব্ধ হয়ে যায়। নিজে সে ডাক্তার, বহু মৃত্যুকে সে দেখেছে। জানে সে জীবনের শেয পরিণতি এইটাই। তবু তার মন মানে না। প্রতাপ, করুণা মায়ের শোকে হাহাকার করে ওঠে। মিনতি দেবী দেখেন তার ঘরের লক্ষ্মী চলে গেল। যে সংসার এতদিন নন্দিতার

হাতে ছিল সেই ভার আবার মিনতি দেবীর কাঁধে রেখেই চলে গেল।

মিনতি দেবী বলে,

— একি সর্বনাশ হলো, যে সংসার থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম ও আমায় সেই বাঁধনে ফেলে রেখে নিজে চলে গেল।

সংসার বড় বিচিত্র। তার বাঁধনও কঠিন। এখন সব শোক দুঃখ সয়ে মানুষ আবার বাঁচার লড়াই করে।

নন্দিতা চলে গেছে। করুণাও ফিরে গেছে তার স্বামীর সংসারে। সেই ঘাটশিলার বনবাংলোতে। এ বাড়ির জীবন যাত্রায় আবার একটা ছন্দ ফিরে আসে। প্রতাপ এবার মায়ের অসুখের জন্য জয়েন্ট্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসতে পারেনি, তবে সামনের বছর বসবে। এবছর তাই কলেজে ভর্তি হয়েছে। বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছে! মিনতি দেবী বাড়ির কাজের লোকজন নিয়েই কোনমতে সংসারে নিত্যকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সে অবশ্য কিরণ কে বলে,

— কি রে? সংসার তো দেখতে হবে। আমারও শক্তি সামর্থ ফুরিয়ে আসছে। তুই না হয় বিয়ে থা কর।

কিরণবাবু আর সংসার করেননি — এখন সে ডাক্তারীর সঙ্গে সমাজসেবা মূলক কাজই করে চলেছে। আর অবসরে দাবা খেলতে ভালোবাসে। কাউকে সঙ্গী না পেলে ড্রাইভার বেচুকে নিয়ে বসে যান দাবার আসরে।

লবঙ্গলতিকা এখন শহরে বেশ প্রতিপত্তি নিয়েই রয়েছে। কালীপদ বাবু গত হবার আগেই তিনি অনেক চেষ্টা চরিত্র করে নিখিলের সাথে তার বিয়ে দিয়ে যান। লবঙ্গ সেদিন কিরণের উপর চটে উঠেছিল। তবে বিয়ের পর নিখিলকে লবঙ্গ বলেছিল,

— তুমি আমার স্বামী, আইন তাই বলে,

নিখিল এমনিতে শান্ত ধরনের ছেলে। সেও বিয়ের প্রথমদিনই একজন দশাসই চেহারার ওজনদার মেয়েকে স্ত্রী হিসাবে দেখে কিছুটা ভীত হয়েছিল। কারণ নিখিলের চেয়ে মহিলার আয়তন দুগুণ বেশীতো হবেই। আর তার কণ্ঠস্বরও রীতিমত বলিষ্ঠ। এজলাস কাঁপিয়ে সে সওয়াল করে।

নিখিল বেচারা প্রথম ফুলশয্যার রাত্রে বেশ ভয়েই ঘরে ঢোকে। এমন একজন জাঁদরেল মহিলার সঙ্গে ঘর করতে হবে তা জানা ছিলনা তার।

তার পিতৃদেব অবশ্য ভেবেছে ছেলের জন্য আর ভাবতেই হবেনা। এমন একজন বলশালী নেত্রী আর বড়লোক শ্বশুর থাকতে তার ছেলের কোন বিপদ হবে না। নিখিল সে

রাতে লবঙ্গের কথায় বলে,

— হ্যাঁ, তাইতো —

লবঙ্গ বলে,

— তুমি থাকবে তোমার চাকরী নিয়ে। আর আমি থাকবো আমার ওকালতি আর দেশসেবার কাজ নিয়ে।

ভালো মানুষ নিখিল জানে এই মেয়েকে বেশী ঘাঁটানো ঠিক হবে না।

সেও বলে,

— তাই হবে। আমি তোমার কোন কাজে বাধা দেব না।

লবঙ্গ এমন বাধ্য স্বামী পেয়ে খুশী। বলে,

— কথাটা মনে থাকে যেন।

নিখিল অবশ্য সে সব শর্ত মেনেই চলে। নিখিল সকালে উঠে তার বাজার হাট সেরে চান খাওয়া করে ব্যাঙ্কে চলে যায়। লবঙ্গলতিকা চলে আসে তার বাবার বাড়িতে। এইখানেই তার চেম্বার। কালীপদবাবু কোর্টে বেশী যেতেন না। সব মক্কেলের কাজ করে লবঙ্গলতিকাই। আর তার ঐ বিশাল দেহ — সতেজ কণ্ঠস্বর শুনে এজলাসে ভিড় জমে যায়। প্রতিপক্ষের উকিলকেই লবঙ্গ ধমকে থামিয়ে দেয়। আর সাক্ষীদের কোর্টের কাঠগড়ায় তুলোধোনা করে। এইভাবেই সে সুপরিচিত।

এই শহরের দু একজন নেতা বুঝেছে মেয়েদের ভোটও পেতে হবে। তার জন্য তাদের দলে আনতে হবে লবঙ্গের মত তেজস্বিনী দাপুটে মহিলাকে। তার ভাষণ শুনতে শুধু মেয়েরাই নয় বহু পুরুষও আসে। শহরের অন্যতম নেতা কেশববাবু তাই লবঙ্গের কাছে যাতায়াত করে। কেশববাবু এদিকে কো। কিছু কল কারখানা মায় লোহা কারখানার শ্রমিকদের নেতা। কেশববাবু আগে স্কুল মাস্টারী করতো। তখন কেশববাবু একটা সাইকেলে ঘোরাঘুরি করতো। পরনে থাকতো ধুতি আর পাঞ্জাবি। আর কাঁধে একটা ব্যাগ। ক্রমশঃ দু-চারটে কারখানার শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে বাজারের ওদিকে একটা ঘর নিয়ে টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে গেল। একটা সাইন বোর্ডও লাগানো হল। শ্রমিক কল্যাণ অফিস। ক্রমশঃ সেই থেকে তার যাত্রা শুরু হল। তারপর ঐ শ্রমিকদের নিয়ে সে নতুন দল গড়ল। কয়েক হাজার শ্রমিক কৃষক এখন তাদের সভ্য — আর চাঁদা বাবদ — তহবিল বাবদ যা মাসে জমা পড়ে তার পরিমাণও নেহাত কম নয়। কেশববাবু জানেন শ্রমিক মালিক গোলমাল বাধিয়ে কি করে টাকা মোচড় দিয়ে আদায় করতে হয়। কেশববাবু শ্রমিকদের কাছে মোটা টাকা চাঁদা তোলে। আর মালিকদের কাছেও বেশ ভালো টাকা নেয় ধর্মঘট বানচাল করে দেবার জন্য. এসব টাকার হিসাবও দিতে হয় না।

কেশববাবুর স্ত্রীর নামে এখন ব্যাঙ্কে ভালো টাকাই রয়েছে আর কেশববাবু এখন সাইকেল ছেড়ে মোটর বাইক হাঁকায়। তার পরনে এখন পায়জামা — সাদা খদ্দরের দামী পাঞ্জাবী। কেশববাবুও এবার ডানা পালক মেলেছে। তার দলের হাঁক ডাকও বেড়েছে। তাই এবার পুরসভায় তার দল নির্বাচন লড়তে চলেছে। কেশববাবু চান পুরসভা দখল করতে পারলে তার দলের থেকেই এম. এল. এ. হবে এখান থেকে। আর কেশববাবুও স্বপ্ন দেখছে সেটারই। তাই তারও এবার লবঙ্গলতিকাকে পাশে দরকার।

কালীপদবাবু গত হবার পর তার সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিকারী হয়েছে লবঙ্গলতিকা। অবশ্য এর মধ্যে লবঙ্গলতিকা একটি একটি সন্তানের মাও হয়েছে। লবঙ্গের মেয়ে ঝিলিক এখন বড় হয়েছে। কলেজে পড়ছে। ঝিলিক তবে মায়ের আদল সে পায়নি। সে পেয়েছে তার বাবার আদলই। মায়ের মত বিপুলাকার নয় সে। বরং বাবার মতই সুন্দর স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের মেয়ে। এমনিতে বেশ সুন্দরীই। আর প্রাণ উচ্ছল মেয়ে। লবঙ্গলতিকা তার মেয়েকে যত্ন আত্তি করে মানুষ করেছে। লবঙ্গ তার ওই ওকালতি আর রাজনীতি করে। সব সময়ের জন্য একজন মহিলাকে রেখেছে। সেই মহিলা গানটানও জানে, ফলে ঝিলিক তার কাছে গানও শিখেছে।

লবঙ্গ ভোটে দাঁড়াতে চায়। পুরপ্রতিনিধি হবার সাধ তার। কেশব প্রায়ই তার চেম্বারে আসে। লবঙ্গ ফৌজদারী কেসে বিশেষ পরিচিত। কেশব বলে,

— বুঝলে লবঙ্গ, আগে কমিশনার হও। এরপর এসব এম. এল. এ. সিটে তো আসবে তো মেয়েদের কোটা। তখন এম. এল. এ. হতে পারলে মন্ত্রীও হতে পারো। আর আমিও দেখবো যাতে তুমি মন্ত্রী হতে পারো। লবঙ্গও স্বপ্ন দেখছে। সে ভোটে জিতবে প্রথবে কমিশনার, তারপর এম. এল. এ., তারপর মন্ত্রী। লালবাতি লাগানো গাড়িতে চড়বে। আগে আগে যাবে সাইরেন বাজিয়ে পাইলট কার। রাইটার্স বিল্ডিং-এর ঠান্ডা ঘরে বসে রাজ্যপাট চালাবে দাপটের সাথে। কেশববাবুও জানে লবঙ্গের নিজের টাকাকড়ির অভাব নেই, বাবারও জমানো টাকা আছে অনেক। আর ওকালতি করেও তার ভাল পসার।

সেদিন লবঙ্গ তার চেম্বারে কয়েকজন মক্কেলের কেস নিয়ে আয়োজন করছে। ফৌজদারী কেস হবে — গ্রামের কোন মাতব্বর একজনের জমি জোর করে দখল করেছে — এরা তাই কেস করতে চায়। লবঙ্গের মুহুরী ছাড়াও দু-তিনজন লোক আছে। ওদিকে একটা ঘরে সেই মক্কেলকে ধরে নিয়ে গিয়ে লবঙ্গের একজন লোক তার কপালে সপাটে রুলের ঘা মারতে কপালটা কেটে যায়। রক্ত পড়ছে। লোকটা ভাবতেও পারেনি যে মামলা করতে এসে এই ভাবে তাকে মার খেতে হবে। সেও চিৎকার করেছে,

— ওরে মধু। আমাকে বাঁচা — এ লোকটা আমাকে মেরে ফেললো। ওগো উকিল

বাবু আমি কেস করবো না গো। জমি যায় যাক। তবু পরাণটা থাকুক। ওগো ছেড়ে দাও গো। ওরে মধু —

লবঙ্গের সেরেস্তার অন্য লোকেরা তখন সেই মক্কেলের সঙ্গী মধুকেই ধরেছে — এবার মধুর হাঁটুতেই একটা ঘা মারতে মধু ছিটকে পড়ে। মধুও চীৎকার করে,

— ও কাকা এয়ে খুনে গো। এ কোথায় আনলি — ওগো উকিল বাবু —

ততক্ষণে অপারেশন হয়ে যেতে লবঙ্গ ঘরে ঢুকে আহত রক্তাক্ত মক্কেলদের বলে,

— থামো তো বাপু। চুপ করো —

মক্কেলরাও জাঁদরেল মহিলার বিপুল দেহ আর তার হুঙ্কার শুনে ভয়ে চুপ করে যায়। এবার এই মহিলা যদি একটা থাপ্পড় কষে এরা কাকা ভাইপো শেষ হয়ে যাবে। এবার উকিল বাবু বলে,

— ফৌজদারী মামলা, তায় জমি দখলের কেস। রক্তপাত কোন ইন্‌জুরি না হলে কেস জোরদার হবে না। এদের নিয়ে গিয়ে থানায় ডাইরি নাম্বার নিয়ে এসো। আমি ওদের পিটিশন লিখে রাখছি।

মক্কেলদের বলে,

— যাও থানায় যাও।

ওদের থানায় পাঠিয়ে এবার লবঙ্গ চেম্বারে পরবর্তী মক্কেলের জন্য হাঁক পাড়ে।

— নেক্সট।

এমন সময় কেশববাবু এসে হাজির। তার হতে ভোটের ফর্‌ম। পুরসভায় আসন্ন ভোটে এবার ও দাঁড়াতে হবে লবঙ্গকে। তার জেতা আসন আবার তাকে দখল করতে হবে। তবে কেশব শোনায়,

— এবার এই আসনে অন্যদল কিরণ ডাক্তারকেই প্রার্থী করেছে, লবঙ্গের এটা প্রেস্টিজের লড়াই। তবে এবার এখানেই ওই কিরণ ডাক্তারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে তোমাকে।

— কিরণ ডাক্তার দাঁড়াচ্ছে সে নাকি আবার ভদ্রলোক। লবঙ্গ চটে ওঠে ওই নামটা শুনে। ওই কিরণ ডাক্তারকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। ওই লোকটা তাকে চরম অপমান করেছিল একদিন। অবশ্য লবঙ্গ পরেও কিরণকে বেশ বেকায়দায় ফেলেছিল একবার একটা কেসে। কিরণের একটা পেসেন্ট সেবার মারা যায়। অনেক রোগীই তো সারে। তবে ঐ রোগীর অনেক জটিল অসুখ ছিল। তার অবস্থাও ভালো ছিল না। কিরণ সেটা বুঝে পেসেন্টের বাড়ির লোককে বলে

— তোমার বাবার অবস্থা ভালো নয়। তোমরা হাসপাতালে নিয়ে যাও।

কিন্তু রোগীর বাড়ির লোকজন বলে,

— ডাক্তারবাবু, জানি বাবার কঠিন অসুখ। হাসপাতালে তো এর কোনো চিকিৎসা হবে কিনা জানিনা। শেষ বয়সে কষ্ট পাবে সেখানে। তার চেয়ে বাড়িতেই যা হয় হোক। আপনি চিকিৎসা চালিয়ে যান।

কিন্তু তার চিকিৎসাও বিশেষ কিছু হয় না। শেষ অবধি একদিন রোগী মারা যায়। সেই রোগীর ভাই — লবঙ্গের মুহুরী। লবঙ্গও মুহুরীর কাছে কিরণ ডাক্তারের চিকিৎসা করার কথা শুনে চমকে ওঠে। লবঙ্গের মনের অতলে সেই অপমানের জ্বালাটা রয়ে গেছে। কিরণকে সে এবার কোর্টে তুলে নাস্তানাবুদ করেই ছাড়বে আর লবঙ্গ কিরণের সুখ্যাতিতে একটা কলঙ্কের দাগ লাগাতে পারবে। তাই মুহুরীকে বলে,

— তুমি আদালতে ওই কিরণ ডাক্তারের নামে কোর্টে কেস কর। তার ভুল চিকিৎসার জন্যই তোমার দাদা মারা গেছে। মোটা টাকা ক্ষতিপুরণ দাবী করে কেস করো।

মুহুরী বলে,

— দিদি! দাদার তো শরীর ভালো ছিল না। অনেক দিনের ব্যাধি — এমনিতেই তিনি চলে যেতেন।

লবঙ্গ চটে ওঠে,

— আমি যা বলছি তাই করো। মামলার সব খরচ আমার। আর আমি নিজেই লড়বো তোমার মামলায়। দেখবে হাজার পঁচিশেক টাকা ঠিক পেয়ে যাবে ক্ষতিপুরণ বাবদ।

মুহুরীও বুঝেছে দিদিকে চটানো ঠিক হবে না — আর বিনা খরচে যদি এতগুলো টাকা পাওয়া যায় সেটা তো ভালোই হবে। তাই সে মামলাই করে। ভুল চিকিৎসায় তার দাদার মৃত্যুর জন্য খেসারত ও চেয়ে বসে কিরণ ডাক্তারের বিরুদ্ধে আদালতে। শহরে এ ধরনের কেস এই প্রথম। লবঙ্গ এই কেসটাকে নিয়েই এবার তার মক্কেলের হয়ে লড়তে থাকে। তার উদ্যোগে এবার শহরের প্রেস ক্লাবের সভ্যদের সামনে লবঙ্গ তার মক্কেলকে নিয়ে একটা কনফারেন্স করে। কিরণ ডাক্তার ওসব খবর পেয়েছে। তার নামে সমনও আসে আদালত থেকে। কিরণ প্রথমে আমল দেয়নি। তারপর সেইসব প্রেস কনফারেন্স করতে দেখে এবার বোঝে এ সবের পেছনে রয়েছে সেই লবঙ্গলতিকা দেবী। তবে লবঙ্গ লতিকা দেবী আর আগের মত নেই।

কিরণের বরাত জোর যে ওই লবঙ্গলতিকার হাত থেকে বিয়ের রাতে বেঁচে গেছে। কিন্তু ঐ মেয়ে যে এবার তার অবজ্ঞার প্রতিশোধ নিতে চায় কাঠগড়ায় তুলে সেটা বুঝেছে কিরণ। সেও মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়ানকে জানিয়েছে। মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়ানের সভ্যরাও মিটিং করছে। তারাও লবঙ্গকে সাবধান করতে চায়। পেশাগত কাজের ত্রুটি নিয়ে কোর্ট কাছারি করবে না।

কিন্তু লবঙ্গও শাসায়,

— ফের আমাকে কিছু বলতে এলে আমি কিন্তু ওই কিরণবাবুর নামে আমায় হুমকি দেবার কেসই করবো।

কিরণও ছাড়ার পাত্র নয়। সে শাসায়,

— ঐ মামলা মোল্লার দৌড় মসজিদ অবধি। ওর দৌড় কোর্ট অবধি। আমি হাইকোর্ট. দরকার হলে দিল্লীতে সুপ্রিম কোর্ট অবধি যাবো।

এবার প্রেস কনফারেন্সের পর শহরের কাগজে কিরণের কেসটার বিশদ বিবরণ বের হয়। লবঙ্গলতিকা প্রেসের লোকদের কনফারেন্সের পর হোটেলে জোর পার্টি দিয়েছিল যাতে তার বেশ জোরালো ভাষায় লেখে।

ওসব খবর কিরণের কাছেও পৌঁছায়। কিরণের বন্ধুরাও এবার প্রেসের লোকেদের ডেকে ভরপেট খাদ্য বাড়তি দামী হুইস্কি গিলিয়ে লবঙ্গের সঙ্গে যে তার স্বামীর বনিবনা হয় না, তারা আলাদা থাকে তার বিশদ কাহিনীও প্রকাশ করে। এমনকি লবঙ্গ যে তার মক্কেলদের মিথ্যা মামলা সাজোবার জন্য নিজেদের লোক দিয়ে মারধোর করে থানায় মিথ্যা ডায়েরী করায় তারপর ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করতে আনে, সেইরকম বেশ কিছু খবরও দিয়েছে। মায় ক্লায়েন্টদের নাম ঠিকানাও দিয়েছে।

শহরে তখন উকিল আর ডাক্তারদের দুটো দলই হয়ে গেছে। লবঙ্গলতিকাও বিপদে পড়ে। তার বেশ কিছু হেরে যাওয়া কেসের ওইসব মার খাওয়া মক্কেলরাই এবার ডাক্তার বাবুদের কাছে সাহায্য পাবার আসায় সবকিছু বলে দেয়। আর কাগজের লোকজনও কিছু বিজ্ঞাপনের বিনিময়ে লবঙ্গের ওসব বিচিত্র কেসের রিপোর্ট ছাপতে থাকে। একটা কাগজে তো বিশালবপু এক উকিল মহিলা তার হাতে ডান্ডা দিয়ে মক্কেল পিটিয়ে কেস তৈরী করে কার্টুনও এঁকে ছেপেদেয়।

ব্যাপারটা চরমে ওঠে একদিন। কিরণবাবু এখনও তার সেই মান্ধাতার আমলের গাড়িতে করেই রুগী দেখতে যান। তার ড্রাইভার বেচুই গাড়ির মেজাজটা বোঝে। দরকার হলে কিভাবে নারকেল দড়ি দিয়ে ওর কোন যন্ত্রপাতি বেঁধে তাকে কোনমতে চালিয়ে আনতে হবে এসব বোঝে। বেচুই ঐ গাড়ির ফাদার মাদার, সে ই ওর সেবা যত্ন করে। লালন - পালন করে। চালনা করে। সেদিন কিরণবাবুকে শহরের একটা পাড়ায় যেতে হবে রুগী দেখতে। বেচু আসেনি — প্রতাপকেও স্কুলে যেতে হয় — মাও এখানে ওখানে যায়। তাই অন্য গাড়ির ড্রাইভার রাখতে হয়েছে। সে সবে কয়েক বছর গাড়ি চালাচ্ছে। বেচুর বাড়িতে কি কাজ রয়েছে। তাই ডাক্তার বাবুকে বলে ছুটি নিয়ে গেছে। ডাক্তারবাবুরও বাইরে কোন কল ছিল না। কিন্তু হঠাৎ শহরের মধ্যে কল আসায় কিরণ বাবু তার ওই

পুরোনো অস্টিন খানা নিয়ে বের হয়েছে। শহরের এদিকটা অনেক পুরোনো আমলের। পথগুলো সরু, ঘিঞ্জি, দুদিকে ঘন বাড়ি — পথের পাশে আদ্যিকালের ড্রেন। সেইরকমই রয়ে গেছে এখন। একটা ছোট গাড়ি কোন রকমে যেতে পারে মাত্র। দুটো গাড়ি এদিক ওদিক থেকে এলে সব জায়গাতে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না।

কিরণবাবু রোগী দেখে ফিরছেন — আর সেই পুরোনো গাড়িটা বিকল হয়ে গেছে। সরু পথ — গাড়িটাও বেশ মজবুত আর সেকেলে ধরনের। সারাপথ জুড়েই দাঁড়িয়ে পড়েছে। অসহায় ড্রাইভার বনেট খুলে এটা ওটা নাড়াচাড়া করছে। কিন্তু গাড়ি আর নড়ে না। হঠাৎ ওদিক থেকে একটা গাড়ি এসে পড়ে। সেটাও দাঁড়িয়ে যায় পথ না পেয়ে। ওদিক থেকে আসা গাড়িটা লবঙ্গের। লবঙ্গ কোর্টে যাবার আগে এই পথে কেশববাবুর ওখান থেকে আসছিল। দেরী হয়ে গেছে, কয়েকটা মামলার শুনানী আছে। আর সামনের ঐ গাড়িটাকে ঐ ভাবে থাকতে দেখে চীৎকার করে,

— এ্যাই, খাটোরা হাঠাও।

লবঙ্গ জানে গাড়িটা কিরণের। আর ঐ গাড়িটা শহরের অনেকেরই পরিচিত। কিরণও গর্জন করে ওঠে,

— নড়বে না। দরকার হয় ঘুরে যেতে পারেন।

লবঙ্গ গাড়ি থেকে পথে নেমে পড়েছে। কিরণ গাড়িতে বসে আছে। লবঙ্গ গজরাচ্ছে,

— আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। কোর্টে যেতে হবে —

কিরণ নীরব। ওর ড্রাইভার প্রভাত তখনও বনেট খুলে ঠুকঠাক করে চলেছে। লবঙ্গ বলে,

— লোহার দরে বেচে দিতে হয় যাকে সেই গাড়িতে চড়ে আবার ফুটানি।

কিরণ বলে ওঠে,

— মরা হাতি সওয়া লাখ। খাস ইংল্যাণ্ডের অস্টিন কোম্পানীর গাড়ি। তোমার মুড়ির টিনের বাক্স নয়। হর্নের শব্দ শুনেছো।

কিরণ ওর গাড়ির হর্নটা টিপতে বিকট শব্দে বেজে ওঠে হর্নটা। এ গাড়ি নড়বে না। যার দরকার হবে রিক্সা করে যাবে।

এদিকে কোর্টের জরুরী শুনানী, যেতেই হবে লবঙ্গকে। ড্রাইভার অবশ্য এর মধ্যে গাড়ি ঠিক করে ফেলেছে। স্টার্ট দিতে যাচ্ছিল কিন্তু ডাক্তারবাবুর হুকুম শুনে গাড়িটা স্টার্ট করে না। গাড়িটা মাদ্দল পাথরের মতো রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। লবঙ্গও শাসায়,

— দেখে নোব।

কিরণ বলে,

— আমিও দেখে নোব। গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। তার জন্য শাসানি। কলকজা কি শাসানি শোনে।

শেষ অবধি একটা রিক্সা থামিয়ে দু তিন জনের সাহায্য নিয়ে পাড়ার ছেলেরাই লবঙ্গদি কে রিক্সায় তুলে দেয়। রিক্সাওয়ালাও সওয়ারির ওজন দেখে বলে,

— ডবল ভাড়া দিতে হবে দিদি। এ- তো সওয়ারি নয় একেবারে তিন সওয়ারি। লবঙ্গ রাগে ফুঁসছে। কিরণ গাড়িতে বসে তার হেনস্থা দেখছে। রিক্সাওয়ালাকে বলে লবঙ্গ,

— তাই দেব। সাবধানে কোর্টে নিয়ে চলো।

এবার লবঙ্গের রিক্সা চলে যেতে কিরণ বলে,

— ড্রাইভার এবার স্টার্ট দাও।

কিরণ আজ লবঙ্গকে খানিকটা জব্দ করতে পেরেছে।

লবঙ্গ মামলাটা নিয়ে সেদিন কিরণকে কাঠগড়ায় তুলেছে। জেরার জন্য কিরণের উকিল রয়েছে। ওদিকে লবঙ্গলতিকা তখন উকিলের কালো কোর্ট পরে বাঘিনীর মত ফুঁসছে।

— মি লর্ড, কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ওই ভদ্রলোক পেশায় একজন ডাক্তার কিন্তু আসলে উনি হৃদয়হীন একজন পাষণ্ড। আমার মক্কেলেব দাদাকে উনি ঠিক মত টাকা না পেয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে খুন করেছেন। উনি খুনী।

কিরণের উকিলও এজলাসে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে,

— অবজেকশন মি লর্ড। আমার বিশিষ্ট উকিল বান্ধবী ডাক্তারী শাস্ত্রের কিছুই জানেন না। মেডিক্যাল বোর্ডের রিপোর্টকেও তিনি গলার জোরে নসাৎ করে দিতে চান। যা সাধারণত ওর এক্তিয়ারের বাইরে। মেডিক্যাল বোর্ডের পক্ষ থেকে আমি এই অবজেকশন জানাচ্ছি। এটা নোট করা হোক।

লবঙ্গ প্রথমে যত গর্জে উঠেছিল পরে দেখেছে কেসটা নিয়ে বেশী গর্জন করা ঠিক হবে না। কিরণ ডাক্তারের স্বপক্ষে মেডিক্যাল বোর্ডই রিপোর্ট দিয়েছে। আর মহামান্য আদালতও সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে কিরণের পক্ষেই রায় দিয়েছে। মামলার রায় বের হবার দিন ডাক্তার - এর দল বাদ্যি বাজনা করে শহরের পথে শোভাযাত্রা করে। বন্ধু ক্লাবের ছেলেরা যারা কিরণের দলে তারাতো আবীর মেখে নাচও করলো — শোনা যায় কোন দল নাকি ঢোল সানাই নিয়ে ওই বিশালদেহী লবঙ্গের মত একজনকে সাজিয়ে খেউরও গেয়েছিল শহরের পথে। বিরাট মিছিল — লবঙ্গের দলের কাছেও সব খবরই যায়। কেশব ঘোষ এখন শহরের এক দলের নেতা। সে লবঙ্গের পক্ষে, ফলে তার দলবলও এর প্রতিবাদে সভা করে।

লবঙ্গলতিকা রাগে ফুঁসছে। জীবনে সে প্রথম লড়াইতে কিরণের কাছে হেরে গিয়েছে। লবঙ্গ তার প্রতি কিরণের অপমানটা ভোলেনি। তাই কিরণকে শিক্ষা দেবার জন্য মুহুরীর ঐ কেসটাকে সাজিয়েছিল অনেক ভেবে চিন্তে। প্রথম প্রথম আদালতে কাহিল হয়ে পড়ে জেরার চোটে। তারপর কিরণ মেডিক্যাল বোর্ডের দ্বারস্থ হয়। মেডিক্যাল বোর্ড চিকিৎসার সবদিক বিবেচনা করে কিরণের পক্ষে রায় দেয়। লবঙ্গ হেরে যায় এবারও।

লবঙ্গের মেয়ে ঝিলিক তখন কলেজে সবে ভর্তি হয়েছে। সে মায়ের ঐ কেস নিয়ে এত লাফালাফি করতে দেখে বলে,

— এসব ফাল্তু মামলা কেন করছ মা? মেডিক্যাল বোর্ড যখন রায় দিয়েছে তখন আর করার কিছুই নেই। এতসব হৈ চৈ হচ্ছে তোমাকে নিয়ে এবার থেমে যাও।

লবঙ্গ বলে মেয়েকে,

— এটা আইনের ব্যপার। তুমি যা জানো না — তা নিয়ে কথা বলো না। যাও তোমার পড়াশোনা করগে।

ঝিলিক চেনে তার মাকে। তার মাকে দেখেছে বড় জেদী আর একগুঁয়ে। এসব অতীতের জমিদারদের স্বভাব ছিল। আজ সমাজ অনেক এগিয়েছে। প্রকাশ্যে কেউ ভদ্র সমাজে ঝগড়া করে না। কাউকে ভালো না লাগলে কৌশলে এড়িয়ে যায়। ঝিলিকের মায়ের ঐ জেদ ভালো লাগে না। ঝিলিক দেখে মায়ের ঐ জেদের জন্যই বাবাও যেন মাকে কেমন এড়িয়ে যায়। নিখিল বাবু এখন চাকরী থেকে রিটায়ার করেছেন। তার শরীর ভালো নেই। নিখিল বাবুও দেখেছেন লবঙ্গের ব্যাপারটা। দিনরাত এখন মামলা — মকদ্দমা — কোর্ট আর বাকী সময় ঐ কেশব বাবুর সঙ্গে মিটিং মিছিল নিয়েই ব্যস্ত। নিখিল মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসে। এ বাড়িতে থাকে মায়ের সঙ্গে ঝিলিক। এতদিন দেখছে মা যেন তার কথা ভাবে না। ঝিলিক তখন স্কুলে পড়ে। তখন তার বাড়িতে ছিল সর্বক্ষণের জন্য একজন গৃহশিক্ষিকা। ঝিলিক দেখে ওর মা শুধু মক্কেলদের নিয়েই ব্যস্ত। আবার কখনও দেখে ওপাশের ঘরে মায়ের নির্দেশে কোন মক্কেলকে ফৌজদারী মামলা জোরদার করতে তাকে পেটানো হচ্ছে। রক্ত ঝরছে — আর্তনাদ করছে লোকটা। শিউরে ওঠে ঝিলিক। তার মা ঐ রক্তপাত দেখে খুশী হয়ে বলে,

— এবার পুলিশ রিপোর্ট করে এসো। তোমার মামলা এবার জিতবই।

ঝিলিকের মনে হয় মা যেন একটা মারকুটে গুন্ডা — সে স্নেহময়ী মা নয়। তখন থেকেই ঝিলিকের একটা কেমন বিতৃষ্ণা এসে গেছিল। তবু মায়ের কাছে যেত। দেখেছে তাদের স্কুলের ফাংশানে সব মেয়ের মায়েরা আসে। তাদের মেয়েদের নাচ গানের তারিফ করে। ঝিলিক গানও গায় সুন্দর। তার জন্য তার স্কুলেও নাম ডাক আছে। স্কুলের বাৎসরিক

অনুষ্ঠানে তার গান হয়ে ওঠে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

ঝিলিক সেবার অনুষ্ঠানে গান গাইবে। তারও আশা তার মা আসবে ঐ অনুষ্ঠানে। ঝিলিক সেদিন মায়ের চেম্বারে আসে। লবঙ্গ তখন জরুরী কেসের আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত। ওদিকে কেশব বাবুও তার দলে পেতে চায় লবঙ্গের মত তেজস্বী হাঁক ডাক ওয়ালা মহিলাকে। আর লবঙ্গ তার দলের একজন পৃষ্ঠপোষকও। দায়ে বিদায়ে মোটা টাকাও দেয় চাঁদা হিসাবে। ঝিলিক ঘরে ঢুকে কেশবকে দেখে অখুশী হয়। ঐ লোকটা শহরের নানা ঝামেলায় থাকে। ওদের নিয়ে মাঝে মাঝে পথ অবরোধ, মিটিং, মিছিল করে।

লবঙ্গ এসময় ঝিলিককে তার চেম্বারে দেখে খুশী হয় না। বলে,

— কি চাই?

মেয়ের সঙ্গে ওর শুধু চাওয়া পাওয়ার সম্পর্ক। ঝিলিক বলে,

— মা, কাল আমাদের স্কুলের ফাংশন। আমি চিত্রাঙ্গদার পার্টটা করছি। কাল তোমাকেও যেতে হবে বিকেলে।

লবঙ্গ কি ভেবে বলে,

— কাল বিকেলে?

— হ্যাঁ, তখনতো কোর্ট বন্ধ হয়ে যায়। কোর্ট থেকে চলে যাবে স্কুলে।

লবঙ্গেরও মনে হয় ও যাবে। কাল তার কোর্টও তখন থাকবে না। কিন্তু কেশবই বলে,

— কাল তিনটেয় তো আমাদের দলের জরুরী মিটিং, শনিবার বিকেলে তুমি ফ্রি থাকবে বলেই তো ঐ সময়ে মিটিং ডেকেছি। তোমাকে তো থাকতেই হবে লবঙ্গ।

লবঙ্গেরও খেয়াল হয়। দলকে তার হাতে রাখা দরকার। ভোটেও দাঁড়াতে হবে তাকে। কেশবকেও চাই সেই লড়াইএ তার পাশে। তাই লবঙ্গ বলে,

— ঝিলিক আমার আর তো যাওয়া হবে না।

অর্থাৎ কেশবই হলো মায়ের কাছে মেয়ের চেয়ে বেশী। ঝিলিক বের হয়ে আসে।

ওদিকের ঘরে বাবাকে দেখে এগিয়ে যায় ঝিলিক। ঝিলিক - এর বয়স হয়েছে। সেও দেখেছে বাবার সঙ্গে মায়ের সম্পর্কটাও তেমন ভালো নয়। বিয়ের পর থেকেই লবঙ্গকে এখানে থাকতে হত মক্কেলদের জন্য। তারপর কালীপদবাবু মারা যাবার পর লবঙ্গ আর শ্বশুর বাড়িতে যায়নি। এই বাড়িতেই রয়ে গেছে।

এই সময় ঝিলিক আসে। নিখিলও তখন নিজের বাড়ি ছেড়ে এ বাড়িতে রয়েছে। বিয়ের পর নিখিল ভেবেছিল লবঙ্গ এবার ওর কথামত ওই বাইরের কাজকর্ম, ক্লাব ছেড়ে সংসারী হবে। লবঙ্গ কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে গিয়েই বুঝেছে এখানে বৌ সেজে শাশুড়ীর

ওখানে সে থাকতে পারবে না। শাশুড়ী অর্থাৎ নিখিলের মা বলে,

-- বৌমা। ওই সব কালো কোর্ট পরে আদালতে গিয়ে ঘরের বৌ হয়ে দাগী চোর গুন্ডাদের সঙ্গে ওঠা বসা করা যাবে না মা। যা করার করেছো। এবারে ঘরের বৌ! দত্ত বাড়ির অন্য বৌদের মতই চলতে হবে বাছা। হুটহাট বের হতে পারবে না। আর যে সে আসবে তার সঙ্গে দেখাও করা যাবে না।

এসব কথা শুনে সেই রাতেই লবঙ্গ নিখিলকে বলে,

— এ বাড়িতে আমার থাকা হবে না।

নিখিল অবাক হয়.

— কেন?

লবঙ্গ বেশ বড় স্বরে গলা তুলে ওদিকে থাকা শাশুড়ীকে বলে শুনিয়ে,

— তোমার মা বলেন ওকালতি করা যাবে না। শহরের কোন ক্লায়েন্টের সাথে সম্পর্কও থাকবে না। কলা বৌ হয়ে ঘরের মধ্যে আমি থাকতে পারবো না। তোমার মাকে বলে দাও। আমি কালই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।

নিখিল তার স্ত্রীর ভাষণ শুনে চমকে ওঠে,

— এ কি বলছ?

লবঙ্গ সোচ্চার হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ। এই আমার শেষ কথা। আমি বাবার ওখানেই থাকবো। তুমিও ওখানে থাকতে পারো। এ বাড়িতে আমার থাকা হবে না। শাশুড়ি এগিয়ে আসে। তিনিও বেশ তেজী মহিলা। নতুন বৌ এর এই কথায় বলে নিখিলের মা।

— ঘরের বৌ কিনা শহর দাপিয়ে বেড়াবে ছেলেদের মত। এজলাসে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করবে — এ হতে পারে না। ঘরে বন্দী হয়েই থাকতে হবে। এই আমার শেষ কথা।

এবার যেন বারুদের স্তূপে দেশলাই কাঠি পড়েছে। ফুঁসে ওঠে লবঙ্গ,

— জোর করে আমাকে রুখবেন। জানেন বধূ নির্যাতন আইন কি বলে? অ মায় জোর করে আটকানোর চেষ্টা করলে আজই আমি আদালতে সেই ধারায় মামলা করবো — আপনাকে পুলিশ হাজতে তুলে দেব। আর নিখিলকে দেখিয়ে বলে জোর গলায়,

— তোমাকেও! তারপর জেলবাসের ব্যাবস্থাই করে দেব। চাকরীও চলে যাবে। থাকবে জেলে মা ছেলেতে।

নিখিল চমকে ওঠে। আর শাশুড়ীও এহেন শাসানিতে এবার সত্যিই ভয় পায়। ফৌজদারীর আইন জানে ঐ মেয়ে। সে জানে আজকাল তো বধূ নির্যাতনের কেসে গুষ্টিশুদ্ধ

তুলে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। শাশুড়ীও এবার ঐ শাসানিতে পিছু হঠে। বলে,

— এ কি রায়বাঘিনী মেয়ে ঘরে এনেছিসরে নিখিল। এ যে জেলে পুরবে বলছে।

নিখিলও বলে,

— শুধু জেলেই পুরে দেবে না মা — এ মেয়ে চাকরীও নষ্ট করে দেবে বলছে। লবঙ্গের ঐ শাসানিতেই শাশুড়ীর বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেঁরো হয়ে যায়। লবঙ্গও চলে আসে বাবার এখানে। তারপর দ্বিগুণ উৎসাহে তার নিজের কাজ করে চলেছে।

নিখিল মাঝে মাঝে আসে এ বাড়িতে। ওর মেয়ে ঝিলিক আছে মায়ের কাছে। ঐ ঝিলিকের টানেই নিখিল এ বাড়িতে আসে। এখন নিখিলও একা। মা মারা গেছে। তখন অবশ্য নিখিল বলেছিল লবঙ্গকে,

— এবার তো মা নেই। ঐ বাড়ি ফাঁকা পড়েই আছে। ওখানেই চলো — তখন লবঙ্গ অনেক কাজে জড়িয়ে পড়েছে। মামলার সংখ্যাও বেড়েছে। আর এ বাড়িতেও কেউ নেই। লবঙ্গ বলে,

— এইখানেই বেশ আছি। ও বাড়ি বিক্রী করে তুমিই চলে এসো এখানে। নিখিল অবশ্য তার নিজের বাড়ি বিক্রী করেনি। সেও বুঝেছে লবঙ্গের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা ঠিক হবে না।

তাই সে নিজের বাড়িতেই রয়েছে। লবঙ্গ থাকে নিজের মত করে এ বাড়িতে। দুজনের টানাপোড়েনের মাঝে ঝিলিক কেমন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। বরং তার রাগ পড়ে মা আর ওই কেশব বাবুর ওপরেই। মা এখন কেশব বাবুর কথাতেই যেন ওঠা বসা করে। ঝিলিকের মনে তাই জাগে নীরব এক প্রতিবাদ। মাকে সে ঠিক মেনে নিতে পারে না। অন্য বান্ধবীদের দেখেছে তাদের মায়ের সঙ্গে কত মধুর সম্পর্ক। তাদের বাড়িতে মা, বাবা, ভাই, বোন মিলে সুখে দুঃখে তারা এক হয়ে আছে। আর ঝিলিক এতকিছু থেকেও সে যেন নিঃসঙ্গ, একা। এই জীবনটাকে মেনে নিতে পারে না ঝিলিক। লবঙ্গ ওই কিরণের মামলায় হেরে যাবার পরও আবার কোনভাবে আঘাত দেবার কথা ভাবছে। মুহুরী বেশ চতুর লোক। সে জানে লবঙ্গের এই মনের জ্বালাটা। তাই দিদিমনিকে খুশী করার জন্য সেও এখন কিরণ বাবুর ক্যাম্পের লোকেদের ঠিক সাহায্য করতে পারে না। মুহুরীই লবঙ্গের ঘর গৃহস্থালীর কাজকর্ম কিছুটা দেখাশোনা করে। লবঙ্গের ড্রাইভার চাই — সে ই তার চেনাজানা বিশু ড্রাইভারকে আনে। অবশ্য বিশুর সঙ্গে তার গোপন একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে যায়। বিশুর মাইনে ঐ মুহুরী কিছুটা বাড়িয়ে দেবে। সাধারণ ড্রাইভারের মাইনে দু হাজার। মুহুরী তাকে আড়াই হাজার দেবে। তার বদলে বিশু নিরু মুহুরীকে তিনশো টাকা করে দেবে। তারপর তেল মবিলটা এদিক ওদিক করে সেটা বিস্তর। বাড়িতে কাজের লোকও রেখেছে নিরু।

ভূতনাথকে সেই চাকরীতে বহাল করেছে। নিরুই ভূতনাথকে নিয়ে বাজারপত্র মাসকাবারী দোকানের মাল এ সব আনে। তার থেকেও নিরুর আমদানী ভালোই হয়। আর মুহুরীগিরির টাকাতো আছেই --- আর নিরু মক্কেলদের মোচড় মেরেও ভালোই রোজগার করে।

মামলা জেতার পর ঐ কিরণ বাবুও এবার মনে মনে তৈরী হচ্ছে ওই লবঙ্গ উকিলকে সেও এবার মুখের মত জবাব দেবে। কিরণ লবঙ্গের এই আক্রমণের প্রতিরোধ করছে আর তৈরী হয়েছে প্রতিঘাতের জন্য, এতদিন সে এইসব কথা ভাবতো না। নিজের ডাক্তরী আর সমাজ সেবার কাজ নিয়েই থাকতো। এবার বুঝেছে প্রত্যাঘাত না করলে ওই বুলডোজার লেডি আবার যে কোন ছুতোয় আঘাত করবে কিরণকে। তার দলবলও চায় লবঙ্গকে আবার একটা ঘা মারা হোক। কিরণ বাবুর সংসারের ভার মিনতি দেবীর ওপর। সেও তার একমাত্র নাতি প্রতাপকে নিয়ে আর বাড়ির কাজের মেয়ে — কাজের লোক এদের নিয়েই থাকে। বেচু ড্রাইভারও ঠাকুমার খুব প্রিয়। বেচু এমনিতে বেশ রসিক। সর্বদা হৈ চৈ নিয়ে থাকে। লবঙ্গের ঐ মামলার কথায় মিনতি দেবীও ঘাবড়ে যান। সেও ভালোমতই চেনে ঐ লবঙ্গলতিকাকে। তারও অমত ছিল ঐ দাপুটে মেয়েকে ঘরের বৌ করে আনতে। সেই মেয়ে এখন তাদের পেছনে লেগেছে। কিন্তু এত কৌশল করে তাকে এড়িয়ে থাকার পর সেই মেয়েই কিরণের নামে কেস করেছে।

মিনতি দেবী বলে,

— কি সাংঘাতিক মেয়ে রে! এখন কি হবে বাবা।

কিরণও ভাবনায় পড়েছে।

বেচুই বলে,

— কয়েক ঘা দিতে হবে। বলেন তো দিই পাড়ার দলবল নিয়ে ওই স্টীম রোলারের পেছনে লাগিয়ে। ওর বারোটা বাজিয়ে দেবে পল্টুর দল।

কিরণ বলে,

— যাক। তোকে আর মস্তানি করতে হবে না। আমি কোন অন্যায় করিনি। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। ও মামলা টিকবে না।

মিনতি বলে,

— তাই যেন হয় বাবা। মা কালীর কাছে আমি মানত করছি। সেই মামলার রায়ও বের হয়। কিরণ বাবুকে আদালতই ওই সব অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়েছে।

এবার বাড়িতে তাই মিনতি ঘটা করে কালীপূজো করতে চান। তার জন্য মিনতি দেবী নাতনী করুণা আর নাতজামাই বিজিতকে আসতে বলেছে। বিজিত ঘাটশিলার ওদিকে একটা ফরেস্ট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার। সে হাসিখুশী তরুণ। করুণাও বিজিতের মত স্বামী

পেয়ে খুবই খুশী।

শহর থেকে দুরে বন পাহাড়ের মধ্যে ওদের ছোট একটা বাংলো। তার পাশ দিয়ে একটা পাহাড়ী নদী ঝিরিঝিরি জলস্রোত বুকে নিয়ে বয়ে চলেছে। চারধারে শাল মহুয়ার গাছ। তার ছায়ায় ফরেস্ট কলোনীর কোয়ার্টারগুলো। ওদিকে বড় রাস্তার ধারে ফরেস্ট অফিস। কিছু দোকানপত্রও রয়েছে সেখানে। শান্ত নির্জন জায়গা মাঝে মাঝে পথ দিয়ে বাস ট্রাক ছুটে যায়। করুণা এই জায়গাতেই বাসা বেঁধেছে। বিজিতও ভালোই আছে। এমনদিনে তারা চিঠি পায় কিরণবাবুর কাছ থেকে। ওদের বাড়িতে কালীপূজোর আয়োজন হচ্ছে। তাদেরও যেতে হবে। করুণা বলে.

— চলো দিনকতক ঘুরে আসি।

বিজিত বলে,

— তোমার আদেশ ম্যাডাম। যেতেই হবে। দেখি ছুটির দরখাস্ত করে দিই। বিজিতরাও এসেছে এখন। মিনতিও খুশী। প্রতাপও দিদি, বিজিতকে পেয়ে খুশী। এমনিতে বাড়িতে একা একা থাকে। মাও নেই তাই দিদি জামাইবাবুকে আসতে দেখে প্রতাপেরও মনে হয় বাড়িটা যেন আনন্দে ভরে উঠেছে।

পুজোর বাজার হাট করতে হচ্ছে বেচু মায় হরিপদকেও। কিরণ বাবুও ব্যস্ত। এর মধ্যে বিজিতও মিনতির কাছে শুনেছে লবঙ্গ উকিলের কথা। বিজিত সব শুনে বলে,

— সত্যি বুলডোজার মহিলাতো। একদিন দেখতে হচ্ছে তাকে।

করুণা বলে,

— বাঘের দেখা সাপের লেখা -- ওসব না দেখাই ভালো। ওই রায়বাঘিনীর তিন হাতের মধ্যে গেলে মামলা ঠুকে দেবে।

বিজিত বলে,

— আমি বনবাদাড় ঘুরি। সাপ বাঘ আমার অনেক দেখা আছে। তবে রায়বঘিনীতো দেখিনি।

বাজারে গেছে বিজিত। সঙ্গে ওই বেচু আর কাজের লোক। মাছের বাজারে গেছে বেচু। সেদিন বৃষ্টিই হয়েছে। মাছের আমদানী তেমন নেই। একজন দুটো ইলিশ মাছ নিয়ে বসে আছে। বিজিত বেচু গিয়ে দর করে মাছ দুটোর। মাছওয়ালা বলে,

— একশো টাকা কেজি। এর কমে পারবো না বাবু —

বিজিত কি বলতে যাবে। বেচুও রয়েছে। সে বলে,

— আশি টাকা করো — দুটো মাছই নেব।

লবঙ্গের মুহুরী নীরুও বাজারে এসেছে ভূতনাথকে নিয়ে। সেও জানে ইলিশ মাছ

দিদির খুব পছন্দ। তাই নীরু এসে বলে,

— মাছ দুটো দিয়ে দাও হে — নাও তোমার দাম।

নীরু জানে বেচু এই কিরণ ডাক্তারের লোক। তাদের প্রতিপক্ষ, সুতরাং তার নাকের ডগা দিয়ে চড়া দামে মাছ কিনে নিয়েছে শুনলে লবঙ্গদি খুশীই হবে।

সে ফট করে তিনটে একশো টাকার নোট বের করে মাছওয়ালাকে দিতে যাবে, এবার বেচুও ফোঁস করে ওঠে,

— খবরদার নীরু ও মাছের দর আমি করেছি। মাছ দুটো আমিই নেব। টাকা কি তোর ঐ হাতি মার্কা উকিলের একারই আছেরে, আমাদের ডাক্তার বাবুরও আছে।

বেচু এবার চারখানা নোট বের করে মাছওয়ালার সামনে ধরে মাছ দুটো তুলে নিতে যাবে। নীরু গর্জে ওঠে। তার শীর্ণ দেহ — যেন ফুলে উঠেছে। গর্জে ওঠে সে।

— খবরদার — বেচু — শালা ডেরাইভার। টাকা দেখাস আমাকে? বেচু তখন টাকা ফেলে মাছ দুটোর দখল নিয়েছে। আর নীরুও এবার বেচুকে জাপটে ধরে মাছ দুটো কেড়েই নিতে যায়। নীরুর তুলনায় বেচুর দেহটা অনেক বেশী মজবুত, বেচুও মাছ দুটো ওপরে তুলেছে। ছোটখাটো চেহরার নীরু তখন লাফিয়ে সেই মাছের নাগাল পেতে চাইছে নীরু একা না পেরে এবার হাঁক পাড়ে,

— ওকে ধর ভূতো। কেড়ে নে মাছ দুটো। আমার সামনে থেকে ও ব্যাটা মাছ কিনে নিয়ে যাবে। ধর —

ভূতোও এবার এগিয়ে আসে। বেচুও এবার একটা ঝটকা মারতে নীরু ছিটকে পড়ে মাছের বাজারে মাছের তেলকাঁটা ফেলা জমাট কাদার উপর আর সর্ব্বাঙ্গে তার ঐ আঁশটে গন্ধের কাদা লেগে একেবারে কিম্ভূত কিমাকার হয়ে গেছে নরু মুহুরী। ভূতোও নীরুর এইরকম অবস্থা দেখে আর এগোয় না বেচুর দিকে। বেচু তখন মাছ দুটো নিয়ে বিজয়ীর মতো হাসছে। কাদা মাখা নীরুকে বলে সে,

— যা তোর উকিল দিদির কাছে গিয়ে নালিশ করতো। ব্যাটা মাছ লুঠ করবি?

এর মধ্যে বাজার কমিটির সেক্রেটারীও এসে পড়ে। সেও দেখেছে নীরুর ওই মাছ লুঠ করার ব্যাপারটা। মাছওয়ালা তার আশাতীত দাম পেয়ে বলে,

— বেচুই মাছগুলো কিনেছিল বাবু। ওই মুহুরীই এসে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাছ কেড়ে নিতে গেছল।

লবঙ্গ সেদিন বাড়িতে রয়েছে। ছুটির দিন, আজ তার কোর্ট নেই। ও বেলায় টাউন হলে মিটিং - এর ভাষণ তৈরী করছিল কেশব বাবু — আর কয়েকজন ছোটখাটো নেতাও রয়েছে। এমন সময়ে সর্ব্বাঙ্গে আঁশটে গন্ধওয়ালা কাদা মেখে ওই নীরুকে ঢুকতে দেখে

প্রথমে চিনতে পারেনি লবঙ্গ। লবঙ্গ গর্জে ওঠে,

— এ্যাই কে তুমি? কাদা মেখে ভূত সেজে এসেছ এখানে? নীরুর মুখ চোখে ভূতনাথই বলে,

— মেমসাহেব। ওইতো মুহুরী মশাইগো। বাজারে ওকে কিরণ ডাক্তারের ড্রাইভার যা পটকে দিল। মাছওয়ালার আঁশবটিতে পড়লে দু আধখানা হয়ে যেতো — তা মা কালী বাঁচিয়েছেন গো। উনি কাদায় ছিটকে পড়েছেন — একেবারে মাখামাখি। তুলে এনেছি কোন মতে। নীরু এর মধ্যে মুখের কাদা সরিয়ে তার মুখখানা দেখায়। চমকে ওঠে লবঙ্গ। নীরু বলে,

— ইলিশ মাছ দুটো কিনবো বলে গেছি। তা ওই শালা বেচু বলে বাড়িতে জামাই এসেছে, মাছ লাগবে। ও - চারশো টাকা দিয়ে ছিনিয়ে নিল মাছ দুটো আমার হাত থেকে। আমাকে খুন করে ফেলতো। কোন মতে ছিটকে পড়ে প্রাণে বাঁচলাম। ও বলেছে দরকার হলে শ্যাষ করে দেবে।

এবার লবঙ্গও গর্জে ওঠে,

— এতবড় হিম্মৎ আমার মুহুরীর হাত থেকে মাছ ছিনিয়ে নেয় ওই ডাক্তারের ড্রাইভার। জামাইকে ইলিশ মাছ খাওয়াবে।

নীরুও এবার ইন্ধন যোগায়।

— জামাইটাও ছিল সঙ্গে। তার কি হাসি ম্যাডাম —

কেশবও বলে,

— এসব কি করছে ঐ ডাক্তারের লোকজন?

অন্য এক নেতা বলে,

— এর পিছনে ডাক্তারবাবুর কলকাঠি রয়েছে। দিদি ওর নামে কেস করেছিল সেই রাগে।

লবঙ্গ বলে,

— ওরা নীরুকে হেনস্থা করেনি। করেছে আমাকে। এসব ওদের মারামারির পরিকল্পনা। আমাকে হেনস্থা করার জন্যই আমার লোককে এইভাবে মেরেছে। এটেম্পট - টু - মার্ডার — সেকশন থ্রি হানড্রেড টু — তারপরই লবঙ্গ তার বিশাল দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে,

— চল — থানায় চল। আজই এফ - আই - আর করে কালই কেস করে দিচ্ছি। জামাইকে ইলিশ মাছ খাওয়াবে? জামাইকে জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বো। দেখে নেবো কিরণ ডাক্তারকে। এই চল নীরু আমার সঙ্গে থানায়। এর প্রতিকার কেমন করে করতে হয় তাই দেখাচ্ছি এবার ডাক্তারকে। কি ভেবেছে ও আমাকে পদে পদে ইনসাল্ট করবে আর

আমি সায়লেন্ট হয়ে থাকবো।

শহরের থানায় এসেছে নতুন দারোগা মনোজ ভট্চায। বেশ কড়া লোক। এই শহরের ছেলে। অবশ্য এখানে সে বেশী দিন ছিল না। পুলিশে চাকরী পাবার পর বাইরে ঘুরেছে চাকরীর জন্য। এখন সবে কয়দিন হলো এখানে পেয়িং গেষ্ট এসেছে। মনোজ বাবু থানার অফিসে বসে ফাইল পত্র দেখছে। হঠাৎ ওদিকে পথের ধারে গাড়িটাকে থামতে দেখে চাইল। গাড়ি থেকে নামছে এক বিশালাকার ভদ্রমহিলা। তার দেহটা যেন একটা অশ্বত্থ গাছের কান্ডের মতো। ড্রাইভার ওকে ধরে কোনমতে দাঁড় করিয়ে দিতে এবার মনোজ দারোগাও চিনতে পারে। ছেলেবেলায় ঐ লবঙ্গকে সেও দেখেছিল তখনই ছিল বাচ্চা হাতির মতো — দুর থেকে তাকে দেখে সরে যেতো তারা। কোন উকিলের মেয়ে। তারপর বহুদিন আর এখানে ছিল না মনোজ। এবার তাকে অনেকদিন পরে দেখেও ঠিক চিনেছে তাকে মনোজ, অবশ্য লবঙ্গ তাকে চেনে না, কারণ ওদের বাড়িটা শহরের ওদিকে হলেও ও পাড়ার দিকে যাতায়াত ছিল না মনোজের। আর মনোজেরও তেমন কোন বৈশিষ্ট ছিল না যে লোকে তাকে চিনবে। তবে লবঙ্গের ওই বিশেষ বৈশিষ্টর জন্য লবঙ্গের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়তো।

মনোজ নিজের কাজ করে চলেছে। দেখা যায় সেই মহিলা দরজা খুলে দারোগাবাবুর ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে কোন রকমে তার দেহটাকে সেট করে বেশ জোরালো গলায় কাদামাখা নীরুকে দেখিয়ে বলে,

— একটা এফ আই আর করতে এসেছি। আমার নাম লবঙ্গ লতিকা। আমি একজন এ্যাডভোকেট —

মনোজ চাইল। লতিকা নয় প্রকান্ড একটা কান্ড। তবু দারোগা মুখে গাম্ভীর্য নিয়ে জিজ্ঞাসা করে,

-- কি হয়েছে? কি কেস?

লবঙ্গ গর্জে ওঠে,

-- সেকশন থ্রি হানড্রেড টু — এ এটেম্পট টু মার্ডার। একে মার্ডার করতে চেয়েছিল। এই আমার মুহুরী।

মনোজ বলে,

— ওকেই বলতে দিন কি হয়েছিল। ওর মুখ থেকে শুনতে চাই। নীরু জানে কেস কিভাবে সাজাতে হয়। পাকা মুহুরী সে। তাই এবার বেশ হাঁপিয়ে বাজারের সেই বেচুর ঘটনাকে বর্ণনা করে। মায় ডাক্তারের জন্য বিজিত বাবুও যে বেচুকে প্ররোচিত করেছিল তাও জানায় — মনোজ বাবু সব শুনছেন। নীরু তার বর্ণনা শেষ করতে এবার গর্জে ওঠে লবঙ্গ,

— ডাইরী করে এখুনি ওই ডাক্তারের ড্রাইভার, তার জামাই দুটোকেই এ্যারেস্ট করে আনুন। আর কেস দিয়ে কোর্টে চালান করুন।

মনোজ দারোগাও দুঁদে দারোগা সেও জানে কাকে কি করতে হবে। বহু চোর ডাকাত গুন্ডা থেকে আজকের গজিয়ে ওঠা দুনম্বরী নেতাদের সে ঠাণ্ডা করেছে। দুচার জন নেতাকেও সে লকআপে পুরে সদরে চালান করেছে। তাই সেও এসব উকিলকে ভয় পায় না, তা যতই বিশালাকার হোক না কেন। দারোগা বাবু বলেন,

— কি করতে হবে আর কোন সেকশানে কেস দিতে হবে না হবে সেটা তদন্ত সাপেক্ষ।

লবঙ্গ ফুঁসে ওঠে,

— মানে? আমি বলছি -

— আপনি বললেই কি হবে? আইন আপনি যেমন পড়েছেন ক্রিমিনাল ল আমাদেরও তেমন পড়ানো হয়েছে। আমি আপনার কেসটার ডাইরী নিচ্ছি — তারপর তদন্ত যা করবার করবো।

লবঙ্গ গর্জন করে,

— তাহলে এ্যারেস্ট করবেন না? আমার কথা মানবেন না?

কথা শেষ করেই উত্তেজনার বসে লবঙ্গ টেবিলে ওর হাতুড়ির মতো হাতের একটা ঘা মারতে দারোগা বাবুর জলের গ্লাশটা ছিটকে পড়ে সশব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। একটা টেলিফোনও ছিটকে পড়ে মেঝেতে। ছোট বাবু ছুটে আসে ওদিকের ঘর থেকে। কে জানে বড়বাবুর ঘরে বোমা টোমা ফাটল নাকি?

মনোজ দারোগাও ওর হাতের জোর দেখে চমকে উঠেছে। তবু দারোগার গাম্ভীর্য নিয়ে বলে,

— ম্যাডাম এবার এসব করলে আপনাকে শান্তি ভঙ্গ করার দায়ে এ্যারেস্ট করতে বাধ্য হবো। এটা সরকারী অফিস — আপনি যেই হোন আইন ভঙ্গ করলে আইনই আপনাকে সাজা দেবে।

লবঙ্গই এবার বুঝেছে উত্তেজনার বসে যা করেছে সে সেটা মোটেই ঠিক কাজ করেনি।

মনোজ দারোগা বলে,

— ছোট বাবু। আপনি এই লোকটার অভিযোগ শুনে একটা জেনারেল ডাইরী করে আজই বাজারে গিয়ে একবার তদন্ত করে আমাকে রিপোর্ট দেবেন। তারপর যা করার করা হবে।

লবঙ্গ তখন গজরাচ্ছে,

— আমি এর নিরপেক্ষ তদন্ত চাই — আর দোষীদের এ্যারেস্ট না করলে কালই আমি কেস করবো।

দারোগা বাবু বলেন,

— এখন যা করার আমাকে করতে দিন। যান ছোট বাবুর সঙ্গে। তারপর কাল যা করার করবেন। তবে আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন। অকারণে এত উত্তেজিত হবেন না — এটা ক্ষতিকর হতে পারে।

লবঙ্গ দারোগার উপদেশ কানে না দিয়ে এবার ছোটবাবুর ঘরেই চলে গেলেন কেস লেখাবার জন্য।

কিরণের বাড়িতে তখন দুপুরের খাবার আয়োজন হয়েছে। বেচু তো আজ হিরো হয়ে গেছে। বিজিত বলে,

— সেই ম্যডামকে চোখে দেখিনি। তবে মনে হচ্ছে এবাড়ি ভারসাস্ ওবাড়ি একটা লড়াই চলছে। কি নাম — হ্যাঁ লবঙ্গ লতিকা দেবীর মুহুরী তো মাছ দুটো নিয়েই নিয়েছিল — বেচুদা ডাটে চারশো টাকা দিয়ে মাছ তুলে নিল, আর মুহুরীও ছাড়বে না।

তারপর বেচু বলে,

— আমার হাত থেকে মাছ কেড় নেবে। এক ধাক্কায় ব্যাটাকে ছিটকে ফেললাম হাঁটুভোর কাদায়।

কিরণ গোঁফ উঁচিয়ে ওর লোকেদের কথা শুনছিল। এবার বেচুকে ওইভাবে লবঙ্গের লোককে ডাইরেক্ট হিট করতে দেখে খুশী হয়ে বলে,

— রাইটলি সলভ্। ব্যটা মুহুরীটা ওই বুলডোজারের হয়ে লড়তে আসে তোর সঙ্গে? আমার কেনা মাছ কেড়ে নেবে? ঠিক করেছিস।

মিনতি দেবী বলে,

— হিরু ওই বেচুও কম গুন্ডা নয়। নিশ্চয়ই কিছু করেছে ওই লবঙ্গের লোকেদের। এসব কি হচ্ছে? এযে যুদ্ধই শুরু হয়েছে।

কিরণ বলে,

— আমার নামে মামলা করবে — মিথ্যা মামলা। আমার লোকের হাত থেকে মাছ কেড়ে নেবে — আমি চুপ করে থাকবো না। নেভার — কিরণ ফুঁসছে। এমন সময় মনোজ দারোগা। এখন অবশ্য তার দারোগার পোষাক নেই গায়ে। ধুতি পাঞ্জাবী পরেই এসেছে ভগ্নীপতির বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। সম্পর্কে মনোজ — এর দিদি ছিল নন্দিতা, কিরণ তাই ওদের বাড়ির জামাই। তবে সেটা ছাড়াও কিরণের সাথে তার পরিচয়

ছিল। একই ক্লাবের সভ্য তারা। নন্দিতা আজ নেই, তবু ওদের সম্পর্কটা আজও রয়ে গেছে। মিনতিও মনোজকে খুবই স্নেহ করেন। এতদিন মনোজ অনেক দুরে দুরে ছিল। মিনতি ওদের স্নেহ করে খেতে দেয়। খেতে বসে মনোজ বলে,

— প্রতাপকে দেখছি না?

— তার কলেজে এ্যানুয়াল ফাংশান। তাই নাকি নাটকের রিহার্সাল আছে ওদের। আমিও বাধা দিইনি। সামনের বছরতো মেডিক্যাল কলেজে ঢুকবে। সেখানে যা পড়ার চাপ নাটক মাথায় উঠবে। যা করার এখনই করে নিক।

মনোজ বলে,

— তা ভালো। এইতো আনন্দ ফুর্তি করার বয়স। বিজিতকে দেখে বলে — তুমি যে এসেছো সে খবরও পেয়েছি বাবাজী।

কিরণ বলে,

— পুলিশ কি আজকাল কার বাড়িতে মেয়ে জামাই আসছে সে খবরও রাখছে? পুলিশের কি হাল হলরে।

মনোজ বলে,

— না হিরুদা। আজ বাজারে ঐ ইলিশ মাছ কেনা নিয়েই যা কান্ড হয়েছে শুনলাম। ওই লবঙ্গলতিকা ও তার মুহুরীকে নিয়ে এসেছিল থানায়।

কিরণ চমকে ওঠে লবঙ্গের থানায় আসার খবর শুনে। সে বলে,

— থানায় এল ওই বুলডোজার কেন?

— তোমার ড্রাইভার বেচু নাকি তাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। আর তার সহযোগী ছিল নাকি তোমার জামাই।

কিরণ গর্জে ওঠে,

— হোয়াট। এত বড় সাহস ওই মহিলার। ওকে আমিই গুলি করে উড়িয়ে দেব। এ্যাটেম্পট টু মার্ডার নয় — মার্ডার করবো আমার পেছনে লাগার — কাঁটা টাকে শেষ করে দেবো।

মিনতিও অবাক হয়,

— ওমা সে কি কথা বাবা মনোজ! বেচুটা মারপিট করে জানি তাই বলে বিজিত — ওমা। ওকে জড়াবে মামলায়।

কিরণ গর্জে ওঠে,

— আমিও মামলা করবো।

মনোজ বলে,

— আরে তুমিও তো দেখছি ওই বুলডোজারের মত শাসাচ্ছ। ওসব কেসের তদন্ত করে আমিই ফিনিস করে দিচ্ছি। এরপর আর কোন কেস করতে গেলে পুলিশই ওর বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেবে। লবঙ্গলতিকার আর একেসে করার কিছুই নেই। এখন শান্ত হয়ে বসে ইলিশ মাছ খাওতো। খাও হে বিজিত — না মাসীমা, সত্যি বেচু দারুন ইলিশ এনেছিস।

বাড়ির পরিস্থিতি আবার সহজ হয়ে ওঠে। মিনতি বলে,

— বেণু, হরিপদ। তোমরা খেয়ে দেয়ে বাকী বাজার পত্র করে আনো পূজোর বাজার। বেচু আবার কোন গোলমাল বাধাবি না। ঐ লবঙ্গের ত্রিসীমানার মধ্যে যাবিনা। গেলেই বিপদ হবে। এ বাড়ির সবাই ওই সাবধান বাণী মানে, কিন্তু বেচু এসব মানার বা ঐসব বারণ শোনার প্রয়োজনও মনে করে না।

প্রতাপ এখন কলেজে পড়ছে। সুন্দর স্বাস্থ্য প্রতাপের। সুপুরুষ চেহারা আর বন্ধু মহলেও সে সুপরিচিত। বড় ঘরের ছেলে। কিরণ তাকে মোটা টাকা হাত খরচ দেয়. গাড়িও এনে দিয়েছে। প্রতাপ নিজেই গাড়ি নিয়ে কলেজে আসে। বন্ধুরাও তার দয়াতে ক্যান্টিনে ভূরি ভোজনই করে। কলেজে বার্ষিক উৎসবে ওদের নাটক হবে। কালচারাল সেক্রেটারী ঝন্টুদা ই নাটকের ডিরেক্টর সেও প্রতাপকে চেনে ভালো করেই। শহরের নামী ডাক্তারের ছেলে আর প্রতাপ এমনিতে মিশুকে। সকলের সঙ্গে সে সহজেই মিশে যেতে পারে। মেয়েদের মহলে প্রতাপকে নিয়ে অনেক আলোচনাই হয়। সেদিন প্রতাপ কলেজে আসছে। বর্ষাকাল। মাঝে মাঝে মেঘ জমে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, আবার থেমেও যাচ্ছে। তখন রোদও ওঠে। ঝিলিকও এই কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে। মেয়েটা এমনিতে বেশ হাসিখুশী। ঝিলিকের জন্য ওর মা লবঙ্গলতিকাও গাড়ির ব্যবস্থা করতে চায়। তবে তেমন কাউকে ড্রাইভার খুঁজে পায়নি। লবঙ্গ দেখছে ড্রাইভারের জন্য যারা আসছে তারা সকলেই তরুণ। কমবয়সী আর ওদের হাবভাবও তেমন পছন্দ হয় না লবঙ্গের। লবঙ্গ দু একটা সিনেমাও দেখেছে। একটা ছবিতে দেখেছে বাড়ির মেয়ে শেষ অবধি ছোকরা ড্রাইভারের সঙ্গে প্রেম করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তখন থেকেই লবঙ্গের ছোকরা ড্রাইভারদের ওপর একটা এলার্জি আছে।

নিজের গাড়ি না হলে যাতায়াত করা খুবই কষ্টকর। কিছুটা হাঁটলেই সে হাঁপিয়ে যায়। আর দেখছে পথ দিয়ে হেঁটে গেলে বহু লোকের নজর পড়ে তার ওপর। দু চারটে মন্তব্যও কানে আসে, সেগুলো মোটেই সুখশ্রাব্য নয়। তাই গাড়িতেই যাতায়াত করে সে। ঝিলিককে বলে,

— কয়দিন রিক্সাতেই যাতায়াত কর। রিক্সা বলে দিয়েছি। তারপর ড্রাইভার পেলে

গাড়িতে যাতায়াত করবি।

ঝিলিক সেই মত রিক্সাতেই যাতায়াত করে। শহরের এদিকে এখনও কিছুটা সরকারী ডাঙা পড়ে আছে। আগে ওখানে অনেক শাল মহুয়া গাছ ছিল। দেদার ভাবে গাছগুলো কেটে নেবার ফলে জায়গাটা খালি পড়ে আছে। সেদিন ঝিলিক চলেছে — বৃষ্টিও নেমেছে। ক্রমশ সেই বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। রিক্সার ত্রিপলে সেই বৃষ্টি আটকায় না। রিক্সায় বসেই ভিজছে ঝিলিক। বইখাতা গুলো বুকের কাছে চেপে রেখেছে। তবুও ভিজে শাড়ির সংস্পর্শে এসে ওগুলো ভিজছে। চলছে মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টি থামার নাম নেই। তার সঙ্গে শুরু হয়েছে উথাল পাথাল ঝড়। পথের ধারের গাছ গুলোর ঝুটি ধরে কে যেন নাড়া দিচ্ছে। ঝিলিকের ভয় করে। মনে হয় ঝড়ের দাপটে রিক্সাটাই ছিটকে পড়বে নীচের জমিতে। ভয়ে শিউরে উঠছে সে। হঠাৎ এমন সময় গাড়িটা এসে পাশে দাঁড়ায়।

প্রতাপও কলেজ আসছিল — পথের মধ্যে হঠাৎ এমন ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। বিপন্ন রিক্সার কাছে গাড়িটা থামিয়ে বলে,

— ঝিলিক গাড়িতে এসো। উঠে পড়ো গাড়িতে —

ঝিলিক চেনে প্রতাপকে। ওদেরই কলেজে পড়ে। চেনা মুখ — আর ছেলেটাও ভদ্র। তাকে এই বিপদের মধ্যে এসে পড়তে দেখে ঝিলিকও ভরসা পায়। ঝিলিক দেখছে তবু শাড়ির আঁচল টলমল করছে। রিক্সা থেকে নামতে ও ভয় পায় ঝিলিক। প্রতাপই গাড়ি থেকে নেমে এসে ওর হাত ধরে রিক্সা থেকে নামিয়ে এদিকের দরজা খুলে গাড়ির সামনের সীটে বসিয়ে নিজেই পকেট থেকে রিক্সাওয়ালাকে একটা কুড়িটাকার নোট ধরিয়ে ড্রাইভারের সীটে বসে। এর মধ্যে প্রতাপও ভিজে গেছে বৃষ্টির তোড়ে। গাড়িতে বসে প্রতাপ দেখছে ঝিলিককে।

— একি একেবারে ভিজে গেছ যে।

ঝিলিকও নিজের দিকে চেয়ে এবার লজ্জা বোধ করে। শাড়ি জামা ভিজে গেছে। তার যৌবন মদির দেহের রেখাগুলো সোচ্চার হয়ে ওঠে। সুন্দর মুখখানা ভিজে গেছে। প্রতাপ দেখছে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওকে। ঝিলিকের মনেও কি সুর জাগে। সে দেখছে ভিজে যাওয়া একটা তরুণের বলিষ্ঠ যৌবন পুষ্ট দেহ — নারী পুরুষের এই অপরূপ স্নেহময় রূপ আজ যেন ওদের দুজনের চোখে কি অপূর্ব মাধুর্য নিয়ে দেখা দেয়। তখনও ঝড়ের তাণ্ডব চলছে। প্রতাপ বলে,

— এই অবস্থায় কলেজে গিয়ে কি হবে? আজ কলেজ হবে না। চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছে ফিরে যাই।

ঝিলিকও ভিজে গেছে। ঠাণ্ডায় কাঁপছে সে। এসব ছেড়ে ফেলে শুকনো শাড়িই পরা দরকার। ঝিলিক বলে,

— তাই ভালো। আমি উকিল পাড়ার ওদিকে থাকি।

প্রতাপ গাড়িটা ব্যাক করে শহরের দিকে চলেছে। বৃষ্টি তখনও সমানে চলছে। পথ দিয়ে জলস্রোত বয়ে চলেছে। তারই মধ্যে কোনরকমে গাড়ি চালিয়ে আসছে প্রতাপ। পথে লোকজনও কম।

শহরের এপ্রান্তে উকিল পাড়া। কোর্ট কাছারি এলাকার কাছাকাছি এই এলাকাটা এখন জমজমাট হয়ে উঠেছে। উকিলদেরও যে বেশ রমরমা আছে তা এখানে এলে বোঝা যায়।

ওদিকে একটা বড় গেটওয়ালা বাড়ির সামনে ঝিলিকের কথামত গাড়িটা দাঁড় করায় প্রতাপ। ঝিলিক চেনে ওর মাকে। এমনিতে কড়া আর রক্ষণশীল ধরনের মহিলা। নিজে ওকালতি — দল নিয়ে মস্তানি করলেও তার মেয়ের ব্যাপারে খুবই কড়া। লবঙ্গ চায় না তার মেয়ে যার তার সঙ্গে মিশুক। লবঙ্গ বলে,

— মেয়েদের সাবধান হতে হবে। আজকালকার ছেলেরা অসভ্য — ইতর। কলেজে যাবি মেয়েদের সঙ্গে মিশবি। ক্লাশ করবি — তারপর বাড়ি ফিরে আসবি। কলেজের ছেলেদের সঙ্গে একদম হৈ চৈ করবি না। মাকে চেনে ঝিলিক। উকিল না হয়ে পুলিশের দারোগা হলেই যেন ভালো হতো। পদে পদে শাসন। এতটুকু সঙ্গ দেবার সময় নেই। মা নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। নিঃসঙ্গ ঝিলিক তবু পদে পদে শাসনই করে।

ঝিলিকের মনে হয় আজ প্রতাপ তাকে এতবড় বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। নিজেও ভিজে গেছে। তাকে বাড়িতে এনে এক কাপ কফি খাওয়াতে পারলে খুশী হতো ঝিলিক। কিন্তু মায়ের জন্য সাহস হয় না। ঝিলিকের ভয় হয় মা যদি কিছু মনে করে তাই প্রতাপকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারে না। প্রতাপ ওকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়।

ঝিলিক বাড়িতে ঢুকে দেখে মা নেই। বৃষ্টির আগেই সে কোর্টে বেরিয়ে গেছে। এবার ঝিলিকের আফশোষ হয়। প্রতাপকে বসার ঘরে আনলেই ভালো করতো। কিন্তু তা আর হবার নয়। তবু ঝিলিকের মনে আজ যেন একটা নতুন সুর জাগে। বারবার মনে পড়ে প্রতাপের কথা।

প্রতাপও বাড়ি ফেরে সুন্দর সন্ধ্যা নিয়ে। এর আগেও কলেজে সে ঝিলিককে দেখেছে। তার মনে হয়েছে সত্যিই একটা বিদ্যুতের ঝিলিকই। চকিতের মধ্যে ওই আলোর আভাস যেন প্রতাপের মনের সব অন্ধকারকে দুর করেছে। ওর সেই বৃষ্টি ভেজা দেহ কমনীয় মুখ ডাগর চোখের সলজ্জ চাহনি প্রতাপের মনে এক দুর্বার সাড়া আনে।

পরদিন সেই মেঘের আভাস আর নেই। মেঘমুক্ত নীল আকাশ আলোয় ভরে গেছে। বৃষ্টি বিধৌত গাছগাছালির পাতায় আলো যেন ঝলমল করছে। প্রতাপ কলেজে

গেছে — দেখে ঝিলিকও গেছে তার আগেই। ওকে দেখে একটা গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসে সে। প্রতাপ বলে,

— কি শরীর ঠিক আছে তো? কাল যা ভিজেছিলে?

ঝিলিক বলে,

— না - না। ঠিকই আছি — তুমিও বেশ ভিজেছিলে।

— এমন কিছু নয়।

এদিকে কলেজের ঘন্টা বাজছে। ছেলেমেয়েরা ক্লাশে যাবে। করিডরে তাদের ভিড়। ওদিকে তখন কলেজ ইউনিয়নের মদন - অর্ক - সুপ্রকাশ ওদের দল করিডরে পথ আটকে পিকেটিং শুরু করেছে। ওদের লীডার অর্ক। তার বাবা কেশব বাবু শহরের নেতা। ঝিলিক কেশব বাবুকে তাদের বাড়িতে দেখেছে। লোকটা যেন গায়ে পড়ে এসে মাতব্বরি ফলাবে। তার মাও ওই কেশব বাবুর দলের হয়েই পুর প্রতিনিধি হয়েছে। কেশববাবু অবশ্য তার জন্য দফায় দফায় মোটা টাকা নেয়। আর সে টাকা কোথায় যায় তা ঝিলিক এতদিন মাকে জিজ্ঞেসা করেও উত্তর পায়নি। বরং লবঙ্গ তার ওপর চটে ওঠে,

— এসব প্রশ্ন কেন? এটা আমার ব্যাপার। তোমার এ বিষয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে।

ঝিলিক থেমে যায়। তবে কেশব বাবুকে সে সহ্য কহতে পারে না। তার ছেলে অর্ব ও বাবার রাজনীতিতে এখন থেকেই হাতে খড়ি করছে। দল বেঁধে হৈ চৈ করে, এমনকি মারপিট করে কলেজ ইউনিয়ন দখল করেছে। ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারেও নানা ভাবে টাকা রোজগার করে। কলেজে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে অর্কের দল মাঝে মাঝে ক্লাশ বয়কট — ছাত্র ধর্মঘট এসব করে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের দাবী আদায় করতে চায়। ওদের কমন রুমের কিছু সুবিধার জন্য ছাত্ররা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিল। কর্তৃপক্ষ সে সব দাবী মেটানোর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। তবু আজ অর্কের দল সেইসব দাবী আরও তাড়তাড়ি আদায়ের জন্য ক্লাশ বয়কট করতে চায়। তাই অর্ক তার দলবল নিয়ে ভাষণ দিচ্ছে।

অনেক ছাত্রছাত্রীরাই অর্কদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করে না। তারা ক্লাশে যেতে চায়। ঝিলিকও তাদের অন্যতম। অর্কদের ঐ লোভী রাজনীতিকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। তাই ঝিলিক বলে,

— তোমাদের এই স্বার্থপর রাজনীতি আমি ঘৃণা করি — এসব তোমাদের খামখেয়ালী ভাব। আমরা ক্লাশে যাবো।

অনেকেই এবার সাহস পেয়ে বলে,

-- তাই চলো আমরা এসব মানি না।

ঝিলিকও জেদী মেয়ে। অর্কও তা ভালো করেই চেনে। আর অর্কেরও নজর আছে ঝিলিকের উপর। জানে অর্ক — ওর দাদু — মায়ের অনেক টাকা — গাড়ি বাড়ি সব আছে। কোন রকমে ঝিলিককে হাতে আনতে পারলে তাকে আর ভাবতে হবে না। রাজকন্যা মায় রাজত্ব এসে যাবে। অর্ক ঝিলিককে বলে,

— ঝিলিক। জানি তুমি আমাদের মতকে সমর্থন করবেই।

ঝিলিকও কঠিন স্বরেই বলে,

— না। নিজের স্বার্থেই তোমাদের এইসব আন্দোলন। ছাত্রদের ক্ষতি করে নিজেরা নেতা সাজতে চাও।

নন্দ এগিয়ে আসে,

— একদম বকবে না। চুপচাপ সরে যাও, নাহলে —

— নাহলে কি করবে?

নন্দকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে ঝিলিক। নন্দও দলের মধ্যে তার প্রাধান্য দেখাতে চায়। একটা মেয়ের চ্যালেঞ্জের জবাব তাকে দিতেই হবে। নন্দই এগিয়ে আসে। ক্ষিপ্ত বাঘের মতো গর্জে ওঠে,

-- নইলে তোমার কলেজে ঢোকাই মুশকিল হয়ে যাবে। কি করবো জানো যদি ইচ্ছা করি তোমাকে তুলে কলেজের বাইরে রেখে দিয়ে আসবো।

ঝিলিকও বিপদে পড়েছে। ছেলে - মেয়েরাও নন্দের কথায় বেশ ঘাবড়ে গেছে। নন্দ বলে,

— নন্দকে চেন না।

এবার এগিয়ে আসে প্রতাপ। তার দলবলও কম নয়। নন্দের চেহারাটা প্যাকাটির মতো। তবু তার বীরত্ব কম নয় — এবার প্রতাপ এগিয়ে আসে। সুন্দর স্বাস্থ্য ওব — কলেজের ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন। সকলেই ভালোবাসে প্রতাপকে। প্রতাপই গর্জে ওঠে,

— নন্দ কলেজটা তোর বাবার নয় যে যখন যা খুশী তাই করবি। একে তাকে গেটের বাইরে করে দিবি। বরং তোকেই গেটের বাইরে রেখে আসবো। দেখি এরপর কলেজে মস্তানি কি করে করিস — প্রতাপ কথাটা শেষ না করে নন্দের সিটকে দেহটাকে দুহাতে উপরে তুলে নিয়েছে। নন্দ এবার বেগতিক দেখে চীৎকার করে,

— এই প্রতাপ ছাড়। ছাড়।

অর্কও দেখছে যে ব্যাপারটা অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। অন্য ছেলেরাও বলে,

— দে ওকে বাইরে ফেলে দিয়ে আয়। কলেজের একটা পাপ তবু দুর হবে।

অর্কই বেগতিক দেখে বলে,

— প্রতাপ ওকে ছেড়ে দে।

প্রতাপ বলে,

— ছেড়ে দিতে পারি। ওকে ঝিলিকের কাছে মাফ চাইতে হবে। একজন মেয়ের সঙ্গে যে সম্ভ্রম রেখে কথা বলতে হয় সেটা বুঝিয়ে দে ওকে। তখন শূণ্যে চিঁ চিঁ করছে নন্দ। অন্যদের কথায় ওকে নামিয়ে দেয় প্রতাপ। নন্দ জানে লড়াইএ কখন ব্যাকগিয়ার দিতে হয়। বলে প্রতাপ,

— ক্ষমা চা ঝিলিকের কাছে।

নন্দও বলে,

— সরি। ঠিক ওভাবে কথাটা বলতে চাইনি।

ঝিলিকও দেখছে নন্দকে। এবার সেই সকলকে বলে,

— ক্লাশে চল।

ছাত্রছাত্রীর দল ক্লাশে চলে যায়। বাইরে তখন দাঁড়িয়ে আছে অর্ক নন্দদের দল। তাদের সব আন্দোলন আজ এই ঝিলিক প্রতাপ দুজনেই শেষ করে দিয়েছে। মদন বলে,

— আমাদের কর্মসূচী সব চৌপাট হয়ে গেল। ওরা ক্লাশে চলে গেল।

নন্দ বলে,

— ওই ঝিলিক কেমন ফুঁসে এল। দিতাম ওকে জবাবটা — তা প্রতাপ ওই ভাবে এসে পড়বে সেটা ভাবিনি।

দিলীপ বলে,

— প্রতাপ এখন ঝিলিকের খুব কাছের মানুষ হয়েছে।

নন্দ বলে,

— হ্যাঁ, তাইতো দেখছি। একেবারে মনের মানুষ। না হলে আর কেউ এল না প্রতাপ এসে রুখে দাঁড়াল। একটা সিনক্রিয়েট করে আমাদের আন্দোলনকে চৌপাট করে দিল।

অর্ক ভাবছে কথাটা। ঝিলিকের প্রতি তার একটা বিশেষ দূর্বলতা আছে। অর্ক মাঝে মাঝে ঝিলিকের কাছাকাছি যেতে চায় নানা ছলে। কিন্তু অর্ক দেখছে ঝিলিক পাত্তাই দেয় না। আর আজ বুঝেছে অর্ক ঝিলিক কেন পাত্তা দেয় না। হয়তো প্রতাপই তার মনের মানুষ হয়ে উঠেছে। অর্ক এ সমস্ত ব্যাপার নিয়ে কোন মন্তব্যই করে না। সে বলে,

— চল ক্লাশে চল। পরের কর্মসূচি পরে ভেবে ঠিক করা যাবে। নন্দ তখনও ফুঁসছে,

— ওই প্রতাপকে এই অসভ্যতার জবাব দিতে হবে। আমাদের দলের এগেনস্টে যাবে? এসব আমরা টলারেট করবো না।

বিকেলে কলেজের পর ঝিলিককে নন্দরা একটা শিক্ষাই দেবে। ওদের মধ্যে এমন একটা আলোচনাই হয়। ঝিলিকের কোন ব্যাবস্থা না করতে পারলে কলেজে অর্ক নন্দর কোন মান সম্মান থাকবে না। ওরা জানে ঝিলিক রিক্সায় করে বাড়ি ফিরবে। আজ তাকে বিপদে ফেলার জন্য নন্দই ঝিলিকের রিক্সাটা এলে বলে,

— তোমার দিদিমণি আজ আগেই চলে গেছে।

দু একদিন দু একটা পিরিয়ড না থাকলে ঝিলিক আগেই অন্য রিক্সা নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। আজও হয়তো সেই রকমই হয়েছে। তাই ভেবে রিক্সাওয়ালা অন্য যাত্রীকে নিয়ে আবার চলে যায়। ঝিলিক কলেজ থেকে বের হয়েছে। তার দেরী হয়ে গেছে লাইব্রেরীতে। তার রিক্সাওয়ালাকে সে দেখতে পায় না। এসময় রিক্সা আর নেই। তাকে এতটা পথ হেঁটেই যেতে হবে। পথের আশেপাশে এখন জঙ্গল কিছুটা আছে। পথটা কলেজের ছুটির পর নির্জন হয়ে যায়। নন্দ — দিলীপরা একটা ঝোপের ধারে তৈরী হয়ে বসে আছে। আজ ঝিলিককে তারা একটা শিক্ষাই দেবে। ঝিলিক রিক্সা না পেয়ে ভাবছে। দেখে প্রতাপ তার গাড়ি নিয়ে বের হয়ে আসছে। সেও ঝিলিককে দেখে দাঁড়ায়। কলেজের মাঠও ফাঁকা হয়ে গেছে। প্রতাপ বলে,

— এখনও রয়েছো কলেজে?

ঝিলিক বলে,

— আমার রিক্সাওয়ালা এখনও আসেনি।

প্রতাপের সঙ্গী বরেন গাড়িতেই এসেছিল। ওই নন্দরাই তাকে বললো তুমি চলে গেছ। ওতো ফিরে গেছে।

ঝিলিক এবার বুঝেছে নন্দদের শয়তানি। ঝিলিক বলে,

— আমাকে জব্দ করার জন্যই এসব করেছে। এখন একা একা এতখানি পথ হেঁটে যেতে হবে।

প্রতাপ বলে,

— উঠে এসো গাড়িতে। তোমায় ছেড়ে দিয়ে যাবো।

ঝিলিক গাড়িতে ওঠে। বরেন বলে,

— ওই নন্দটা মহাশয়তান। আজ ঝিলিক তাদের সব আন্দোলনকে ভেস্তে দিয়েছে তাই এসব করছে।

ঝিলিক বলে,

— হয়তো আরও কোন বদ মতলব আছে ওদের। ওরা আমায় শিক্ষা দিতে চায়।

প্রতাপ গাড়িটা নিয়ে চলেছে — পথও জনহীন। নন্দ - দিলীপরা ঝোপের ধারে

বসে নজর রাখছে পথের উপর। ঝিলিক ফিরবেই কিন্তু দেখে প্রতাপের গাড়িটাই আসছে — আর ওই গাড়িতে বসে আছে ঝিলিক। ওদের আর কিছুই করার নেই। এবার নন্দও বুঝেছে ঝিলিকও এবার তার দলে পেয়েছে প্রতাপকে। ওকে নন্দরাও সমীহ করে। প্রতাপও ওদের দেখে গাড়ি থামায়। বলে,

— কি নন্দ? মাঠের মধ্যে কার জন্য অপেক্ষা করছিস রে?

নন্দ দেখেছে ঝিলিককে। কিন্তু কিছু করার উপায় তার নেই। নন্দ বলে,

— কি করবো? আমাদের তো গাড়ি নেই -- হেঁটেই কলেজে যাতায়াত করতে হয়। এখন বাড়ি ফিরছি।

প্রতাপ গাড়ি নিয়ে চলে যায়। ঝিলিক বলে,

— দেখলে তো আমার জন্যই ওরা অপেক্ষা করছিল প্রতাপ। ভাগ্যিস তোমরা ছিলে, নইলে কি যে হতো।

প্রতাপ বলে,

— তুমি নিশ্চিন্ত থাকো ঝিলিক। ওরা তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

ঝিলিকও যেন আজ প্রতাপের সাহচর্য পেতে চায়। প্রতাপও দেখছে ঝিলিকের এই কাছে আসার ব্যাপারটা। প্রতাপের ভালো লাগে ঝিলিকের সান্নিধ্যে।

লবঙ্গের একটা ফার্ম হাউস আছে শহরের বাইরে। ওটা তার বাবার তৈরী করা। নদীর ধারে প্রায় শতখানেক বিঘার উপর কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে জমিতে চাষ বাষও হয়। কালীপদ বাবু কিছু শাল সেগুনের চারা লাগিয়েছিল। সেগুলো আজ বেশ বড় হয়ে বনের পরিবেশ তৈরী করেছে। একটা পুকুরের পারে সুন্দর একটা বাংলো — কিছুটা বাগান মত হয়েছে। বাকী জমিতে লবঙ্গ ট্রাকট্‌র - পাম্পমেশিন রেখে চাষ বাস করায়। পুকুরে মাছও করেছে। ঝিলিক মাঝে মাঝে চলে আসে এই ফার্ম হাউসে। ছুটির দিন ছাড়া লবঙ্গ এখন বিশেষ আসতে পারে না — ওর ম্যানেজারই সব দেখাশোনা করে আর এই ফার্মের ভার রয়েছে ঝিলিকের উপর। এই শান্ত সবুজ পরিবেশে ঝিলিক আসে মাঝে মাঝে তার দু একজন বান্ধবীকে নিয়ে। সারাদিন এই সবুজ পরিবেশে কাটিয়ে ফেরে বিকেলে।

সেদিন ঝিলিক বাড়ি থেকে বের হয়েছে এই ফার্মে আসার জন্য। পথের ধারে একটা দেকানে রিক্সা থামিয়ে কি কিনছে ঝিলিক হঠাৎ প্রতাপের গাড়িটা এসে থামতে চাইল ঝিলিক। প্রতাপও গাড়ি নিয়ে বের হয়েছে — আজ তার যাবার জায়গাও নেই। কোন বন্ধুকে নিয়ে কোথাও একটু বেশী ঘুরে আসবে। ঝিলিক বলে,

— তাহলে এখানে ওখানে না ঘুরে আমাদের ফার্মেই চলো। সুন্দর জায়গা। তোমারও ভালো লাগবে। দুপুরে ওইখানেই লাঞ্চ করা যাবে। প্রতাপও রাজী হয়ে যায়।

— ঠিক আছে চলো। আজ তোমার ফার্মেই যাই।

ঝিলিকও খুশী হয়। প্রতাপ গাড়ি নিয়ে চলেছে। কিছুটা পথ গিয়ে, একটা ছোট পথ চলেছে মাঠের মধ্য দিয়ে নদীর দিকে। দেখা যায় দুরের ঐ শাল সেগুনের বন।

প্রতাপ বলে,

— কোথায় নিয়ে চলেছ ঝিলিক? এত দেখছি শাল সেগুনের বন।

ঝিলিক বলে,

— চলই না। ভয় করছে নাকি?

প্রতাপ বলে,

— না - না, তোমার সঙ্গে চলেছি — তুমিতো আছো। ভয় কি?

— মানে! ঝিলিক ডাগর চোখ তুলে প্রশ্ন করে। প্রতাপের মনে সুর জাগে। সে বলে,

— সত্যি ঝিলিক। মনে হয় জীবনে মানুষ একজনকে পেতে চায় — যে হবে তার সুখ দুঃখের সঙ্গী। যার উপর নির্ভর করা যায়। তোমাকে দেখেই মনে হয়েছিল যে, তুমি যেন আমার কাছে সেই জন। যাকে আমি অনেক দিন থেকেই চিনি জানি। এটা ঝিলিকেরই মনের কথা। ঝিলিকও তার নিঃসঙ্গ জীবনে এমনই একজনকে খুঁজছে তার সমস্ত মন দিয়ে। আজ যেন তার সন্ধান পেয়েছে।

ওদের গাড়িটা ফার্মের গেটে এসেছে। ঝিলিককে দেখে ফার্মের লোক গেট খুলে দেয়। প্রতাপ দেখছে সুন্দর সাজানো সবুজ বাগান। লাল মোরাম ঢালা পথে চলেছে ওরা বাংলোর সামনে। দুদিকে সুন্দর বাগানে — গোলাপ, ডালিয়া, গাঁদা ফুল ফুটে আছে। ওদিকে সুন্দর বাঁধানো ঘাট, বিশাল পুকুর এর জলে গাছের ছায়া নেমেছে। কোথায় নিস্তব্ধতাকে ছাপিয়ে একটা পাম্প চলছে।

সুন্দর সাজানো বাংলো। বসার ঘর - বাথরুম দুটো, ডাইনং হল, কিচেন সবই আছে। প্রতাপ ব্যালকনির নীচে দেখে সুন্দর একটা জলাভুমি। এই জগতে আজ এসেছে তারা দুজন। প্রতাপকে আজ ঝিলিক কাছে পেয়ে খুশীতে গেয়ে ওঠে। ঝিলিকও আজ খুশী।

বাড়িতে সে কিচেনের কোন কাজই করে না। করার দরকারও পড়ে না। তার জন্য কাজের লোকও আছে। এখানেও ঝিলিক এলে কাজের বৌ -- মেয়েরাই তাকে রান্না করে দেয়। চাও করে। আজ ঝিলিকের মনে হয় তারা যেন দুজনে এসেছে এই বাংলোয়। আজ এটা যেন ঝিলিকের সংসার। ঝিলিক নিজেই গ্যাস জ্বেলে চা বানায়। কাজের বৌ বলে,

— আমি করছি দিদিমণি। তুমি বরং গিয়ে বসো।

ঝিলিক আজ যেন নিজের হাতেই প্রতাপকে চা খাবার খাওয়াতে চায়। প্রতাপ — ঝিলিক বাগানে বসেছে। চা পর্ব শেষ করে প্রতাপ বলে,

— চলো তোমার ফার্মের ওদিকটা ঘুরে আসি।

তখন মালি দুজনে গিয়ে পুকুরে জাল ফেলছে। প্রতাপও এগিয়ে আসে। মাছ ভালোই আছে। ঝিলিক বলে,

— ওই মাছটা ধরো।

প্রতাপকে সে যেন তাদের সেরা জিনিসটাই উপহার দিতে চায়। প্রতাপ ঝিলিক ফার্মে ঘুরছে। সবুজের এক জগৎ ফুলে ফসলে যেন সম্পূর্ণ। ঝিলিক আর প্রতাপ যেন ভাবছে তাদের জীবনও এমন ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

ঝিলিকও আজ কিচেনে কাজের মাসীর সঙ্গে রান্নার কাজে হাত লাগিয়েছে। প্রতাপ বলে,

— দেখো যেন হাত পুড়িয়ো না। এসব কাজতো করার অভ্যাস নেই। আর নুন ঝাল ঠিক হবে তো।

— খাবার সময় দেখবে।

প্রতাপও বলে,

— তাহলে আনাজটা আমিই কুটি।

— থাক। কুমোরের কাজ কুমোরে করে, ধরতে না জানলে পুড়ে মরে। এখুনি একটা অঘটন বাধাবে হাত কেটে। বাড়িতে শুনলে কি বলবে?

প্রতাপ বলে,

— তোমার যদি হাত পোড়ে, বাড়িতে জিজ্ঞাসা করলে কি বলবে?

— তোমার জন্য এটুকু আমার সইবে।

প্রতাপ বলে,

— তাহলে তোমার জন্য সামান্য হাত কাটা সইবে আমার।

দুপুরটা কোন দিকে কেটে যায়। খানিক পরে ওরা আসে সেই শাল সেগুনের বনে। শালগাছে এসেছে মঞ্জুরী। পাতাগুলো হলুদ হয়ে উঠেছে। শীত শেষে ঝরে যাবে। আসবে নতুন পাতার বাহার। স্তব্ধ অরণ্যে ওঠে বনমর্মর — তাতে মিশছে পাখীদের কলরব। নদীর বালিয়াড়ির বুক চিরে তিরতির করে বয়ে চলেছে একটু জলধারা। প্রতাপ ঝিলিক ওই নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দেখছে এই সুন্দর জগৎকে।

বিকেল নামছে। অস্তরাগ সূর্যের শেষ আলো পড়েছে বনভূমিতে। ওই বাংলোর বাগানে চা পর্ব সেরে ঝিলিক মেয়ে যেন সহায় ছাড়তে রাজী নয়।

ঝিলিক আর প্রতাপ গাড়িতে উঠেছে। ঝিলিক বলে,

— আমার ফিরতে ইচ্ছা করছে না প্রতাপ। প্রতাপের মনেও আজ সেই বেদনা। দুটি

মন আজ যেন অদৃশ্য এক বাঁধায় বাঁধা পড়ে গেছে।

প্রতাপ বলে,

— সত্যি। একটা দিন কোন দিক থেকে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না।

ঝিলিক বলে,

— প্রতাপ, জীবনে আমার সব থেকেও কিছুই নেই। আমি বড় নিঃসঙ্গ একা। এই দিনটাকে কি আমরা দুজনের জীবনে চিরস্থায়ী করতে পারি না। ঝিলিকের কণ্ঠে এক ব্যাকুলতা। প্রতাপও ঝিলিকের এই আহ্বানে চমকে ওঠে। জীবনে প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি আজ তার। প্রতাপ ঝিলিকের হাত ধরে — ওই স্পর্শটুকু মনে যেন ঝড় তোলে। প্রতাপও ভাবছে কথাটা।

আজ তার কাছে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে। জীবনে যদি কাউকে সঙ্গী হিসাবে পেতে হয়, সেই পছন্দের ক্ষেত্রে ঝিলিকের নামটাই জেগে উঠবে বারবার।

— ঝিলিক এ দিনটা আমার মনে থাকবে। আজকের দিনটার কথা কোন দিনই ভুলব না। একে চিরস্থায়ী করে রাখতে আমিও চেষ্টা করবো ঝিলিক।

ঝিলিক আজ প্রতাপের হাতটা শক্ত করে ধরে। একটা নিঃসঙ্গ ঝিলিককে বলে,

কিরণ আর লবঙ্গলতিকার লড়াইয়ের কথা সারা শহরের লোক জানে। এই নিয়ে উকিলপাড়া বনাম ডাক্তারপাড়ার মধ্যেই গোলমালও বাধে। কিরণ তার পাড়ার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। ওদের ক্লাবের ফুটবল টিম, ক্রিকেট টিমও আছে। এছাড়া নিজেদের লাইব্রেরী, খেলার মাঠও রয়েছে। প্রতিবার তারা রক্তদান শিবির করে আর তাদের জাগবণী সংঘের ফুটবল ক্লাবতো শহরের নামকরা ফুটবল টিম।

লবঙ্গ দেখছে রাজনীতিতে পায়ের নীচে মাটি পেতে গেলে পিছনে দলের কিছু সমর্থক এর দরকার। ওর বাবার প্রচুর টাকা আর সে নিজেও প্রচুর রোজগার করে। পুর প্রতিনিধি হয়েছে, এবার কেশববাবু তাকে স্বপ্ন দেখায় এম-এল-এ হতে হবে। আর এমন ওজনদার মহিলা এম-এল-এ হলে মন্ত্রীও হতে পারবে।

লবঙ্গের একান্ত নির্ভরযোগ্য কিছু সমর্থক দরকার। তার জন্য পাড়ার ইয়ং বুলেট ক্লাবকেই বেছে নেয় লবঙ্গ। এতদিন ও ক্লাবটা কোন রকমে চলতো। একটা ক্লাব ঘর তাদের ছিল — পাড়ার লোকেদের কাছে চাঁদা তুলে দুর্গা পুজাটা করতো আর বছরে একদিন রবীন্দ্র জয়ন্তীও পালন করতো ছেলেমেয়েদের নিয়ে।

দু দশটা ছেলে ফুটবল খেলতো এখানে ওখানে। তবে তেমন নাম ছিল না ইয়ং বুলেটস্ ক্লাবের।

লবঙ্গ লতিকা সেবার পূজোর পর তাদের ডেকে পাড়ার মিটিং করে ছেলেদের এই ক্লাবকে প্রাণবন্ত করে তোলার কথা বলে, ওদিকে কয়েক বিঘে জমিও পড়েছিল ওটা পুরসভার জমি। লবঙ্গ এসব পরিকল্পনা করেই এগোয়। ক্লাবের ওই সভায় লবঙ্গ নিজে পঁচিশ হাজার টাকা ক্লাবের ফান্ডে দেয়। শহরে এখন বহু দু নম্বরী ব্যাবসাদার ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ওদেরও অনেক সময় লবঙ্গ নানা বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে। এখনও লবঙ্গই তাদের ভরসা। তাই তারাও লবঙ্গের ডাকে ক্লাব ফান্ডে পাঁচ দশ হাজার টাকা দেয়। আর মাঝে মাঝে ভালো টাকা দেবার কথাও বলে। ইয়ং বুলেটস্ ক্লাবের মধ্যে এখন যৌবনের জোয়ার জাগে। একদিন ঘটা করে পুরসভার জমিতে গোল পোষ্ট পোঁতা হল। পুরসভার চেয়ারম্যানও কেশবদের দলের লোক। তারাও চান এই এলাকায় তাদের প্রতিপত্তি বাড়ুক। তাই লবঙ্গকে উদ্যোগী হতে দেখে চেয়ারম্যানও আসেন। ঘটা করে ইয়ং বুলেটস্ ক্লাবের ফুটবল মাঠের কাজ শুরু হয়ে গেল। এবার তারাও এখানে ওখানে ন্যাপা - ভোঁদা - পাঁচুদের নিয়ে তাদের ক্লাবের জারসী পরিয়ে মাঠে নামায়। ইয়ং বুলেটস্ টিম সেবার শহরের দু একটা ট্রফিতে পুরষ্কারও পায়।

লবঙ্গ লতিকাও নিজে ক্লাবে আসে। খেলার দিন বিকেলে কেশবও মাঠে আসে। ওর হাফ টন দেহের আলোড়ন দেখে প্রতিপক্ষও ঘাবড়ে যায়। আর বিপক্ষের গোলের কাছে বল গেলে লবঙ্গ তখন হাতুড়ির মত হাত তুলে গর্জন করে,

— গোলে মার। উড়িয়ে দে ভজা।

ইয়ং বুলেটস্ আর লবঙ্গ লতিকা যেন এক প্রাণ এক মন। সেবার পুরসভায় ভোটে ক্লাবের ছেলেরা দিদির জন্য জান প্রাণ লড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের ওই লড়াই এর জন্য ভোটাররা আর বিশেষ ভোট দিতে আসেনি। এদিক ওদিকে বেশ কিছু বোমাও পড়েছিল। তবু বোমার ভয় তুচ্ছ করেও যারা পোলিং বুথে এসেছিল তাদের অনেকেই ভোট দিতে পারেনি। লবঙ্গ লতিকা বেশ কিছু বুথে একাই প্রায় নিরানব্বই শতাংশ ভোট টেনে পরম কৃতিত্বের সঙ্গে পুরসভায় গেছে। এবার লবঙ্গ লতিকা এম-এল-এ হবার স্বপ্ন দেখে। তাই ইয়ং বুলেটস্ ক্লাবকে তার সৈন্য বাহিনী বানাবার জন্য ভাবতে শুরু করেছে। ওদের ফুলটিম এখনও বেশ নাম করা। সেবার একটা টুর্নামেন্টে অনেক টিমই নাম দিয়েছে। কিরণ বাবুর জাগরণী সংঘও অনেক প্রতিযোগীতায় খেলে। তারাও কখনও হারে আবার কখনও যেতে। এনিয়ে বেশ উত্তেজনাও হয় আবার থিতিয়েও যায়।

এবার ওই শীল্ড প্রতিযোগীতায় অনেক টিমই খেলছে। আর ফাইনালে সবাইকে পিছনে ফেলে উঠেছে দুটো টিম। আর ঐ দুটো টিমের একটা ডাক্তার পাড়ার জাগরণী সংঘ আর উকিল পাড়ার লবঙ্গ লতিকার দল ইয়ং বুলেটস্। অনেক লোকই হয়েছে। দর্শকরাও

এসেছে। খেলার মধ্যে সাময়িক উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়েছে আবার তা মিলিয়েও গেছে। হার জিতকে দুই দলই মেনে নিয়েছে। পরের রাউন্ডের খেলা শুরু হয়েছে। লবঙ্গ লতিকা সেমি ফাইনালের খেলায় এসেছে। আর সেদিন জেনেছে যে পরের টিম যে জিতছে তাদের সঙ্গে ওদের ফাইনাল খেলা হবে। আরও জেনেছে ওদিকে উঠতে পারে কিরণ ডাক্তারের দল। লবঙ্গ ওই নামটা শুনেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। সেও ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল কিরণের দল ধোপে টেকে না ছিটকে যায়। ওর দলের ছেলেরা বলে,

— জাগরণী সংঘ হেরে যাবে দিদি। সেমি ফাইনালেই ওদের শেষ খেলা।

লবঙ্গ বলে,

— সেদিন মাঠে আসব। ওদের খেলা দেখবি যদি কোন মতে ফাইনালে ওঠে। ওদের জাগরণী সংঘকে উড়িয়ে দিতে হবে ফাইনালে। শীল্ড পেতে হবে। শীল্ড চাই।

ইয়ং বুলেটস্ টিম সেইমত ওদের খেলার দিন এসেছিল মাঠে। কিরণ ডাক্তাররাও খবর পেয়েছে লবঙ্গলতিকার টিম ফাইনালে উঠেছে। কিরণ ডাক্তারও ওই বুলডোজার লেডির নাম শুনতে চায় না! বহুবার তাকে বিপদে ফেলেছে। বিব্রত করেছে। সেই মহিলা এবার খেলার ব্যাপারেও কিরণের টিমকে টেক্কা দেবে এ হতে পারে না। কিরণ ডাক্তার সেদিন নিজে খেলার মাঠে আসে। টিমকে ফাইনালে নিয়ে যেতেই হবে। আর সেদিন হবে মহারণ। ওই লবঙ্গলতিকার দলকে হারিয়ে শীল্ড ছিনিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

কিরণ ডাক্তারও এবার তার জাগরণী ক্লাবকে আরও জাগ্রত করে তুলেছে। বেশ কয়েকজন প্লেয়ারকে নতুন বুট কিনে দিয়েছে আর স্পোর্ট সেক্রেটারীও তার কোচ প্লেয়ারদের নিয়ে ঘনঘন মিটিং করছে। গেম প্ল্যান তৈরী হয়েছে। কিরণ ডাক্তার এখন সকাল থেকে বিকেল অবধি চেম্বার নিয়ে থাকে। বিকেলে চেম্বারে বসে না। সিধে চলে আসে মাঠে।

মিনতি ছেলেকে বলে,

— ওরে কিরণ। খেলা নিয়ে কি বুড়ো বয়সে পাগল হবি। ডাক্তারী, ঘর সংসার ছেড়ে মাঠেই পড়ে থাকবি।

মনোজ দারোগাও আসে। সন্ধ্যার পর দাবার আসর বসে। এখন তাও বন্ধ। মনোজ বলে,

— কিরণ। শহরে এ নিয়ে যা উত্তেজনা ছড়াচ্ছে এটা ভেবে প্রশাসনকেও ভাবিয়ে তুলেছে হে। শহরের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে তো। না মাঠেই সংঘাত বেধে যাবে। তখন কিন্তু পুলিশ চুপ করে থাকবে না। দরকার হলে লাঠি - টিয়ার গ্যাসও চলবে।

কিরণ বলে,

— চলে চলবে, আমি কি করতে পারি? ওই বুলডোজার মহিলাকে গিয়ে বলো।

তিনিই তো এই লড়াই করতে চায়।

মনোজ সেই ঝানু মহিলাকে চেনে। বলে,

— তাকেও বলেছি।

লবঙ্গলতিকা আর কেশবরা এই ফাইনাল খেলাটাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছে। লবঙ্গ বলে,

— এম-এল-এ ভোটের এই প্রথম স্টেপ কেশববাবু। এই খেলায় জিততে পারলে আমাদের টিমের মান মর্যাদাও বাড়বে। পরের লড়াইএ জিতবেই। তাই এই খেলায় ডাক্তারের দলকে হারতেহ হবে।

কেশব বলে,

— তার জন্য ভেব না। আমার ভাই কলকাতার নামী ফুটবল ক্লাবের একজন কর্মকর্তা। ওকে বলেছি তিন চারটে প্লেয়ারকে নিয়ে আসবে — শহরের কাউকে জানাচ্ছি না এখন — মাঠে তাদের নামিয়ে তাক লাগিয়ে দেবো। কিরণ ডাক্তারের দলকে গোলের মালা পরিয়ে দেব। তবে কলকাতা থেকে ওদের আসার জন্য খরচা —

লবঙ্গ এখবর পেয়ে খুশীই হয়েছে। বলে,

— ওর জন্য ভেব না।

ড্রয়ার খুলে একটা দশ হাজার টাকার বাণ্ডিলই বের করে দেয় লবঙ্গলতিব। কেশবের হাতে। কেশব টাকাটা পকেটে পোরে। লবঙ্গ বলে,

— টিম জিতলে ওদের খুশী করে দেব।

কেশব নগদ পেয়ে খুশী। সে বলে,

— শীল্ড ঘরেই এনেছি ধরে নাও।

ঝিলিক দেখে সব। মাকে এ নিয়ে লেও পারেনি। ঝিলিক বলে,

— মা, এইসব ছেলেমানুষি করছ শহরের সব লোক হাসাহাসি করছে। আমারও খারাপ লাগে।

লবঙ্গ তার স্বামী বা মেয়ে কারোর কথাই কোনদিন কান দেয়নি। এসব কথা লবঙ্গের স্বামী নিখিলও বলেছে,

— এসব কি হৈ চৈ করছ? কেশব বাবুও যা করছে তুমিও তাই করছ।

লবঙ্গ স্বামীর কথায় বলে,

— আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তুমি কিছু বলবে না। তাছাড়া আমার টাকা খরচ করার স্বাধীনতা আমার আছে। নারী স্বাধীনতা সংঘের জন্য কাজ করছি — তোমার ওসব কথায় কান দেবার সময় আমার নেই।

ঝিলিক তবু বাবার কথায় বলে,

— বাবাতো খারাপ কিছু বলেনি। এসব কি করছ তুমি। লোক হাসাচ্ছো।

লবঙ্গ গর্জে ওঠে,

— ইউ সাট আপ। বাবা মেয়ের দেখি একই সুর।

নিখিল বলে,

— আর কেশববাবুর সম্বন্ধে অনেক কথাই জানি। লোকটা ধান্দাবাজ।

লবঙ্গও সেটা জানে। জানে এম-এল-এ হতে গেলে কেশবকে তার চাই। তাই লবঙ্গ বলে,

— জনদরদী নেতা — ভদ্রলোকের সম্বন্ধে যা তা মন্তব্য করো না নিখিল — এ আমি টলারেট করবো না।

লবঙ্গ মেয়ে মায় স্বামীকেও থামিয়ে দেয়। ওরাও জানে লবঙ্গকে বেশী ঘাঁটানো নিরাপদ নয়। তাই চুপ করে যায় তারা।

সারা শহরে সাড়া পড়ে গেছে। সংবাদ পত্রের লোকেদেরও কেশব বাবু এনেছেন। এসেছে শহরের মান্যি গণ্যি লোক। লবঙ্গই নিজে গিয়ে ডি-এম সাহেবের স্ত্রীকে এনেছে পুরস্কার বিতরণের জন্য। কেশব বাবুর পুরো দলটাই এসেছে মাঠে। তারা ব্যান্ড পার্টিও এনেছে। ইয়ং বুলেটস্ ক্লাব তৈরী হয়েই এসেছে।

জাগরণী সংঘের সর্মথকরা এসে ভিড় করে। ওদিকে তাদের বেঞ্চে বসে আছে সভাপতি কিরণবাবু, বেচুও এসেছে। ওদিকে ইলেভেন বুলেটস্ এর দল, বিশাল একটা টেবিল চেয়ারে বসেছে লবঙ্গলতিকা — ডি-এম এর স্ত্রীও রয়েছে — ওদিকে মনোজ দারোগাও জানে গোলমাল হতে পারে তাই সেও বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে হাজির হয়েছে মাঠে। মাঠে খেলার ধারা বিবরণীও প্রচার করার ব্যবস্থা হয়েছে। যেন শহরের বহু মানুষকেআজ এই লড়াই সম্বন্ধে অবহিত করতে চায় লবঙ্গ বাহিনী।

খেলা শুরু হয়েছে। যাতে শহরের পাবলিশিটি বাড়ে তাই খাস কলকাতা থেকে আনা হয়েছে ওই খেলার ভাষ্যকারকে। কিরণ ডাক্তারের টিমও মাঠে নেমেছে। আর এর মধ্যে বেচু, হরিপদ অন্যরাও তুমুল চীৎকার করছে, হাততালি দিয়ে তাদের দলকে উৎসাহিত করছে। লবঙ্গও দেখছে। এবার মাঠে নেমেছে তাদের দল। কেশব বাবু অর্গানাইজার, তারা জনসভা কি করে করতে হয়, কি করে লোক জনকে আনতে হয় তা জানে। শহরের সব রিক্সাওয়ালা তাদের দলের লোক। বাজারে আনাজ বিক্রেতা — গুমটি দেকানের মালিকরা কেশবের অনুগত। না হলে ওদের কাজই করতে দেবে না ওর দল। তাদের প্রণামীও দিতে হয় — আর কেশব বাবুদের সব মিটিং মিছিলে তাদের সামিল হতে হয়।

কেশবের দল আজ সেই সব বাহিনীকেও মাঠে এনেছে। তারা এবার ইয়ং বুলেটস্ এর দলকে হাততালি দিয়ে, সিটি বাজিয়ে উৎসাহিত করে।

জাগরণী সংঘের ছেলেরা তো ইয়ং বুলেটস্ এর ছেলেদের চেনে — দেখে আজ তাদের নিয়মিত প্লেয়ারদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন রয়েছে আর নেমেছে কলকাতার ক্লাবের বাছাই কয়েকজন প্লেয়ার। অর্থাৎ লবঙ্গ লতিকাই ওদের ভাড়া করে এনেছে শীল্ড জেতার জন্য।

কিরণ ডাক্তার গর্জন করে,

— এতো বেআইনি কাজ। ওই ছেলেরাতো ইয়ং বুলেটসের মেম্বার নয়।

লবঙ্গলতিকাও গর্জন করে ওঠে

— ওরা যে আমাদের সভ্য নয় — তার প্রমাণ দেখাক। ওরা আমাদের সভ্য আইন তাই বলে। শীল্ড কর্তৃপক্ষও এতে আপত্তির কারণ দেখে না। প্রথম রাউন্ডেই লবঙ্গের জয় হয়। কিরণ ডাক্তারও গজগজ করে,

— এমন জানলে আমরাও বাইরে থেকে প্লেয়ার আনাতাম।

তবু জাগরণী সংঘ লড়ে চলেছে। খেলা শুরু হয়। জাগরণী সংঘের ছেলেরাও মরীয়া হয়ে খেলছে। ওই বাইরের ভাড়াটে প্লেয়ারদেরও তারা দেখিয়ে দিতে চায় জাগরণী সংঘও কম যায় না। আর ভাড়াটে প্লেয়াররা গা বাঁচিয়ে খেলছে। তাই জাগরণী সংঘও হঠাৎ একটা গোলের সুযোগ পেয়ে যায়, আর তারপরই গোল করে বসে। কিরণ ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে।

ওদিকে লবঙ্গ তখন কাঁপছে। কেশব বলে,

— ভেব না লবঙ্গদি — ওস্তাদের মার শেষ রাতে। জাগরণী সংঘ একটু পরই কাহিল হয়ে পড়বে। তখন দেখবে ওদের খেলা।

হাফটাইম হয়ে গেছে। জাগরণী সংঘও এক গোল শোধ করেছে। কিরণবাবু সংঘের ছেলেদের বলে,

— লড়ে যা। আর একটা গোল দে — ব্যস।

কিরণ বলে,

— জিততেই হবে। এ আমাদের বাঁচা মরার লড়াই। ওই বুলডোজার এর দলকে পিষে গুঁড়িয়ে দে।

ওদিকে লবঙ্গ তখন তার দলকে ঘিরে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে চলেছে,

— ওই গুঁপো ডাক্তারের দলকে হারাতেই হবে। এ আমাদের জীবন পণ লড়াই — এ লড়াই জিততেই হবে।

কেশব বাবুও বেশ উত্তেজক ভাষায় এই খেলাকে জীবনের শেষ খেলাই ঘোষণা করেন।

ওদিকে মাঠে তখন জাগরণী সংঘের ব্যান্ডবার্টি ব্যান্ড বাজাচ্ছে। আর তাদের দলবলও নৃত্য শুরু করেছে। লবঙ্গ বলে,

— ওদের এই ব্যান্ড বাজানো বন্ধ করে দিতে হবে। থামিয়ে দিতে হবে ওই নাচ। ভাইসব তাই গোল দিয়ে ওদের আটকাতে হবে। চাই গোলের পর গোল। লবঙ্গ ওই দেহ নিয়ে ভাষণ দিয়ে চলে। কেশব বলে,

— ওরে দিদিকে হাওয়া কর। এবার ইয়ং বুলেটস্ এদের ভাষণে প্রদীপ্ত হয়ে খেলছে আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ইয়ং বুলেটস্ আবার গোল দেয়। হাজারো কন্ঠে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি ওঠে। লবঙ্গ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে। এদিকে কিরণ গুম হয়ে গেছে। চীৎকার করে সে,

— নো! ফিয়ার। এগিয়ে যাও — আবার দাও গোল। গুঁড়িয়ে দাও ওদের।

এবার ইয়ং বুলেটস্ খেলাটাকে ধরে নিয়েছে — এদের খেলায় এবার ছন্দ ফুটে ওঠে। ওরা এই বার আরও তীব্র আক্রমণ করে জাগরণী সংঘের গোলে। আরো একটা গোল পায় ইয়ং বুলেটস্। মাঠে তখন কান পাতা যায় না। চীৎকার করছে ইয়ং বুলেটস্এর দর্শকরাই বেশী। কেশব বাবুর দল জানে কি ভাবে জনগণকে বশে আনতে হয়।

কিরণ টানটান হয়ে বসেছে। তার দল এবার ইয়ং বুলেটস্ এর গোলে হানা দেয়। সেখানে ওদের পল্টুও নির্দেশ পেয়ে সর্ট মারতে যাবে। কিন্তু ইয়ং বুলেটস্ এর ব্যাক এসে পিঠ দিয়ে আটকাতে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

— চীৎকার ওঠে, — ফাউল! — পেনাল্টি-

রেফারি বাঁশি বাজায় কিন্তু পেনাল্টির নির্দেশ দেয় না — গোল বক্সে ফাউল হয়নি তার মতে। এবার মাঠে হৈ চৈ পড়ে যায়।

কিরণ গর্জন করে,

— পেনাল্টি।

ওদিক থেকে লবঙ্গ ফুঁসে ওঠে — নো পেনাল্টি। রেফারিজ ডিসিশন ইজ ফাইনাল। দিস ইজ ল।

মাঠে লোকজন নেমে পড়েছে। ওদিক থেকে লবঙ্গের লোকজন তার বাহিনীও প্রস্তুত। খেলা বন্ধ হয়ে যায় কয়েক মিনিট। দুই পক্ষ তখন হাতাহাতির জন্য তৈরী—- দু একটা ইটও পড়েছে। এমন সময় মনোজ দারোগা পুলিশ বাহিনী নিয়ে লাঠি উঁচিয়ে মাঠে নামতে দু পক্ষই তখন মারের ভয়ে পিছিয়ে যায় মাঠের বাইরে।

কিরণ ভেবেছিল মনোজ ওদের চারিদিকে মায় ওই প্ররোচনাকারী বুলডোজার মহিলাকে এ্যারেস্ট করবে। কিন্তু সে সব কিছুই হয় না। আবার খেলা শুরু হয়, কিন্তু খেলা আর জমে না। কারন ইয়ং বুলেটস্ তখন খেলায় এগিয়ে গিয়ে ডিফেন্স এর দিকে নজর দিয়েছে।

রেফারি শেষ হুইশেল বাজাতে এবার মাঠে ইয়ং বুলেটস্ এর বাদ্য বাজনা শুরু হয়। কিরণ বাবুও রণে ভঙ্গ দিয়ে বাড়ি চলে আসেন।

মিনতি বলে,

— কি হলরে কিরণ?

কিরণ ডাক্তার জবাবই দেয় না। তার চোখে ভাসছে লবঙ্গের ওই মোটা দেহ নিয়ে তর্জন গর্জন। কিরণকে আজ সে মুখের মত জবাব দিয়েছে এই খেলায় জয়ী হয়ে।

মাঠে তখন শীল্ড বিতরণ অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। ইয়ং বুলেটস্ শীল্ড নিয়ে এবার ব্যান্ড পার্টি নিয়ে শোভাযাত্রা বের করেছে। লবঙ্গও একটা খোলা জিপে উঠেছে। দলের উৎসাহী সমর্থকরা তাকে লাল আবিরে রঞ্জিত করেছে। বিশাল দেহ আবিরে রাঙা। লবঙ্গ জিপে দাঁড়িয়ে আছে। আর বিশাল ব্যান্ড পার্টি আর সমর্থকের দল আগে নাচতে নাচতে যাচ্ছে। কিরণের বাড়ির সামনে এসে শোভাযাত্রা থামিয়ে তখন তুমুল বাদ্যি বাজনা বাজিয়ে নাচছে।

কিরণ দোতালার বারান্দা থেকে দেখে তার বাড়ির সামনের রাস্তায় তখন জিপে দাঁড়িয়ে আবীর রঞ্জিত সেই বুলডোজার লেডি। পাশে রাখা সেই শীল্ডটা। ও যেন আজ কিরণের বাড়িতে এসে তাকে জানাতে চায় যে কিরণকে লবঙ্গ আজ হারিয়ে দিয়েছে।

মিনতি বলে,

— জিপে সেই উকিল মেয়েটা না? হস্তিনীও দোল খেলে নাকি রে?

কিরণ বলে,

— হ্যাঁ, আজকাল হাতিরা আরও অনেক কিছু করতে পারে।

— বাড়ির সামনে তাই বলে এমন কান ফাটানো বাজনা বাজিয়ে নাচবে?

— ওর নাচ আমি বন্ধ করে দেব।

কিরণ যেন রাগে ফেটে পড়ে। লবঙ্গও এবার কিরণের সামনে নিজের জয়টা জাহির করে চলে যায় তার বিজয় উল্লাসের মিছিল নিয়ে।

কেশবও রয়েছে জিপে। আজ এখন কেশব আর লবঙ্গের সম্মিলিত প্রচেষ্টার জয়। তাদের জয়যাত্রার এই হল শুরু। আবার লবঙ্গ স্বপ্ন দেখে এরপর শীল্ড নিয়ে গিয়ে নয় এম-এল-এ হয়ে এমন করে জয়যাত্রা শুরু করবে। লবঙ্গ, কেশব খোলা জিপে আবীর

মেখে শহর প্রদক্ষিণ করে ক্লাবে আসে।

এই নিয়ে শহরে দু - চারজন কথাও বলে। নিখিলও দেখছে ব্যাপারটা। তাকেও তার বন্ধুরা বলে,

— তোর গিন্নী দেখ এবার বিজয়িনী বেশে ঘুরছে, তা তোমার তো স্ট্যাটাশ বেড়ে গেল নাকি হে? কেশব বাবুই রয়েছেন । নিখিল এমনিতে শান্ত প্রকৃতির লোক। সেও জানে লবঙ্গকে বিয়ে করে তাদের দাম্পত্য জীবনের কথা। তাদের সম্পর্ক প্রথম কিছুদিন ছিল। ওই মেয়েটাকে নিয়ে নিখিল বিপদেই পড়েছে। তাকে শাসন করার সাধ্য তার সেদিনও ছিল না। তাই অশান্তির ভয়ে নিখিল চুপ করে লবঙ্গের প্রাধানাই মেনে নিয়েছিল। তাদের মেয়ে ঝিলিককে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল নিখিল। তার নিজের বাড়িতে আনতে চেয়েছিল নিখিল ঝিলিককে। কিন্তু তাতেও বাধা দিয়েছিল লবঙ্গ। সে তার অধিকার সম্বন্ধে খুবই সচেতন। লবঙ্গ বলে,

— ঝিলিক এখানে আমার কাছেই থাকবে।

নিখিল বলে,

— তুমি তোমার ওকালতি, ভোটের কাজ, দেশসেবার কাজ নিয়েই ব্যস্ত। বাড়ির কাজের মেয়ের সঙ্গে থাকবে ঝিলিক।

লবঙ্গ বলে,

— ওটা তোমায় দেখতে হবে না। এ বাড়িতে তোমার থাকতে সম্মানে বাধে, তুমি তোমার বাড়িতে থাকতে পারো।

নিখিল চুপ করেছিল। ঝিলিক চেয়েছিল তার বাবাও থাকুক এখানে, তার নিঃসঙ্গ জীবনে তবু একজন সঙ্গী থাকবে। কিন্তু লবঙ্গকে রাজী করাতে পারে না। লবঙ্গ তার মেয়েকে পুরোপুরি দখল করতে চায়, তাই নিখিলকেও সরে আসতে হয়েছিল নিজের বাড়িতে। ওই নারী মুক্তি সংঘের চেয়ার পার্সন লবঙ্গের এই মুক্তি আন্দোলনে সে বাধা হয়ে ওঠেনি। ঝিলিকও দেখেছিল তার মায়ের বাবার প্রতি অবজ্ঞাটা। এটা ঝিলিকও ভালো চোখে দেখেনি। কারণ মায়ের এই ব্যবহার ঝিলিকের কাছে কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। এমন ব্যবহার সে তার কোন বান্ধবীর বাড়িতেও দেখেনি। কেশববাবুই এখন লবঙ্গের ফ্রেন্ড — ফিলজফার এবং গাইড। ঝিলিকেরও এটা ভালো লাগেনি। ঝিলিক দেখছে কেশববাবুও যেন ঝিলিককে শাসন করতে চায়। মায়র সঙ্গে ঝিলিকের মাঝে মাঝে কথাও হয়। ঝিলিকও যেন মাকে জানাতে চায় কেশববাবুর এমন সবসময় যাতায়াত ঝিলিক পছন্দ করে না। লবঙ্গ তাকে থামিয়ে দেয়

এমনিতে কেশববাবুও বলে লবঙ্গকে,

—   মেয়ের বিয়ে থা দিয়ে ওকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাও। মেয়েকেতো ঘরের ঠিকানা দিতে হবে।

লবঙ্গও ভেবেছে কথাটা। কেশব চায় ঝিলিককে এখান থেকে সরাতে। লবঙ্গও বলে কেশবকে,

—   একটা ভালো ছেলের সন্ধান করুন কেশববাবু। মেয়ের বিয়েতো দিতে হবে।

কেশবও তাই চায়। কেশব বলে,

—   ছেলের জন্য ভেবো না। আমার জানা দু চারটে ভালো ছেলে আছে, না হয় নবু ভটচাযকে খবর দিই। তার অফিসেতো এখন কম্পিউটার বসেছে। কম্পিউটারে বহু পাত্রের নাম ঠিকানা ছবি সব আছে - আর — কম্পিউটারেই সে এখন যোটক বিচারও করে।

লবঙ্গ বলে,

—   তাই বলুন নবুকে।

নিখিল মাঝে মাছে এ বাড়িতে আসে। ঝিলিকও খুশী হয়। সে ওই নিরীহ মানুষকে ভালোবাসে। জানে ঝিলিক বাবা-মাকে নিয়ে সুখে ঘর সংসার করতে পারেনি। সংসারের বাইরেই রয়ে গেছে এই অসহায় মানুষটি। তবু কোনদিন মায়ের নামে ও কোন অনুযোগ করেনি। ও শুনেছে মা তার বিয়ে ঠিক করতে চায়। আর কেশববাবুকে পাত্র দেখার ভার দিয়েছে।

ঝিলিক বলে নিখিলকে,

—   আমি বিয়ে করতে চাই না বাবা। এখন পড়াশোনা করতে চাই। ওই কেশব বাবুই চায় বিয়ে দিয়ে আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে। আর ও যে কেমন পাত্র আমি তাও বুঝেছি। আমি এ বিয়েতে রাজী নই বাবা।

নিখিলও বুঝেছে এসব কেশবের ষড়যন্ত্র। কেশব বাবু তাকেও সরিয়ে দিয়েছে লবঙ্গের কাছ থেকে। এবার ঝিলিককে সরিয়ে দিয়ে নিজেই এখানের অলিখিত কর্তা হতে চায়। নিখিলও তাই লবঙ্গকে বলে,

—   ঝিলিকের বিয়ের কথা ভাবছ কেন? এখন ওর পড়ার সময়, ওকে পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও। তুমিতো নারী মুক্তি সংঘের চেয়ার পার্সন — আর তুমি তোমার মেয়েকে স্বাধীন ভাবে বাঁচতে দিতে চাও না।

লবঙ্গ নিখিলের কাছে এসব কথা শুনবে ভাবেনি।

লবঙ্গ বলে,

—   ঝিলিক তোমাকে এসব খবর দিয়েছে।

—   হ্যাঁ, আমি তার বাবা। আমারও মেয়ের ব্যাপারে কিছু বলার থাকতে পারে। ও ফাইনাল আপাতত করেছে — এসব ব্যাপার এখন থাক।

লবঙ্গ বলে,

— আমি যা করার তা ভেবে চিন্তেই করি। এ নিয়ে কারো কথা আমি শুনতে চাই না। ঝিলিকের ব্যাপারে আমিই যা করার করবো। তুমি নাক গলাবে না।

নিখিল চুপ করে যায়। জানে এ ব্যাপারে কথা বললে অশান্তিই বাড়বে। ঝিলিকও মাকে বলেছে কথাটা। কিন্তু লবঙ্গই বলে,

— আমায় আমার কাজ করতে দাও।

ঝিলিক সরে আসে। তবে তার মনে এবার যেন নতুন একটা সত্ত্বা জেগে উঠেছে। সেও মায়ের এই হুকুম নীরবে মেনে নেবে না। তার জন্য যা করার সেও করবে।

প্রতাপের জীবনে ঝিলিক যেন নতুন একটা সুর এনেছে, এনেছে বিচিত্রি একটা অনুভুতি। এ যেন তার একান্ত আপনার একটা জগৎ। এই জগত গড়ে উঠেছে আর একজনকে কেন্দ্র করে সে ঝিলিক।

এখন ঝিলিকের সঙ্গে প্রতাপের কলেজেও দেখা হয় — সেখানে ওরা দুজনে দুজনাকে যেন ঘনিষ্ঠ ভাবে চেনে না। মুখ চেনা ক্লাশমেট। কলেজের পর ঝিলিক বের হয়ে আসে — পথে ওকে প্রতাপ তুলে নেয় তার গাড়িতে। ওরা দুজনে আসে এবার প্রতাপের ফার্মে। শহর ছাড়িয়ে তাদের ফার্ম হাউস। কিরণবাবুও নিজের মনের মতো করে সাজিয়েছে ওদের ফার্ম হাউসকে। এখানে তার চাষবাস হয় আর বেশ কয়েকটা গরুও আছে। এখান থেকে তাদের দুধও যায়। কিরণবাবু এখানে আসতে পারেন না তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। প্রতাপই সেখানে আসে — আর আসে মিনতি দেবী। এসব মিনতির সম্পত্তি।

প্রতাপ নিয়ে আসে ঝিলিককে। দুজনে এখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে যায়। ঝিলিক আজ বিপন্ন। তার মা আর কেশব বাবু তার অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে তাদের সংসার থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। ঝিলিক তা চায় না। সে ওই কেশব বাবুদের পছন্দ করা কোন ছেলেকে বিয়ে করে নিজের জীবনকে শেষ করে দিতে পারবে না।

প্রতাপও অবাক হয়। ঝিলিককে নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন। ঝিলিককে সে বলে,

— এ হতে পারে না ঝিলিক। কেউ তোমাকে আমার জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

ঝিলিক বলে,

— তুমি কি করতে পারো প্রতাপ! তুমি তো এই কলেজ ছেড়ে ডাক্তারী পড়তে মেডিক্যাল কলেজে চলে যাচ্ছো। চোখের আড়াল হলে মানুষ মনেরও আড়াল হয়ে যায়। তুমিও সরে যাবে আমার জীবন থেকে। তখন নিঃসঙ্গ এই মেয়েটার পাশে কেউ থাকবে

না। তখন তো মরা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।

কথাটা ভাবে প্রতাপ। সেও মেডিক্যালে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। এই কলেজ ছেড়ে দিতে হবে কয়েক মাসের মধ্যে। কিন্তু তার জীবন থেকে ঝিলিককে সে সরিয়ে দিতে পারবে না। প্রতাপ বলে,

— ঝিলিক ভেবো না। একটা ব্যবস্থা ঠিক করবই। তোমাকে কেউ আমার কাছ থেকে দুরে সরিয়ে দিতে পারবে না। ঝিলিকের চোখে জল। সে বলে,

— একটা পথ বের করো প্রতাপ। দরকার হলে আমিও বাড়ি ছেড়ে তোমার কাছেই চলে আসবো। ও বাড়িতে থাকলে ওরা আমাকে শেষ করে দেবে।

প্রতাপও এবার ভাবছে কথাটা। আজ তাদের দুজনেরই নিজেদের স্বাধীন ভাবে বাঁচার অধিকার আছে।

কিরণ ওই লবঙ্গের সেদিনের আপমানের কথাটা ভোলেনি। তার বাড়ির সামনে আবীর মেখে বাদ্য বাজনা বাজিয়ে নেচে গেছে। এর জবাব তাকে দিতেই হবে। এসব ভাবনা ছাড়াও কিরণের অন্য ভাবনাও আছে। একমাত্র ছেলে প্রতাপকে শহরের নামী ডাক্তার বানাতে চায়। তাই ওকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করবে। প্রতাপও জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ভালো র‍্যাঙ্কিং করে — মেডিক্যালে চান্স পাওয়া যায়। তার ভর্তির ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। প্রতাপকে বলে কিরণ,

— এবার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে যাও। মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। এ তোমার মেডিক্যাল কলেজের পড়া, লোকের জীবন নিয়ে কথা, ইট মাস্ট বি সিরিয়াস।

প্রতাপ জানে তার বাবাকে। এমনিতে বেশ রাশভারি ধরনের জেদী মানুষ। তার আদর্শ, তার নীতিবোধও প্রবল। প্রতাপ বাবাকে খুবই সমীহ করে। তাই বলে,

— আমি চেষ্টা করবো বাবা।

প্রতাপের মনে ঝিলিকের সেই চোখের জল তার কথাগুলো মনে পড়ে। কলেজ থেকে আসার দিন ঝিলিক কেঁদে ফেলেছে।

— তুমি চলে যাচ্ছ প্রতাপ। আমাকে ভুলে যাবে তো?

প্রতাপ বলে,

— না ঝিলিক। আমাদের ফার্মে চলে আসবে। ওখানেই দেখা হবে আমাদের। আর তোমাকে যে কথা আমি দিয়েছি তা রাখবই। ঝিলিকও স্বপ্ন দেখে।

মিনতি দেবীও স্বপ্ন দেখে তার ঘরে নাতবৌ এসেছে। এ বাড়িতে বৌমা মারা যাবার পর বাড়িটা যেন শূন্য হয়ে গেছে। কিরণও আর বিয়ে করতে রাজী হয়নি। এখন প্রতাপের বিয়ে দিয়ে ঘরে একটা নাতবৌ আনতে চায় মিনতি দেবী।

মিনতি কিরণের ওইসব ক্লাব — শীল্ড — হৈ চৈ নিয়ে থাকাটা মোটেই পছন্দ করে না। মিনতিও সেই কথাটা ভাবছে। তার ঘরে আসবে একটা সুন্দরী লক্ষ্মী প্রতিমার মতো মেয়ে। তারও একটা সঙ্গী হবে। একা একা আর ভালো লাগেনা মিনতির। মিনতি কথাটা কিরণকে বলবে ভেবেছে। কিরণ বিষয় আশয় তেমন দেখেনা। ওসব দেখাশোনার ভার ম্যানেজারের উপর। মিনতির বিষয় আশয় ম্যানেজারই দেখাশোনা করে। মিনতি দেবী দিনান্তে ম্যানেজারের দেওয়া হিসাবগুলো পরীক্ষা করে।

একটা লেখাপড়া জানা নাতবৌ এলে মিনতি তাকে এসব কাজের ভার তুলে দিয়ে নিজে পূজো আর্চ্চা নিয়েই থাকতে পারবে।

সেদিন ম্যানেজার বলে,

— মাসীমা, ফার্মের একটা জমির সীমানা নিয়ে পাশের জমির মালিকের সঙ্গে একটা ঝামেলা হচ্ছে। যদি আপনি গিয়ে জায়গাটা দেখে আসেন ভলো হয়।

মিনতি দেবী বলেন,

— ঠিক আছে কাল বিকেলেই যাবো।

প্রতাপ ঝিলিক মাঝে মাঝে ফার্মে আসে। প্রতাপ পড়ছে অন্য কলেজে। তাই ছুটির পর প্রতাপ মাঝে মাঝে ঝিলিক কে নিয়ে আসে তাদের ফার্মে। সেদিনও প্রতাপ ঝিলিক প্রতাপদের ফার্মে এসেছে — ঝিলিক এই সবুজের মধ্যে এসে যেন নিজেকে খুঁজে পায়। প্রতাপও স্বপ্ন দেখে ঝিলিককে নিয়ে। ঝিলিক এই মুক্ত পরিবেশে এসে খুশীতে গান গায়।

সেদিন মিনতি দেবী এসেছে ফার্মে। সে ওই বিতর্কিত জায়গাটাকে দেখতে যাচ্ছে। ওদিকে বেশ কিছু গাছগাছালির সবুজ পরিবেশ। ওখানেই গানের সুর শুনে মিনতি অবাক হয়।

একটা মেয়ে খুশীতে ওই বাগানে গান গাইছে — যেন চঞ্চল একটা রঙীন প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে পাখনা মেলে।

মিনতি দেবীও ওই সুখের যাদুতে মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যায়। দেখে ঝিলিক আর প্রতাপকে। অবশ্য ওরা দুজনে তখন তাদের সুরের জগতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে। মিনতি দেবীকে এবার দেখেই থেমে যায় ঝিলিক। মিনতি এগিয়ে আসে. সে বলে,

— থামলে কেন? গাও — বেশ সুন্দর গাওতো তুমি।

প্রতাপও এবার ঠাকুমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। মিনতি বলে,

— এ কে রে প্রতাপ। একে তো আগে দেখিনি।

প্রতাপ বলে,

— ঠাকুমা, এ ঝিলিক। আমরা একই কলেজে পড়তাম। খুব ভাল মেয়ে। ঝিলিক, এই আমার ঠাকুমা।

ঝিলিক প্রণাম করে মিনতি দেবীকে। মিনতি খুশী হয় ঝিলিককে দেখে। মেয়েটা বেশ নম্র — আর বেশ লাবণ্য মাখানো মুখ।

মিনতি ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে,

— সুখী হও ভাই।

মিনতি দেবী ওদের নিয়ে ফার্মের বাগানে আসে। চারিদিকে রজনীগন্ধা, গাঁদা ফুলের মেলা। ঠাকুমার পূজোর ফুল যায় এখান থেকে। মিনতি দেবী বাড়িতেও ছোটোখাটো বাগান করেছেন। সুন্দরের প্রতি তার একটা নিবিড় আকর্ষণ আছে। আজ ঝিলিককে দেখে তারও ভালো লাগে। প্রতাপ যে এখন প্রায়ই আসে ওর সঙ্গে সেটা জেনে বলে মিনতি দেবী,

— এসব তো আগে জানাস নি প্রতাপ।

প্রতাপ কি ভেবে বলে,

— যদি কিছু বলো তাই জানাতে পারিনি ঠাকুমা। ঝিলিক আমার বন্ধু। কিন্তু ওর সামনে এখন খুব বড় একটা বিপদ।

মিনতি দেবীও অবাক হয়।

— বিপদ! কিসের বিপদ ঝিলিক? বলো আমাকে।

ঝিলিক ঠাকুমাকে দেখে, ওর কথা শুনে বেশ কিছুটা ভরসা পায়। ছেলেবেলা থেকে সে ঠাকুমা-দিদিমা কাউকে দেখেনি। মায়ের এতটুকু স্নেহও সে পায়নি। মাকে শুধু শাসন করতে দেখেছে। এখানে সে প্রতাপের ঠাকুমার স্নেহময়ী মূর্তি দেখেছে। তার কথাগুলো ঝিলিকের মনকে স্পর্শও করে।

ঝিলিক তার নিঃস্বতার কথা ভেবে আজ চোখের জল আটকাতে পারেনা। সব কষ্ট দুঃখ বেদনা যেন চোখের জল হয়ে ঝরে পড়ে।

মিনতি ওকে কাছে টেনে নেয়। বলে,

— কেঁদো না দিদি। তোমরা তো আজকালকার লেখা পড়া জানা মেয়ে। এত সহজে ভেঙে পড়লে চলে? বলো — কি হয়েছে।

এবার ঝিলিকও ঠাকুমাকে তার এতদিনের জমে থাকা ব্যথা বেদনার কাহিনীটা বলে। মায়ের ওই কঠিন শাসানি - উটকো কেশব বাবুর শাসানি, তার বাবার অবস্থার কথা সবই অকপটে জানায় মহিলাকে।

মিনতি বুজেছে ঝিলিকের মানসিক অবস্থার কথা। ঝিলিক বলে,

— এই অত্যাচার আর সহ্য হয়না ঠাকুমা। মনে হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরবো — মরে তবু শান্তি পাবো। দুনিয়ায় যার কেউ নেই, এছাড়া তার আর কি করার আছে।

মিনতি বলে,

— বালাই ষাট। মরবি কেন দিদি। তুই নতুন করে বাঁচবি।

প্রতাপ বলে,

— কিন্তু ওর বাঁচার পথটা তো বের করতে হবে ঠাকুমা। ওর তো অনেক প্রবলেম।

মিনতি বলে,

— সব প্রবলেমই কেটে যাবে রে।

প্রতাপ বলে,

— কি করে?

— সেটা ভাবতে দে।

তারপর ঠাকুমাই ঝিলিককে বলে,

— তোমার বাবাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

প্রতাপই আগ বাড়িয়ে বলে,

— সে হয়ে যাবে ঠাকুমা। আমিই ওর বাবাকে নিয়ে আসবো তোমার কাছে।

নিখিল বাবুকে প্রতাপেরও ভালো লাগে। ঠাকুমা মিনতি দেবী বলে,

— তাই ডেকে আন। এখন যা ঝিলিককে পৌঁছে দিয়ে আয়।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

ঝিলিক প্রণাম করে ঠাকুমাকে। আজ সে যেন একটা নির্ভর পেয়েছে। ঠাকুমা বলে,

— এত ভেঙে পড়োনা ঝিলিক। মেয়েদের শক্ত হাতে সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়।

মিনতি যে কথাটা ভাবছিল এবার সে যেন আরও বেশী করে ভাবছে। আর ভাবছে সেই ভাবনাটাকে কি করে কাজে পরিণত করা যায়। এর মধ্যেই প্রতাপই ঝিলিকের বাবা নিখিলবাবুকে এনেছে ঠাকুমার কাছে। নিখিল বাবু কিরণ বাবুদের চেনে। শহরের নামী ডাক্তার। নিখিল প্রথমে ভাবতে পারেনি যে কিরণ বাবুর মা তাকে ডেকে পাঠাবে। প্রতাপ কে সে দেখেছে, চেনেও। তবু নিখিল জিজ্ঞাসা করে প্রতাপ কে,

— কি ব্যাপার বলোতো? তোমার ঠাকুমা আমাকে ডেকেছেন।

প্রতাপ ব্যাপারটা ঠিক জানেনা। তাই সে বলে,

— সে তো আমি জানিনা। তবে বারবার করে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। তাই আমাকে পাঠালেন।

নিখিলবাবু বিষণ্ণ মনেই এবাড়িতে আসেন। বেশ বড় বাড়ি। এদিকে ওদিকে বাগান।

শহরের মাঝে অনেকটা জায়গা নিয়ে বাড়ি। নিখিল বাবুকে ড্রইং রুমে বসায় প্রতাপ। ভিতরে ঠাকুমাকে খবর দিতে যায়।

মিনতি দেবী এবার মনে মনে তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, নিখিল বাবু ওকে ছটতে দেখে প্রণাম করে বয়স্কা মহিলাকে। মিনতি দেবী নিখিল বাবুকে দেখেছেন। কিরণেরই বয়সী সে। তবে বেঁটে খাটো শান্ত প্রকৃতির বলেই মনে হয়। এর মধ্যে বাড়ির কাজের লোক সন্দেশ এনেছে থালা ভর্তি। মিনতি বলে,

— মিষ্ঠি মুখ করো বাবা।

— এতো খেতে পারবো না মাসীমা।

— পারবে। এমনকি বয়স তোমার?

নিখিল তখনও ভাবছে উনি আমাকেই বা ডেকেছেন কেন?। তাই — নিজেই প্রশ্ন করে,

— ডেকেছিলেন? কেন বলুন তো।

— ঝিলিক কে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। তোমরা আমাদের পালটা ঘর। আর আমার নাতিকেও চেন।

নিখিল এবার যেন কিছুটা বুঝতে পারে সে। তাকে ডাকার উদ্দেশ্যটা আর অবাকও হয়। তার একমাত্র মেয়ে যদি এই ঘরে পড়ে সেও সুখে থাকবে। নিখিল জানে লবঙ্গের শাসনে আর ঐ পরিবেশে ঝিলিক মোটেই শান্তিতে নেই। আরও শুনেছে ঐ কেশব বাবুর মত লোক ঝিলিকের বিয়ের জন্য পাত্রও খুঁজছে। নিখিলও ওদের বিশ্বাস করতে পারেনা। ওরা ঝিলিককে বিপদেই ফেলবে। তাই মিনতি দেবীর কথায় নিখিল বলে,

— আমার মেয়ের কি সেই সৌভাগ্য হবে মা?

— মেয়েরা কে কার হাঁড়িতে চাল চাপাবে তা আগে থেকেই বিধাতা ঠিক করে রেখেছেন। তাই তোমাকে ডেকেছি তোমার মতামত জানতে। হাজার হোক তুমি তার বাবা।

নিখিল বলে,

— মাসীমা। ঝিলিকের অদৃষ্ঠ খুব মন্দ। ওর মা তো দেশছাড়া — গোত্রছাড়া ধরনের। সে তার মর্জিমতই চলতে চায়। তাকে তো চেনেন।

মিনতি ঝিলিকের মুখেই সব শুনেছে। তার মায়ের পরিচয়ও জানে। আর মিনতি নিজেও দেখেছে ওই লবঙ্গকে আবির মেখে দলবল নিয়ে তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গেছে। মিনতি দেবী বলে,

— হ্যাঁ বাবা। তাকে এই শহরে কেনা চেনে?

নিখিল বলে,

— ওই মহিলা তার সঙ্গী সাথীরা তো মেয়েটাকে যে সে ভাবে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে চায়।

— তুমি বাপ হয়ে বাধা দেবে। তুমি মত দিলে ও কাজটা আমিই করবো তোমার হয়ে।

মিনতির কণ্ঠস্বরে নিখিলও ভরসা পায়। নিখিল বলে,

— তাই যদি করেন মেয়েটা বেঁচে যাবে। আমি পারিনি আপনি আমার ঝিলিককে বাঁচান। দয়া করে বাঁচান। তার জন্য আমাকে যা করতে দেবেন তাই করবো।

— ঠিক আছে। তুমি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো। আমাদের ফোন নম্বর নিয়ে যাও। আর তোমার ফোন নম্বরটাও দিয়ে যাও। তারপর দেখছি কি করা যায়?

মিনতি দেবী আঁটঘাট বেঁধেই এগোতে চান। এবার তাই মিনতি দেবী মনোজ কে ডাকে। মনোজ এখানে প্রায়ই আসে। মনোজ মিনতির কথা শুনে বলে,

— তাহলে তো ভালই হয়। এত বড় বাড়িতে আপনি সারাদিন কাজের লোক নিয়ে রয়েছেন। কিরণ রয়েছে তার ডাক্তারী নিয়ে।

— তাই তো ভাবছি ঘরে এবার একটা লাল টুকটুকে নাতবৌ নিয়ে আসি। আর প্রতাপেরও অমত হবে না।

মনোজ জানে কিরণ কে। ভীষণ গোঁয়ার জেদী সে। তার মনের ইচ্ছাটাকেও জানে সে। কিরণ চায় প্রতাপ ডাক্তারী পাশ করুক। তারপর বিয়েথার কথা ভাববে সে। পুরুষ মানুষকে আগে স্বাবলম্বী হতে হবে।

মনোজ বলে,

— সবই তো বুঝলাম। অন্যদের থেকে অমত আপত্তি থাকবে না, কিন্তু কিরণ। ও যা জেদী গোঁয়ার। ও যদি আপত্তি করে, ও যদি কিছু ঝামেলা বাঁধায়।

মিনতি এবার মনস্থির করে ফেলেছে। বলে,

— ওর মত করাতেই হবে মনোজ। আজই বলছি কিরণকে তারপর তুমি তো আছ।

মনোজ বলে,

— মাসীমা, আমি হার্ডকোর ক্রিমিনাল পিটিয়ে ঠান্ডা করে তাকে পথে আনতে পারি। কিন্তু কিরণকে পথে আনা খুবই কঠিন। দেখুন বলে কয়ে যদি মত করাতে পারেন কিরণের।

কিরণ-লবঙ্গদের সেই অশান্তিটা মেটেনি। সেদিন কিরণের বাড়ির সামনে লবঙ্গ ওভাবে নাচগান করে কিরণকে যে অপমান করেছিল, কিরণ সেটা ভোলেনি। এবার কিরণ কিভাবে তার জবাব দেবে তাই ভাবছে। বেচু ড্রাইভার শহরের যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। ওই

লবঙ্গলতিকা তাদের এগেনস্ট পার্টি। কেশব এদিকে বসে নেই — সে চায় লবঙ্গকে এম-এল-এ ভোটে দাঁড় করিয়ে তার ইলেকশন এজেন্ট হয়ে লাখ কয়েক টাকা হাতে আসবে। সেই জন্য কেশব এখন সক্রিয় হয়ে উঠেছে ঝিলিকের জন্য পাত্রের সন্ধানে। সেই কাজে কেশববাবু নবু ঘটককে কাজে লাগিয়েছে। নবুও এখন শহরের নামী দামী জ্যোতিষশাস্ত্রী হয়ে উঠেছে। মায়ের মন্দিরে বসে কুষ্ঠি ঠিকুজী বিচার করে, শহরের নামী দামী লোকরা যতসব দুনম্বরী কাজ করে পাপ সঞ্চয় করে — নবু তাদের সব পাপ খন্ডন করে দেয়।

চঞ্চল শহরের উঠতি মস্তান। কিছু দিন সে কলেজে পড়েছিল। চঞ্চল নবুরই প্রতিবেশী। কলেজেই পড়তে সে শহরের অন্ধকার জগতের নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে। শহরের সেই সব কারখানা, ধানকলের শ্রমিকদের নিয়ে মাঝে মাঝে মিটিং মিছিল করে।

শহরের বড় মহাজন কেশুভাইয়ের দুতিনটে ধানকল, সিমেন্ট - এর বিরাট প্ল্যান্ট। আগরওয়ালজী ধানকলের শ্রমিকদের লীডার ছিল নরেশবাবু। ওরই উদ্যোগে ওই ধানকল শ্রমিক-রা ধর্মঘট করে। সেই ধর্মঘট জেলার সব ধানকল শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেই সময় ওই আন্দোলনের নেতা নরেশবাবুকে কারা খুন করে। ওদের ধর্মঘটও বানচাল হয়ে যায়।

আর রাতারাতি চটকলেই ওদের সেই নেতৃত্বের শূন্য আসনে বসে এবার ধানকল মালিক, হিমঘর মালিকদের প্রিয়জন হয়ে ওঠে। এখন একটা মোটর বাইক নিয়ে ঘোরে। কেশব বাবুও খাতির করে এই চঞ্চলকে। তার বাড়ির হালও বদলেছে। এখন তিনতলা বাড়িও করেছে। শোনা যায় শহরে তার ড্রাগের ব্যবসা — মদের ঠেকও জোর কদমে চলছে। ওসব নাকি প্রতিপক্ষের রটনা। চঞ্চল এখন নিজেই সিমেন্টের হোলসেল ডিলার করছে। আর কাঁচা পয়সা আমদানী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার পর এখন তার গুদামের ওখানে নাকি মৌজমস্তির আসরও বসায়। নবুই এহেন সুপাত্রকে নিয়ে গেছে লবঙ্গের কাছে। চঞ্চলও জানে লবঙ্গ লতিকার বিষয় আশয়ের খবর। চঞ্চলের নজর আছে লবঙ্গের ওই ফার্মের দিকে। শহরের বাইরে ওই জায়গায় চঞ্চল তার অন্ধকারের ব্যবসার কেন্দ্র বানাতে পারবে। তার দলে থেকে ব্যবসা করতে পারবে পুরোদমে।

কেশবও রয়েছে বসার ঘরে।

নবু ঘটক বলে,

— মা জননী। এমন ভালো ছেলে আর দুটো নেই শহরে। চঞ্চলকে শহরের সকলেই চেনে। সৎ উদ্যোগী ছেলে ও। আর কুষ্ঠি ঠিকুজীর মিলও দারুণ। ঝিলিক মায়ের সঙ্গে চঞ্চলের হবে রাজযোটক। লবঙ্গ দেখছে চঞ্চলকে। ছেলেটাকে সে এর আগেই দেখেছে। এর আগেই সে লবঙ্গের দলের হয়ে ইলেভেন বুলেটস কে মদত দেয়। সেদিন শীল্ড বিজয়ী

দলের আগে আগে মোটর বাইক নিয়ে চঞ্চল আবীর মেখে শোভাযাত্রা করে চলছিল।

কেশবও তৈরী হয়েছিল। চঞ্চল ওরই হাতে তৈরী ছেলে। চঞ্চলের সাথে ঝিলিকের বিয়েটা যদি দিতে পারে, কেশব চঞ্চল দুজনে বেশ সহজেই লবঙ্গকে কোণঠাসা করে নিজেদের প্রাধান্য বাড়াতে পারবে। তাই কেশব বলে,

— সত্যিই তো লবঙ্গ বলেনা প্রদীপের নীচেই যত অন্ধকার। এমন ভালো ছেলেতো আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে অথচ তা দেখেও দেখিনি। নিজের ব্যবসা আর এরমধ্যে রাজনীতিতেও ভালে নাম করেছে। ওকে পাশে পেলে তোমার জয়ের জন্য ভাবতে হবে না। সিওর উইন লবঙ্গ। নবু ভটচায বলে,

— সবই মায়ের ইচ্ছা। মা-ই তার ইচ্ছাপূরণ করবার জন্য চঞ্চলকে এনে দিয়েছেন। মা - জয় মা।

লবঙ্গও কথাটা ভাবছে। শহরের ছেলে আর নামডাকও আছে। ভোটের কাজও লাগবে। চঞ্চল বলে,

— ওসবের জন্য আপনি ভাববেন না। আমার লেবারদের ভোট আমার পকেটে। আর এলাকার বাকী ভোটারদেরও ঠিক আমি সামলে নেব। কেশব জানে বিয়ের ব্যাপারে এক কথায় মত করা যাবেনা। ওষুধটা চালিয়ে গেলে নাকি ফল পাওয়া যাবে। তার জন্য সময় চাই। তাই কেশব বলে,

— লবঙ্গ! দেখ লবঙ্গ! চঞ্চলও আসবে তোমার ভোটের কাজে - এর মধ্যে তুমিও ভেবে চিন্তে মনস্থির করো। মেয়ের বিয়ে বলে কথা — একটু ভাবতে হবে তো। তড়িঘড়ি কোন সিদ্ধান্ত নিতে হবে না।

নবুও সায় দেয়,

— তাই ভাবুন মা জননী, চঞ্চল মাঝে মাঝে এসো মায়ের কাছে।

কেশবও বলে,

— আসবে বৈকি।

চঞ্চল প্রণাম করে লবঙ্গকে। সে বলে,

— আজ আসি মা। খবর দেবেন চলে আসবো — আপনার ভোটের জন্য জান লড়িয়ে দেবো।

ঝিলিক সমস্ত শুনেছে। সে বারান্দা থেকে মা, কেশব বাবুদের কথা শুনেছে। আর মা যে চঞ্চলের মত ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের মথা ভাবছে এটা জেনে ঝিলিকও মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ঝিলিক ঐ চঞ্চলকে ভালোমতই জানে — শহরের মস্তানদের মধ্যে সে অন্যতম। তার নানা কীর্তি কাহিনীর কথাও জানে। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে এখন মস্তানি,

তোলাবাজি করে ব্যবসা ফেঁদেছে — তবু এখনও তার তোলাবাজী বন্ধ হয়নি বরং বেড়েছে। আর কেশববাবু যে চঞ্চলকে সুপাত্র বলবে তাও জানে ঝিলিক। কেশববাবুও চাইবে ওই রকম একটা বাজে ছেলের হাতে ঝিলিককে তুলে দিতে। ওতে তাদেরই সুবিধা হবে। তার মাও এখন ভোটে দাঁড়াবার জন্য তৈরী। তার দরকার কেশব, চঞ্চলদের মত জীবদের। নিজের স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য এখন লবঙ্গও চাইবে ওদের হাতে রাখতে। তার জন্য নিজের মেয়ের ভবিষ্যতের কথাও লবঙ্গের কাছে তুচ্ছ হয়ে উঠছে।

ঝিলিক তাই এবার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে মনে মনে। মায়ের এই ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধ সে করবেই। তাই বারবার মনে পড়ে ঝিলিকের প্রতাপেরই কথা।

লবঙ্গ আঁটঘাট বেধে এগোতে চাইছে। কেশবও তৈরী, এবার ভোটের দিন এগিয়ে আসছে। কেশববাবু বলে,

— নবু বলেছে আজ বিকেল তিনটে বাইশ মিনিটের পর অমৃত যোগ পড়বে। খুব শুভসময়। আমিও ছেলেদের বলে রেখেছি তুমি আজই রেডি থাকবে। লবঙ্গ এখন বিরাট খুশী। সেও এম এল এ হতে চলেছে। সারা শহরের লোক দেখবে মন্ত্রী লবঙ্গলতিকা গাঙ্গুলী চলেছে।

অবশ্য কেশব — চঞ্চল এর মধ্যেই ছোটোখাটো শোভাযাত্রাই বের করে। মোটর বাইকে চঞ্চল — পিছনে তার দল। জিপে লবঙ্গ আর কেশব। ভোটের নমিনেশন দিতে চলেছে। শহরের লোক ওদের শোভাযাত্রা দেখে, লবঙ্গ এর মধ্যে দাঁড়িয়ে জনসাধারণকে নমস্কার জানানোর কৌশলও রপ্ত করে ফেলেছে। খবরটা এর মধ্যে ডাক্তার পাড়াতেও পৌঁছে যায়। বিনুই বলে,

— ডাক্তারবাবু, দেখলাম ওই বুলডোজার চলেছে এম এল এ হতে দলবল নিয়ে। মিছিল করে চলেছে।

কিরণও কথাটা শুনেছিল। তার কয়েকজন বন্ধু বলেছিল ওদিকে হরেনবাবু দাঁড়াচ্ছেন তার সামনে দাঁড়াবার আর কেউ নেই। দাঁড়ালো ওই লবঙ্গ লতিকা গাঙ্গুলী। ও যদি জিতে যায়। কিরণও ভাবছে কথাটা। ওই বুলডোজার হবে এখানের এম এল এ। তারপর যদি মন্ত্রী হয়ে যায় তাহলে তো কিরণের মুখ দেখানোরও উপায় থাকবে না। বিজয় মিছিল নিয়ে আবার আসবে এখানে। ওই মহিলা যেন কিরণের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। কিরণ বলে,

— আমি ও এম এল এ ভোটে দাঁড়াবো। ওই বুলডোজারকে গুঁড়ো করে দেব। খবরটা ডাক্তার পাড়ায় শহরের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই ওই লবঙ্গের উপরে চটে উঠেছে। এবার তারাও চায় তাদেরই একজন এম এল এ হোক। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হতে পারবে তাহলে এখান থেকে। লবঙ্গের চেয়ে কিরণ একজন যোগ্য প্রার্থী। তারাও বলে,

— তাই ভালো। তুমিই দাঁড়াও কিরণ। আমরা তোমার পাশে আছি। বহু ভদ্রলোকও চান কিরণবাবুই ভোটে দাঁড়াক। অনেকেই সে কারণে আসে কিরণের বাড়িতে। তার হলঘরে জরুরী সভাও বসে। এবার সেই সভায় সিদ্ধান্ত হয় কিরণবাবুকেই ভোটে দাঁড় করাবে।

কিরণের মিছিলও বের হয়। আর আজই কিরণ যাবে তার নমিনেশন জমা দিতে।

মিনতি দেবী বলে,

— ও কিরণ, এসব কি হচ্ছে? ওই সব রাজনীতির কূট কৌশলে যাসনি বাবা। কিরণ গর্জে ওঠে,

— তুমি আমাকে বাধা দিওনা মা। সেদিন ঐ মহিলা বাড়ির সামনে এসে চ্যালেঞ্জ করে গেল। আর আমি চুপ করে থাকবো? কখ্খনো না। নেভার।

কিরণের দলও তৈরী। তারা শ্লোগান দিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে চলেছে শোভাযাত্রা নিয়ে। কিরণ চলেছে পায়ে হেঁটে। জনতাকে নমস্কার করতে করতে। পিছনে গাড়ির মিছিল। বহু লোকজন জুটেছে। ডি. এম অফিসের সামনে লবঙ্গের দল পৌঁচেছে। ওরা দেখে সেখানে হরেনবাবু ছাড়া আর কোন প্রার্থী নেই। কেশব বলে,

— লবঙ্গ, হরেনবাবুর বয়স হয়েছে। তার তুলনায় তুমি ইয়ং দেখবে এবার ভোটে তুমিই জিতছ।

চঞ্চল বলে,

— দেখবে কি? সিওর উইন।

ওদিকে আবার এসে পড়েছে আর একটা মিছিল। কেশবও চমকে ওঠে।

লবঙ্গ বলে,

— আবার কে দাঁড়াচ্ছে আমার এগেনস্টে?

চঞ্চলও চিন্তিত। এবার তারা দেখে সদলবলে আসছে কিরণ বাবু। বীরদর্পে এগিয়ে যায় কিরণ ডি. এম অফিসের দিকে। লবঙ্গ ওর দিকে তাকায়। চার রক্তচক্ষুর মিলনও হয়। নেহাৎ-ই কলিযুগ, সত্যযুগ হলে কিরণ ওর চাহনির তেজে লবঙ্গকে ভস্মীভূত করে দিত। সেটা না পারলেও সে তার কঠিন চাহনিতে জানিয়ে যায় এবার বিজয় মিছিল করে লবঙ্গের দরজায় কিরণ তার দলবল নিয়ে তান্ডব নৃত্য করে আসবে।

কিরণ ঢুকে যায় অফিসে নমিনেশন ফাইল করার জন্য লবঙ্গকে ওভার টেক করে। লবঙ্গ যেন কিছুটা বিব্রত। কেশব বলে,

— তুমিও এগিয়ে চলো লবঙ্গ, লেডিজ ফার্স্ট। নমিনেশন তুমিই আগে ফাইল করবে, চলো —

লবঙ্গও এবার মনের জোর ফিরে পায়। একটা হস্তিনীর মতো ধেয়ে যায় অফিসের

ভেতরে। বাইরে তখন দুদলের পাল্টাপাল্টি স্লোগান চলছে। লোকজনও জুটে গেছে। শহরের লোকজনও জেনেছে যে শুধু হরেনবাবুই নয়, এবার আসরে নেমেছে লবঙ্গ উকিল আর কিরণ ডাক্তার। লড়াইটা এবার ত্রিমুখী হবে। আর জোরদার লড়াইও হবে।

এবার শুরু হয়েছে কিরণের প্রস্তুতি — তার চেম্বারের একটা ঘরে শুরু হয়েছে কিরণের নির্বাচনী অফিস। তার মধ্যে তার দলেও এসে জুটেছে বেশ কিছু ছেলে। তারাও চায় লবঙ্গকে হারাতে। জার জন্য বেশ কিছু পোস্টার ব্যবহারও হয়েছে আর ওই লবঙ্গের নানা কীর্তি নিয়ে বক্তৃতা ছাড়াও লেখা হয়েছে দেওয়ালে।

লবঙ্গের ক্যাম্পও বসে নেই। কেশব বাবুর নেতৃত্বে চঞ্চলের দলবল ও মদের কারবার ড্রাগের কারবার বন্ধ রেখে নেমে পড়েছে ময়দানে। কিরণের গোঁফ সমেত ছবি এঁকে তার ডাক্তারীর নামে লুঠ করার কাহিনীও লিখেছে দেওয়ালে। কিরণ বলে ওঠে - ক্যাম্পেন জোরদার করো। দিনে দুটো করে মিটিং করতে হবে। কিরণ মিটিং - এর ভাষণ লিখতে ব্যস্ত। এখন তার সময় নেই। পায়ে হেঁটে জনসংযোগ করছে সে।

লবঙ্গের সেই সাধ্য নেই। বিশাল শরীর — এতটুকু হাঁটলেই দম ফুরিয়ে যায়। তাই সে জিপে বসে ঘুরছে সর্বত্র। কিরণ ঘুরছে বাড়িতে বাড়িতে, লবঙ্গ ঘুরছে পথে পথে। এর মধ্যে কেশব, চঞ্চলও বসে নেই। তারা লবঙ্গের নির্বাচনী ফাণ্ডে টাকা তো মারছেই। এবার চঞ্চলও জানে ভোটের গরমটা থাকতে থাকতে ভোটের রাজভোগটা ঘরে তুলতে হবে। কাবণ ভোটে যদি লবঙ্গ জিতে যায় তার কথা আর ভাববেনা।

মিনতি দেবী সেদিন ফার্মে গেছেন।

ঝিলিক মাঝেমাঝে কলেজের পর সেখানে চলে আসে। ওর বাড়িতে মন টেকেনা। কিছুদিন আগেই ঝিলিকের সাথে লবঙ্গের একজোট কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে।

লবঙ্গ এখন ভোট নিয়ে মেতেছে। প্রায় রোজই মিটিং মিছিল অর্গানাইজ করছে এখন কেশব, চঞ্চলরা। চঞ্চল নিজের গুরুত্ব দেখানোর জন্য খুবই ব্যস্ত। পোস্টারিং, ক্যাম্পেন, ব্যানার টাঙানো সব কাজের তদারক করছে সে।

সেদিন একটা মিটিং - এ গেছে লবঙ্গ। বেশ জনসমাগম হয়েছে। কেশবও রয়েছে। চঞ্চলও এর মধ্যে তার কিছু ছেলেকেও ফিট করে রেখেছে।

চঞ্চল বলে,

— মিটিং শুরু হলেই তোরা ওদিক এদিকে দুচারটে বোমা ফাটাবি। সাবধান যেন কেউ টের না পায়। কাজ সেরে ভিড়ে মিশে যাবি। তারপর যা করার আমি করবো।

ওর দলের ছেলেরা সেই মতো দুচারটে বোমা এদিকে ওদিকে ফাটায়। ধোঁয়া - কলরব আর্তনাদ ওঠে। মঞ্চে তখন লবঙ্গ তেজস্বিনী ভাষণ দিচ্ছিল। তার কণ্ঠস্বরও থেমে

যায়। ভীতচকিত লোকেরা এদিক চাইছে। তারা লুকোবার মত জায়গা খুঁজে পায়না।

এবার চঞ্চল বলে,

— ভাইসব এসব ওই বিপক্ষ দলের কাজ। তারা আমাদের নেত্রীকে হারিয়ে দিতে চায়। আমরা থামবো না। আপনারা শান্ত হোন। আমাদের ছেলেরা চারিদিকে রয়েছে। আমরা দুষ্কৃত কারীদের শাস্তি দেবই। এসব ওই বিপক্ষ দলের কাজ। শত্রুদের চিনে রাখুন।

চঞ্চলের ছেলেরাও সভাতে আবার শান্তি ফিরিয়ে এনেছে। সভার কাজও শুরু হয়। চঞ্চল বলে লবঙ্গকে,

— আমি আছি ভয় নেই। আপনি ভাষণ দিন। শত্রুদের এই জঘন্য আক্রমণের নিন্দা করুন।

লবঙ্গও এবার প্রকাশ্যে কিরণ বাবুর দলের এই ঘৃণ্য কাজের জন্য প্রতিবাদ জানায়। লবঙ্গও বুঝেছে যে চঞ্চল, কেশবদের তার দরকার। বিশেষ করে চঞ্চলকে। তাই এবার মনস্থির করে ফেলে সেদিন ঝিলিককে বলে,

— আমি তোমার বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি।

ঝিলিক পড়ছিল। পড়াবন্ধ করে মুখ তুলে চাইল। লবঙ্গ বলে,

— পাত্রের সন্ধান আমি করেছি। ভাবছি সামনের মাসেই শুভকাজ সেরে ফেলব।

ঝিলিক বলে,

— এখনি আমার বিয়ে করবার ইচ্ছা নেই মা। সমানে পরীক্ষা। এসব চুকিয়ে তারপর বিয়ের কথা ভাববো।

ওদিকে কেশবও চাপ দিচ্ছে লবঙ্গকে,

— চঞ্চলের সঙ্গে ঝিলিকের বিয়েটা দিয়ে দাও। নাহলে চঞ্চল যদি অন্য ক্যাম্পে চলে যায় তাহলে তীরে এসে তোমার তরী ডুবে যাবে। জেতা সিটটাই হারবে। আর জিতলে একলাফে মন্ত্রী।

অবশ্য চঞ্চলই কেশবকে বলেছে এই ব্যাপারে লবঙ্গকে চাপ দিতে। তাই কেশবও বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

লবঙ্গও চিন্তায় পড়েছে। চঞ্চল এসময় দল ছেড়ে চলে গেলে তার সত্যিই সর্বনাশ হবে। কিরণই জিতে যাবে। সেটা লবঙ্গ এজীবনে সহ্য করতে পারবে না। ওকে হারাতেই হবে। তাই মেয়েকেও এবার চাপ দেয় লবঙ্গ। কিন্তু ঝিলিক এখন প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। সে বলে,

— ওই চঞ্চল শহরের নাম্বার ওয়ান মস্তান- তোলাবাজ। দলবল নিয়ে গুন্ডামি করে। ওই লোককে বিয়ে করতে বলছ মা? তোমার কি বুদ্ধিও হারিয়ে গেছে?

লবঙ্গ গর্জন করে,

— সাট আপ। আমার জ্ঞান বুদ্ধি হারায়নি — যা করছি জেনে শুনেই করছি। আমার কথা তোমাকেই মানতে হবে।

ঝিলিকও চটে ওঠে।

— বিয়েটা আমার ব্যাপার। ওটার সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে দাও। ঝিলিকও বের হয়ে যায়। লবঙ্গও ফুঁসছে।

— তোমার সব তেজ আমি ধূলোয় মিশিয়ে দেব।

ঝিলিকও বুঝেছে এবার তাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাই আসে কলেজের পর প্রতাপদের ফার্মে। মিনতিও ওর জন্যই এখন ফার্মে আসে। আর প্রতাপও আসে এখন। মিনতি ঝিলিকের মুখে সব শুনে বলে,

— তোমার মা ওই বাঁদরটার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা ভাবছে ঝিলিক?

— হ্যাঁ ঠাকুমা।

মিনতিও চেনে চঞ্চলকে। শহরের বখাটে ছেলেদের অন্যতম। দু'একবার পুলিশও ধরেছে তাকে। তবে শহরে নেতাদের ফোন পেয়ে থানার অফিসার চঞ্চলকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। মিনতিদেবী বলে,

— ও প্রতাপ, শুনেছিস ঝিলিকের কথা।

প্রতাপ বলে,

— যা হয় কিছু কর ঠাকুমা।

ঝিলিক কাঁদতে কাঁদতে বলে,

— মা যদি জোর করে বিয়ে দেয়, আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরা ছাড়া উপায় থাকবে না। মা ভোটে জেতার জন্য চঞ্চলের হাতেই হয়তো আমায় তুলে দেবে।

মিনতি বলে,

— না — তা আমি হতে দেবো না। তার আগেই যা হয় একটা কিছু করতে হবে।

প্রতাপও তাই চায়। তার জীবন থেকে ঝিলিক চলে যাবে এটা সে হতে দেবে না। ঝিলিকও প্রতাপকে হারাতে চায় না।

মিনতি দেখে দুটি ব্যাকুল প্রেমিক মনের এই ব্যাকুলতা। ওদের পবিত্র সম্পর্ককে সে ব্যর্থ হতে দেবে না।

কিন্তু মিনতি জানে কিরণ কোনদিনই ওই লবঙ্গলতিকার মেয়েকে জেনেশুনে তার পুত্রবধূ বলে মেনে নেবে না। কিরণ এখন লবঙ্গের সঙ্গে সম্মুখ সমরে নেমেছে। কিরণও শুনেছে লবঙ্গ তার ওই লোকদের দিয়ে তার সভায় বোমা ফাটিয়ে কিরণের বিরুদ্ধে নালিশ

করেছে থানায়। সভায় সে সব প্রচারও করেছে।

কিরণের দলও এনিয়ে প্রতিবাদ করেছে। তাদের মিটিং -এ কিরণও ঘোষণা করে — প্রতিপক্ষ হেরে যাবার ভয়ে কিরণবাবুর নামে এই সব অপবাদ দিয়েছে। বন্ধুগণ আপনারা ভোটের বাক্সে এর সমুচিত জবাব দেবেন। ওই বুলডোজার মহিলাকে একটা ভোটও দেবেন না।

এমন অবস্থায় তার মেয়েকে ঘরে আনতে রাজী হবে না কিরণ। তা ভালই জানে মিনতি দেবী। অবশ্য ঝিলিকের মতো সুন্দর একটা মেয়েকে বাঁচাতেই হবে চরম বিপদের হাত থেকে। তাই তিনি মনোজবাবুকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

মনোজবাবু থানার চার্জে এসে এর মধ্যে শহরের নামী দামী লোকদের খবর যেমন নিয়েছেন — তেমন এখানের তোলাবাজ, মস্তানদের খবরও নিয়েছেন। জেনেছে চঞ্চলের নামও। থানার কিছু ইনফর্মার থাকে। তারা শান্ত শিষ্ট নয়। তারা টুকটাক কিছু করে ওই মস্তানদের কাছের মানুষ। তাই তাদের গোপন খবরও কিছু জানে।

গুপী তেমন একটা চরিত্র। বাজারে তার একটা ফুলের দোকান আছে। ওটা ওর বাইরের পরিচয়। ভিতরে ভিতরে সে বেশ কিছু এদিক ওদিকের কাজও করে। আর ওই জগতের বিগ বসদের নাম ধামও জানে। গুপীকেই মনোজ একটু আলগা দিয়ে রেখেছে — তবে একটা শর্তে। গুপী কিছু খবর দেয়। গুপীও জানে বড় বাবুকে কিছু খবর না দিলে অন্যদের সঙ্গে তাকেও তুলে নিয়ে গিয়ে কারণে অকারণে পালিশ করে দেবে। মাঝে মাঝে অবশ্য পুলিশ গুপীকে লোক দেখানো তুলে নিয়ে যায় বেশ ধমক ধামক দেয় — দুএকটা চড় চাপড়ও মারে যাতে দলের অন্যরা গুপীকে কোনরকম সন্দেহ না করে।

গুপীও তা জানে। তাই মাঝে মাঝে মনোজবাবুর কোয়ার্টারে পূজোর ফুল পৌঁছে দেবার অছিলায় ওর কাছে গিয়ে গোপন তত্ত্ব দিয়ে আসে। মনোজবাবু তাই শহরের হালফিল অন্ধকার জগতের অনেক খবর পায়। তাই চঞ্চলের খবর সে জানে। ইদানীং ভোটের কাজে সব দাগী আসামীই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সেদিন লবঙ্গলতিকা দেবী থানাতেও গেছে কিরণবাবুর নামে নালিশ করতে — ওর দল তার সভায় নাকি বোমাবাজি করেছে।

মনোজবাবু বলেন,

— আপনি তো উকিল। উপযুক্ত প্রমাণ নাহলে এসব অভিযোগ নেওয়া যায়না তাতো জানেন।

লবঙ্গ বলে,

— আপনি অভিযোগ নিতে বাধ্য।

মনোজবাবু বলেন.

— ছোট বাবু — এর একটা ডাইরী নিয়ে রাখুন। আর কেসটার তদন্ত করে রিপোর্ট দেবেন।

মনোজবাবু এসেছে কিরণ ডাক্তারের এখানে। কিরণ তখন রাগে ফুঁসছে।

— আমার নামে বিচারের তদন্ত করতে এসেছে। ওই বুলডোজারের হয়ে?

— ওটা ছোটবাবু করেছেন। তবে তোমাকে বলছি ওই মহিলার থেকে সাবধান থেকো হে। বুলডোজারই নাম — উনি সত্যিই ডেঞ্জারাস মহিলা, তোমায় না ফাঁসিয়ে দেয়।

কিরণ গর্জন করে,

— এম এল এ হই। তারপর দেখবো ওকে।

— তা ডাক্তারী ছেড়ে কি নেতাগিরি করবে?

— না - না। দেখছো তো এখন ডাক্তারী করছি। আর ওই বুলডোজারকে আমি হারাবই।

মনোজবাবু ভিতরে আসে। মিনতি দেবী ওর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।

মনোজ বলে,

— মাসীমা কিরণ তো এখন রণে মত্ত।

— আমার হয়েছে বিপদ। ঝিলিককে দেখেছো তো —

— হ্যাঁ। মনোজ ওকে আগে দেখেছে।

— ওর মা তো ঝিলিকের বিয়ের ঠিক করেছে চঞ্চলের সাথে। শহরের নামী মস্তান।

চটে ওঠে মনোজ। তারও ঝিলিককে ভালো লেগেছে — প্রতাপের সঙ্গে ভালো মানাবে। কিরণ লবঙ্গ যদি শান্তি চুক্তি করে দুটি সংসার দুটি মানুষ সুখী হবে। কিন্তু তা হবার নয়। তবু ঝিলিকের সঙ্গে প্রতাপের বিয়ের কথা শুনে মনোজ বলে,

— এই ভাবে ফুলের মত একটা মেয়ের জীবন নষ্ট হবে?

— তাই তোমায় ডেকেছি মনোজ। যদি প্রতাপের সঙ্গে ঝিলিকের বিয়ে দিই। ওরা দুজনেই তো এখন সাবালক। আইনগত কোন বাধাই নেই।

— না তা নেই। কিন্তু বাধা তো ওদের দুজনার মা - বাবা।

তারা তো দুজনে এখন দুজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। ওরা কেউই এ বিয়েতে রাজী হবে না।

— ওরা দুটো তো চুলোচুলি করুক। দুটোই গোহারা হারবে তবে ঠান্ডা হবে। কিন্তু মাঝখান থেকে প্রতাপ আর ঝিলিকই কষ্ট পাবে। মেয়েটার জীবনটাই বরবাদ করে দেবে ওর মা। কি অধিকার আছে তার। তুমি তো থানার অফিসার। ঝিলিক যদি তোমার কাছে

এমন কোন লিখিত অভিযোগ করে তুমি কি করবে?

কথাটা ভাবছে মনোজ। মনোজ বলে,

— তাহলে একটা এনকোয়ারী অবশ্যই হবে। কিন্তু তাতে তো সমস্যার সমাধান কিছু হবে না। প্রবলেম্ সলভ্ করার পথ বের করতে হবে।

মিনতিদেবী বলেন,

— দুটোই তো সাবালক, ওরা তো নিজেদের ইচ্ছায় বিয়ে করতে পারে।

— তা নিশ্চয় পারে। তাতে কেউ বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু কিরণ রাজী হবেনা।

— ওকে জানাবার দরকার নেই। লবঙ্গও জানবে না। আমাদের ফার্মে ওদের রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ হবে। আর রেজিষ্টার কে ওখানেই আনবে।

— ও যদি ছেলে বৌকে ঘরে না তোলে?

— ওসব আমি সামলে নেব। তুমি ওদিকে লবঙ্গ আর চঞ্চলকে সমালাও। মনোজ চঞ্চলের অনেক কুকীর্তির খবর পেয়েছে। তাছাড়া খুনের অভিযোগও আছে ওর নামে। অনায়াসে বছর পাঁচেকের জন্য ওকে জেলে পুরতে পারবে। তাই বলে,

— ঠিক আছে মাসীমা। ওসব আমি সামলে নেব। আপনি কিরণকে সামলান।

— তাহলে সামনের সোমবার বিয়ের দিন আছে। ওই দিন গোধূলীলগ্নেই বিয়ে।

ঝিলিকও ভাবছে কথাটা। তার জীবনে এখন একটা চরম মুহূর্ত সমাগত। লবঙ্গ এখন ভোটের কাজের ফাঁকে চঞ্চল, তেলিয়াকে নিয়ে বসেছে ভিতরের ঘরে। এখন ওদের ভোটের কথা নয়। চঞ্চলের বিয়ের ব্যাপারেই কথা হবে। চঞ্চলের অবশ্য দাবী দাওয়া কিছু নেই। চঞ্চল জানে সূঁচ হয়ে লবঙ্গের পরিবারে ঢুকতে পারলে সে ফাল হয়ে বের হবে। লবঙ্গের যথা সর্বস্বই দখল করবে। তারপর ঝিলিককে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে ঘরের কোণে বন্দী করে রাখবে। তারপর আর একটা বধূ হত্যার ঘটনাই ঘটবে। আর সেটাকে সুকৌশলে আত্মহত্যা বলেই চালিয়ে দিয়ে লবঙ্গের সব কিছুর মালিক হবে। তাই চঞ্চল বলে,

— কেশবদা, আমি দেশ সেবার কাজ করি। তার উপর পণের ঘোরতর বিরোধী। ওসব পণের কথা বলবেন না। ঝিলিককে বিয়ে করছি — ব্যস্। নো ডিম্যান্ড —

কেশব বলে,

— চঞ্চলের কথা শোনো লবঙ্গ। সত্যি ভালো ছেলেই পেয়েছে। সবই প্রজাপতির নির্বন্ধ। তাহলে সামনের সোমবারই শুভদিন। নবুদাও বলছিল। ওই দিন গোধূলি লগ্নেই বিয়ে হোক।

লবঙ্গ বলে,

— এত তাড়াতাড়ি! উদ্যোগ আয়োজন করতে হবে! সবাইকে বলতে হবে। একমাত্র মেয়ের বিয়ে বলে কথা!

— চঞ্চল চায় শুভকাজটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলতে। কেশবও চায় শুভস্য শীঘ্রম কাজটা হোক। লবঙ্গ ভোটের পর বদলে যাবে। কেশব ভোটের হাওয়া ভালোই বোঝে। লবঙ্গের জেতার আশা নেই। ভোটের মিটিং-এ লোকজন আসে লবঙ্গের কান্ড দেখতে। কেউ বলে,

— বাচ্চা হাতিটাকে এবার চিড়িয়াখানায় পাঠাবে!

কেশব জানে ভোটে কি হবে। তবে ওরা লবঙ্গকে এখনও গ্যাস দিয়ে চলেছে। তাই গ্যাস, হাওয়া থাকতে থাকতে চঞ্চল তার কাজ হাসিল করতে চায়। কেশব বলে,

— লবঙ্গ, এখন হালফ্যাশনের যুগ। বিয়েতে বেশী খরচের দরকার নেই। আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়েটা হয়ে যাক। পরে ভোটে জিতলে তখন বিজয় উৎসব — মেয়ের বিয়ের উৎসব এসব জমিয়ে করা যাবে।

লবঙ্গও রাজী হয়। কথাটা ঝিলিককেও বলে লবঙ্গ।

— এই সোমবার তোর বিয়ে। চঞ্চল ভালো ছেলে। তুই আর অমত করিস না।

চুপ করে থাকে ঝিলিক। লবঙ্গও ভাবে মেয়ের সুমতি হয়েছে তাহলে। বলে লবঙ্গ,

— তোর পছন্দমত সবকিছু কিনতে হবে তোকে। শাড়ি-গয়না সবকিছু। চল আজই চল্। ওসব সেরে আসি।

ঝিলিককে দোকানে নিয়ে এসেছে লবঙ্গ। বলে লবঙ্গ,

— বেনারসী শাড়ি — আর যা যা লাগবে সব দেখে নে। তোর পছন্দ মত যা দরকার নে।

ঝিলিকও বাধ্য মেয়ের মত সবই নেয়। গহনার দোকানেও গেছে ঝিলিক — লবঙ্গ বলে,

— আমার তো অনেক গহনাই আছে আলমারীর লকারে — লবঙ্গ বলে,

— তবু নতুন কিছু নে। হার — কানের দুল —

মা-ই ওর হয়ে সব কিছু কিনে দেয়। নিতে হয় ঝিলিককে।

লবঙ্গের সময় নেই। ইলেকশনের কাজ চলছে জোর কদমে। তবু তার ফাঁকে সে মেয়ের বিয়ের আয়োজনও করছে। নবু ভটচার্যও এসেছে লবঙ্গের বাড়িতে। শুভ বিবাহের ফর্দও সে করেছে ফিট তিনেক লম্বা একটা কাগজে। লবঙ্গ বলে,

— এতসব আয়োজন আপনাকেই করতে হবে ভটচায মশাই। নবুদাও তাই চায়। ও সবকিছু

তার স্টকে আছে। সে ইতিপূর্বে ডজন খানেক বিয়েই দিয়েছে। এবারও দেবে। নবু বলে,

— তাই হবে মা জননী। শুধু মূল্য ধরে দেবেন। সব আয়োজন আমিই করে নেব।

চঞ্চলও খুশী। তার বাড়িতে রয়েছে বিধবা মা। সেও বলে,

— তাহলে তোর বিয়ে হবে চঞ্চল! শুনলাম বড়ঘরের একমাত্র মেয়ে।

চঞ্চল বলে --- তারাই বিয়েতে মত দিয়েছে। তাই করছি। এই সোমবার বিয়ে।

মা বলে — সেকি রে! বিয়ের আয়োজন।

চঞ্চল বলে,

— ওসব ভেবোনা। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

চঞ্চলও এবার স্বপ্ন দেখছে। সে এতদিন শহরে মস্তান বলেই পরিচিত ছিল। এবার ঝিলিককে বিয়ে করে তারই গোত্রান্তর ঘটবে। এবার সেও শহরের দামী লোকজনদের সম গোত্রীয় হয়ে উঠবে। আর তাকে তোলাবাজীও করতে হবে না। বাড়িটা রং করিয়েছে চঞ্চল। নতুন আলমারীও কিনেছে। বেডরুম — ড্রইংরুম এসব সাজিয়েছে। ঝিলিক আসবে তার ঘরে, লক্ষ্মীর সম্পদ নিয়ে। চঞ্চল মাকে বলে,

— নতুন বউ - এর সঙ্গে বুঝে বুঝে কথা বলবে মা। লেখাপড়া জানা বড় ঘরের মেয়ে।

চঞ্চলের মা সংসারের অতীতের রূপটা দেখেছে। সবদিন ঠিকমত খাওয়াও জুটতো না। আর জীবনের কঠিন অভাবের সঙ্গে লড়াই করে সেও রুক্ষ - কঠিন হয়ে উঠেছিল। এখন চঞ্চলের চেষ্টাতে দিন বদলেছে। চঞ্চলের মা বলে, ওসব নিয়ে তুই ভাবিস না বাবা।

চঞ্চলও বিয়ের পর বৌভাতের অনুষ্ঠান করবে। তার ছেলেরাও লেগে পড়েছে এই কাজে। বাড়ির সামনের মাঠে প্যান্ডেল তৈরী হয়েছে। চঞ্চল বেশ খরচা করেই সুন্দর কার্ড ছাপিয়েছে। নিমন্ত্রণ পত্রও বিলি শুরু হয়েছে। বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে।

ঝিলিক দেখেছে এখন চঞ্চল, কেশববাবুও খুব ব্যস্ত। তাদের লোকজন এসে ওদের বাড়ির উঠানে ছাদনাতলা বানিয়েছে কলাগাছ — ডাব — ঘট — বাঁশের কঞ্চি এসব দিয়ে। ঝিলিক দেখে মা — কেশবদারা কি জরুরী কাজে বের হয়ে গেল।

ঝিলিক এর মধ্যে তার কিছু জিনিসপত্র, টাকা — গহনা এসব স্যুটকেশে ভরে রেখেছিল সুযোগের অপেক্ষায়। সে জানে চঞ্চলরাও তাকে ছাড়বে না। তবু আজ সে ভয় পায় না। নিজেকে সে বাঁচাবার জন্যই আজ এই পথ নিয়েছে।

এই ফাঁকেই প্রতাপও গাড়ি নিয়ে এসেছে রাস্তার মোড়ে। দোতলার জানলা থেকে গাড়িটাকে দেখে ঝিলিকও পিছনের দরজা দিয়ে নেমে এসে তার গাড়িতে ওঠে। প্রতাপও

গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যায় সিধে তাদের ফার্মের দিকে।

কিরণ আজ চারটে নির্বাচনী মিটিং নিয়ে ব্যস্ত। সকালে তার চেম্বারের কাজ চলে বেলা অবধি। সেখানে রোগীদের ভিড় জমে থাকে। বেলা দুটো নাগাদ খাওয়া সেরে ঘন্টা খানেক বিশ্রাম নিয়ে বেলা তিনটে নাগাদ বের হয় ইলেক্‌শনের কাজে। বিকাল পাঁচটা থেকে একটার পর একটা মিটিং সেরে ফেরে, তখন রাত দশটা।

মিনতি জানে কিরণের এই প্রোগাম। তাই দুপুরে সে বাড়িতেই রয়েছে। কিরণ খেতে আসে। মিনতি ওর খাবার দিয়েছে। কিরণ শুধোয়,

— প্রতাপ চলে গেছে তো?

মিনতি বলে,

— কখন চলে গেছে! এখন তো পড়ার খুব চাপ!

কিরণ বলে,

— মেডিক্যাল কলেজে পড়বে আর ফাঁকি দেবে, তাতো হয়না! এখন তো ওকে খাটতেই হবে। দেখবে যেন রোজ পড়তে বসে।

মিনতি বলে,

— তুই তো ইলেকশন নিয়েই রইলি!

— থাকবো না? ওই বুলডোজার লেডিকে ভোটের জবাবটা দিতে হবে না! ওকে আমি ঠান্ডা না করে শান্তি পাবো না। আমার সঙ্গে লাগবে?

কিরণ ফুঁসতে থাকে। মিনতি বলে,

— এখন শান্তিতে খা তো। দিনরাত লড়াই চলবে তোদের!

কিরণ বলে,

— ইয়েস্! ওই লেডিকে টিট না করা পর্যন্ত এই লড়াই চলছে, চলবে।

লবঙ্গ আজ সন্ধ্যাতে কোন মিটিং করতে পারবে না। তার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান। তাই এই বেলাতেই দুটো মিটিং সেরে ইলেকশান অফিস হয়ে ফিরছে। এখন তিনটে বাজে প্রায়। বাড়ি নিস্তব্ধ। ক্লান্ত লবঙ্গও স্নান খাওয়া করে একটু বিশ্রাম নিতে যায়। দুপুরে একটু ঘুমাতে পারলে ক্লান্তিটা যাবে। আর শোবার পর লবঙ্গ ঘুমিয়ে পড়ে।

ওর ঘুম ভাঙে কাজের মেয়ের ডাকে।

— ওঠো দিদিমণি, কেশববাবুরা এসেছেন। ভটচায মশাইও এসে গেছে।

লবঙ্গও ধড়মড় করে ওঠে। এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়।

— ওমা! এত দেরি হয়ে গেছে! বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন সব বাকী।

চোখে মুখে জল দিয়ে বসার ঘরে আসে। নবু ভটচায বলে,

— গোধূলী লগ্নের দেরী নেই। সব আয়োজন করেছি। মা জননী, কন্যাকে সাজানোর ব্যবস্থা করো।

লবঙ্গও এবার হাঁক পাড়ে,

— ও বিনুর মা, ঝিলিককে তৈরী হতে বলো। আমি নিজেই যাচ্ছি। যা মেয়ে, ওকে টেনে না তুললে উঠবে না। যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া পড়শির ঘুম নেই।

ঝিলিকের ঘরের দরজাটা ভেজানোই ছিল। লবঙ্গ দরজা খুলে ঢুকে দেখে ঝিলিক নেই। বোধ হয় বাথরুমে গেছে। তাই ডাকতে থাকে। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে বলে,

— বিনুর মা, ঝিলিককে দেখছি না। দেখো তো, বোধহয় ছাদে গেছে কিনা।

কিন্তু ছাদে কেন, সারা বাড়িতে তার দেখা মেলে না। সারা বাড়ি হন্যে হয়ে খুঁজছে। ঝিলিকের কোন চিহ্ন নেই। হঠাৎ বিছানার উপর দেখে টেবিল ট্যাম্প চাপা দিয়ে একটা চিঠি রাখা। ঝিলিকের চিঠি। সে লিখেছে, এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে সে। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবে। এখানে আর নয়। লবঙ্গ এবার আর্তনাদ করে ওঠে,

— একি সর্বনাশ হল আমার কেশববাবু?

কেশবও চিঠি দেখে। বুঝেছে ঝিলিক বাড়ি থেকে পালিয়েছে। আর তার এইভাবে চলে যাবার পিছনে নিশ্চয়ই কেউ আছে। কেশব বলে,

— লবঙ্গ, ঝিলিক নিশ্চয়ই আর কারো প্ররোচনায় এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। ওর পেছনে আর কেউ আছে।

লবঙ্গ হুঙ্কার দিয়ে ওঠে,

— কার এত বড় সাহস! আমার মেয়েকে অপহরণ করবে! কে সে?

কেশব বলে,

— কে আবার! কিরণরাই হয়তো এর পিছনে আছে। ঝিলিককে অপহরণ করেছে সেই কিরণ ডাক্তারই। মনে হয় এসব তারই কারসাজি।

লবঙ্গ গর্জন করে ওঠে,

— আমি পুলিশেই যাবো। ওই কিরণের নামে এবার আদালতে কেসই করবো। জেল খাটাবো।

খবরটা তখন হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। ঝিলিককে কারা ফুঁসলে নিয়ে গেছে কৌশলে, না হয় অপহরণই করেছে। খবরটা চঞ্চলের বাড়িতেও পৌছে যায়। চঞ্চল তখন বরের সাজ সেজেছে। পরণে দামী ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী। কপালে চন্দনের ফোঁটা। চোয়াড়ে মার্কা চেহারায়, চুপসানো মুখে ওই চন্দনের ফোঁটাগুলো বিচিত্র দেখায়। চঞ্চলও খবর

পেয়ে ওই অবস্থাতেই ছুটে আসে।

এখন লবঙ্গের বাড়িতেও শোকের ছাপ। চঞ্চলও ব্যাপারটা বুঝে স্তব্ধ হয়ে গেছে। নবু ভটচায ভাবতেও পারেনি যে, বিয়ের আগেই কাজ ভেস্তে যাবে। বিয়ে ভন্ডুল হতে দেখে নবুও আর দাঁড়ায়নি। ছাদনাতলা শূন্য। ঘটগুলো ভেঙে গেছে, কলাগাছ মাটিতে পড়ে। ঘটের জলে আলপনাও ধুয়ে গেছে। লবঙ্গ তখন গর্জাচ্ছে,

— পুলিশে খবর দাও। চলো, ওই কিরণের নামেই ডায়েরী করবো। চঞ্চল গর্জাচ্ছে.

— পটলা, ন্যাপা — রেডি হ। মাল মশলা রেডি কর। ডাক্তারের বাড়ি আজ বোমা মেরে উড়িয়ে দেব। ঝিলিককে তুলে নিয়ে যাবে!

মনোজবাবু থানায় নেই। এখন তার অফ্ ডিউটি। থানার চার্জে রয়েছে মেজবাবু। লবঙ্গ— কেশবদের দল, মায় বরের বেশে চঞ্চলও এসেছে থানায়। লবঙ্গ বলে,

— ওই কিরণবাবুই আমার মেয়েকে অপহরণ করেছে। এসব ওরই কাজ। আজ বিকাল থেকে আমার মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। চঞ্চল বলে,

— আজ ওর আমার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা।

মেজবাবুও চেনে চঞ্চলকে। তার সম্বন্ধে সবই জানে পুলিশ। মেজবাবুও চঞ্চলকে মদের চোরা কারবারের জন্য থানায় এনেছে দু'একবার। মেজবাবু বলে,

— তাই নাকি! তোমার সঙ্গে বিয়ে হতো তার! এবার বুঝেছি কেন সরে পড়েছে মেয়েটা।

কেশব বলে,

— আপনার কোন মতামতের প্রয়োজন নেই। কিরণবাবুর বাড়িতে গিয়ে সার্চ করুন।

· মেজবাবু বলে,

— একজন নামী লোকের বাড়িতে আপনাদের কথামত গিয়ে সার্চ করতে পারবো না। মেয়েটার বয়স কত?

— এবার বি. এ পরীক্ষা দেবে, লবঙ্গ বলে।

— অর্থাৎ সাবালিকা!

মেজবাবুর মন্তব্যে লাফিয়ে ওঠে কেশব। বলে,

— সো হোয়াট! এটা অপহরণ কেস। সেকসন —

মেজবাবু ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে,

— সেইমত ডায়েরী করছি। মিসিং ডায়েরী করে যান। পরে প্রমাণ কিছু পেলে তখন সেইমত ব্যবস্থা নেব।

— আমি কোর্টে যাবো। লবঙ্গ ফুঁসছে।

মেজবাবু বলেন,

— স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন। আমাকে আমার কর্তব্য করতে দিন। দয়া করে এখানে গোলমাল করবেন না।

কেশব বলে,

— ঠিক আছে। আমরা গণ অন্দোলন করে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদ জানাবো।

চঞ্চল বলে,

— আমিই শহরের কোণায় কোণায় খুঁজবো। আর বেরও করবো ঝিলিককে। তারপর যা করার করবো ওই কিরণ ডাক্তারকে।

ওরা শাসিয়ে বের হয়ে যায়।

এদিকে লবঙ্গ তখন খুঁজছে। তার মেয়েই হারিয়ে গেছে। চঞ্চল তখন দলবল নিয়ে শহরের এখানে ওখানে খুজছে। বিনুর মা লবঙ্গের মুখে মাথায় জল দিয়ে ফ্যানটা জোরে খুলে দিয়েছে। কেশব ভাবছে তাদের পার্টির কাজ কর্মের কথা। তখন রাত্রি নেমেছে।

কিরণের ফার্মে তখন মিনতি — মনোজ, প্রতাপ — ঝিলিকের বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ করছে। একেবারে আইন সঙ্গতভাবে তাদের বিয়েও হয়ে গেছে। মিনতি ঘড়ির দিকে চাইল। তখন রাত্রি প্রায় নটা বাজে। ঝিলিককে নতুন কনের বেশে মানিয়েছেও বেশ সুন্দর। মনোজ বলে,

— মাসীমা, নটা বাজে। কিরণ বাড়ি ফেরার আগেই তোমরা বাড়ি চলে যাও। এখনও যেন কিছু টের না পায়। আমি ওদিকের ব্যাপারটাও সেরে ফেলি। তারপর কাল যা হয় করা যাবে।

মিনতিও ভাবছে কথাটা। বলে সে,

— মনোজ, একটা কাজ তো করে ফেললাম। এখন সামলাতে হবে তো! কিরণ, ওই লবঙ্গ সবাই আজ না হোক কাল তো জানতে পারবে। তখন কি হবে!

মনোজ বলে,

— তারজন্য ভেবেচিন্তে যা হয় করা যাবে। এখন বাড়ি ফিরে যাও।

কিরণ তার মিটিং — কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরেছে। পথে এর মধ্যে সে খবরও পেয়েছে যে লবঙ্গলতিকার মেয়ের বিয়ের কথা ছিল আজ। আর আজই মেয়েটা পালিয়েছে। কিরণ বলে,

— পালাবে না! যেমন মা তার তেমন ছা! দ্যাখো গে কোথায় লাভ টাভ করে গৃহত্যাগ

করেছে।

কিরণ বাড়ি ফিরে দেখে সবই চলছে স্বাভাবিক নিয়মে। প্রতাপ তার পড়ার ঘরে বইপত্র খুলে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। আর বাবার গাড়ি থামার শব্দে তার পড়ার বেগ আরও বেড়ে যায়। কিরণ একবার নজর দিয়ে খুশী হয়েই ভেতরে চলে গেলেন।

মিনতি দেবীও এর মধ্যে ফার্ম থেকে ফিরেছে। ছেলের জন্য যেন সে পথ চেয়েই ছিল। মিনতি দেবী বলে,

— আয় বাবা!

কিরণ বলে,

— শুনেছ মা, ওই যে মহিলা লবঙ্গলতিকা তার মেয়ের নাকি আজ বিয়ের তারিখ ছিল।

মিনতি দেবী যেন প্রথম শুনেছে কথাটা। বলে,

— তাই নাকি! তা কোথায় বিয়ে হয়েছে রে?

কিরণ বলে,

— ছাই হয়েছে। যেমন মা তেমনি মেয়ে। মেয়েটা নাকি বিয়ের আগেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। কে জানে অন্য কারো সঙ্গে কেটে পড়েছে বোধহয়। ঠিক হয়েছে। এবার মিটিং - এ আমি ওই লবঙ্গের নামেই মেয়ের ওপর টর্চারের পয়েন্টও তুলবো।

মিনতি বলে — বেচারা! নে হাতমুখ ধুয়ে আয় — খাবার দিচ্ছি।

কিরণকে যেন এই ঘটনাতে খুশীই দেখায়। বলে সে,

— ওই মায়ের মেয়েতো! যেখানে যাবে তাদের হাড় মাস জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে। আমি হলে এমন অবাধ্য মেয়েকে খুনই করতাম।

চঞ্চল এবার সতীহারা শিবের মত উন্মাদ হয়ে গেছে। তার হাত থেকে রাজকন্যা — রাজত্ব এমন ফসকে বের হয়ে যাবে, এটা সে ভাবতে পারেনি। চঞ্চল সব খবরই রাখে। তার দলবলও চারিদিকে নজর রাখে। তারাই বলে,

— মেয়েটার সঙ্গে ওই ব্যাটা ডাক্তারের ছেলের বেশ ইয়ে টিয়ে ব্যাপারই ছিল গুরু! দুজনে প্রায় ঘুরতো এদিক-ওদিক। চঞ্চলেরও এবার কথাটা মনে পড়ে। তখন অনেক রাত। এতক্ষণ খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত তারা। চঞ্চল বলে,

— দেখছিস আমি হন্যে হয়ে খুঁজছি! কোথায় যেতে পারে মেয়েটা মাথায় কিছুই আসছে না। তোরা মজা দেখছিস?

এবার ন্যাপা বলে,

— গুরু, ওই দুজনকে মাঝে মাঝে কিরণ ডাক্তারের ফার্ম বাড়িতেও দেখেছি।

চঞ্চলের মনে হয় তাহলে ঝিলিক ডাক্তারের ছেলের সঙ্গে ওই নির্জন ফার্ম হাউসেও যেতে পারে। ওখানেই হানা দেবে তারা। চঞ্চল বলে,

— তোরা তৈরী হয়ে আয়। মাল পত্র — বোমা সঙ্গে নে। আজ ভোরেই ওই ফার্মে হানা দেব। মেয়েটা নির্ঘাৎ ওখানেই আছে। ওখান থেকে তুলে আনবো মেয়েটাকে।

ন্যাপা বলে,

— দারুণ হবে। লগ্ন না থাক, গুরুর বিয়েটা কালই দেব আমরা। তুমি ভেবনা গুরু। আমরা ভোরেই রেডি হয়ে আসছি। মেয়েটাকে ঠিক ওখানেই পাবো। চঞ্চল ফুঁসছে। বলে,

— আর ডাক্তারের ব্যাটাকেও ফুটিয়ে দেব।

রাত নামছে। চঞ্চল এখনও আশা ছাড়েনি। তার মনে হয় মেয়েটা বেশী দূর যেতে পারেনি। কালই তুলে আনবে ঝিলিককে। আর বিয়েও কালই হবে।

স্তব্ধরাত্রি। ওদিকে মনোজও বসে নেই। সেও জানে চঞ্চল একটা কিছু করবেই। তার আগেই ওর ব্যবস্থা করতে হবে। মনোজবাবুর সেই চ্যালা গুপীনাথ সিটকে চোর হলেও কাজের লোক। চঞ্চল সম্বন্ধে সে কিছু গোপন খবর দিয়েছিল। চঞ্চল তার ড্রাগের ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে ইদানীং আরও নানা রকম ব্যবসাতে নেমেছে। বিহার — অন্যান্য দেশ থেকে সে এখন অতি আধুনিক অস্ত্র আমদানী করে ভালো ব্যবসা করছে। কিছুদিন আগেই বেশ বড় একটা চালান তার এসেছে। তার গুদামের একদিকে মাটির তলায় গোপন গর্ত করে চঞ্চল তার বহুদামী মাল মজুত রাখে।

সেই রাতেই মনোজ দারোগা পুলিশবাহিনী নিয়ে ওই গুদামে হানা দিয়ে সেই গোপন গর্ত থেকে বহু টাকার দামী বিদেশী অস্ত্র, প্রচুর হিরোইনও উদ্ধার করে আনে। চঞ্চল যে গোপনে এসব কাজ করতো তা পুলিশও এতদিন হাতে নাতে ধরতে পারেনি। আজ মনোজদারোগা এই রেড করে নিজেই চঞ্চলের কাজের বিস্তৃতি দেখে চমকে ওঠে। অনেক বিচ্ছিন্নতাবাদী দলের সঙ্গে ওর নিশ্চয়ই যোগাযোগ আছে। এবার সেইসব রহস্যই ভেদ করতে হবে।

চঞ্চল তখনও তার বাড়িতে। এর মধ্যে তার দু'একজন চ্যালাও রিভলবার — বোমা নিয়ে রেডি হয়ে এসেছে ওই ফার্মে রেড করার জন্য। এমন সময় পুলিশ ফোর্স তাদের ঘিরে ফেলে। হঠাৎ পুলিশের গাড়ির শব্দে ওরা চমকে ওঠে। একজন বলে,

— পুলিশের গাড়ি!

ওরা ভাবতেই পারেনি যে পুলিশ এর মধ্যে তাদের ওই গোপনতম ব্যবসার খবর জেনে গিয়ে রেড করে সব মালই বের করে ফেলবে।

মনোজও করিতকর্মা লোক। তার ফোর্সও চঞ্চলকে বাড়িতে ঘিরে ফেলেছে। দরজা খোলা পেতে মনোজ দারোগা দলবল নিয়ে উদ্যত রিভলবার সমেত ঘরে ঢুকে বলেন,

— হাত উপরে তোল। হ্যান্ডস্ আপ্! কেউ নড়বে না। নড়লেই গুলি চলবে।

ওরা তৈরী ছিল না। এবার ধরাই পড়ে যায়।

চঞ্চলও শুধোয়,

— আমাদের অ্যারেস্ট করছেন কেন?

মনোজ বলেন,

— থানায় চলো। সব জানতে পারবে।

পুলিশ বাহিনীর আক্রমণে পাড়ার লোকজনও জেগে ওঠে। চঞ্চলের মা গলা তুলে চীৎকার করে,

— আমার ছেলেকে এতরাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? দ্যাশে কি আইন নেই!

মনোজ দারোগা বলেন,

— মাসীমা, আইন আছে বলেই ওদের ধরে নিয়ে যাচ্ছি। আপনার ছেলে কিসের ব্যবসা করে পরে জানবেন।

ওদের থানায় আনতে এবার চঞ্চলও চমকে ওঠে। তার সেই কয়েকলাখ টাকার বিদেশী অস্ত্র গোলা গুলি বিদেশী মাল সবই হাতে পেয়ে গেছে পুলিশ। এবার তাকে এমন সব চার্জে ফেলেছে যে এবার আর পুলিশের জাল কেটে বের হতে পারবে না।

মনোজ বলেন,

— কি চঞ্চল, বিয়ের পর লোকে শ্বশুর বাড়ি যায়। তুমি দেখছি এবার বিয়ের আগেই এসে হাজির হলে শ্বশুরবাড়িতে। তবে সুপাত্রই খুঁজে পেয়েছিল লবঙ্গলতিকা দেবী।

চঞ্চলও বুঝেছে, এতদিন নানা কৌশলে পুলিশের জাল কেটে বের হয়েছিল। এবার তার কীর্তিকলাপ ওই দুঁদে পুলিশ অফিসের হাতে নাতে ধরে ফেলেছে। এবার আর তার রেহাই নেই।

সকালেই খবরটা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। চঞ্চলকে পুলিশ ওসব মালপত্র সমেত হাতেনাতে ধরেছে। এতদিন ধরে শহরে সে রাজ্যপাট চালিয়ে এসেছিল। তার আসল পরিচয় পেয়ে এবার শহরের মানুষও চমকে উঠেছে। তারা খুশী হয় অফিসারের কাজে।

খবরটা লবঙ্গও শোনেন। কেশববাবুও এসেছে। লবঙ্গ তখন ফুঁসছে।

— এসব ওই কিরণ ডাক্তারের ষড়যন্ত্র। ইচ্ছাকরে নির্দোষ চঞ্চলকে অ্যারেস্ট করেছে। যাতে আমার ক্যাম্পেন ব্যাহত হয়। আমার মেয়েকে অপহরণ করবে — আমার লোককে

জেলে পুরবে? আজ আমিই কোর্টে গিয়ে মামলা করছি। আর চঞ্চলের জামিনের ব্যবস্থা করছি। ওই কিরণ ডাক্তারের এসব ষড়যন্ত্র।

কেশব এরমধ্যে সব খবরই পেয়েছে। থানাতেও গেছিল সে। যা শুনেছে তাতে কেশবেরও মনে হয়েছে, চঞ্চল খুবই অন্যায় কাজ করেছে। ও যে এত বড় সাংঘাতিক কাজ করতো তাও জানতো না কেশব। তাই লবঙ্গকে বলে,

— চঞ্চলের কেস নিয়ে তুমি মাঠে নেব না লবঙ্গ। ও যা করেছে তা খুবই অন্যায় কাজ। আর পুলিশ ওসব মাল সমেত হাতে নাতে ধরেছে চঞ্চলদের। ওদের হয়ে কিছু করতে গেলে পাবলিক তোমার উপর চটে যাবে। চঞ্চল একজন সত্যিকারের স্মাগলার - ক্রিমিন্যাল -- দেশের শত্রু।

এবার লবঙ্গও চটে যায় — তাই নাকি! পুলিশ এসবের প্রমাণ পেয়েছে?

— হ্যাঁ। বহু মালই পেয়েছে ওর ঘর থেকে। মায় বেআইনী ড্রাগস্।

কেশবের কথায় লবঙ্গ বলে,

— তাই ওই কি ঝিলিককে সরিয়ে দিয়েছে?

— তা জানা যাচ্ছে না। তবে কেসটা খুবই গোলমেলে তা জেনেছি।

লবঙ্গ বলে,

কিন্তু কোথায় গেল ঝিলিক! চঞ্চল যদি কিছু না করে থাকে তবে কে করলো?

কেশব বুঝেছে চঞ্চলের ব্যাপারটাকে ফেলে দিয়ে এবার ইলেকশনের ব্যাপরটাকেই ধরে রাখতে হবে। বলে কেশব,

— লবঙ্গ! তোমার ইলেকশনে এই-ই হবে ইস্যু। দেশ সেবা করার জন্য ভোটে দাঁড়িয়েছ। ওই প্রতারক ষড়যন্ত্র করে মায়ের বুক থেকে তার সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে। মা তবু দেশ সেবার কাজ ছাড়েনি। সারা দেশের মানুষ তার সন্তান। তাই এসেছে সে ভোটের জন্য!

লবঙ্গ ভাবছে কথাটা। তবু বলে,

— ওসব তো করবোই। তবু একবার ডি. এম সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আমার মেয়েকে খোঁজার কাজ যাতে পুলিশ আরও গুরুত্ব দিয়ে করে তাই দেখতে হবে।

রাতারাতি জেলার কর্তৃপক্ষের কাছে মনোজ দারোগার গুরুত্ব বেড়ে গেছে। দেশের মধ্যে এমন একটা দেশদ্রোহিতার কাজ চলছিল সেটা মনোজ ধরেছে। স্বয়ং ডি. এম সাহেবই মনোজবাবুকে ডেকে পাঠান। এবার তদন্তের সূত্র ধরে ওই গ্যাংকে ধরতেই হবে। চঞ্চলকে চাপ দিতে হবে। আর মনোজ দারোগাই ডি. এমকে বলেন,

— স্যার, চঞ্চল আর কিছুদিন হলে আরও বড় সর্বনাশ করতো একটা মেয়ের।

— মানে!

এবার মনোজই বলে ঝিলিকের সঙ্গে বিয়ের কথা। ডি. এম শুনে চটে ওঠেন,

— সেকি! তা ওই শয়তান বিয়ে করেছে নাকি মেয়েটাকে? আর লবঙ্গলতিকা একজন উকিল হয়ে এই জালে পা দিয়েছিলেন? স্ট্রেঞ্জ!

মনোজ বলে,

— না স্যার। মেয়েটাও সাবালিকা। আমি চঞ্চলেব সম্বন্ধে সব খবর পেয়ে মেয়েটাকে ওর হাত থেকে উদ্ধার করে ওই কিরণ ডাক্তারের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি। কিরণবাবুর মা ওসব শুনে তার নাতির সঙ্গে নিজে বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেটা মেডিক্যাল কলেজে পড়ে।

ডি. এম সাহবে বলেন,

— খুব ভাল কাজ করেছেন মিঃ রায়। সত্যিকারের পুলিশ অফিসার যে, সমাজের অনেক কল্যাণমূলক কাজ করতে পারে, আপনি তা দেখিয়েছেন।

মনোজ বলে,

— কিন্তু লবঙ্গলতিকা দেবী হয়তো এটাকে মেনে নিতে পারবে না। ভয়ানক জেদী মহিলা। উনি হয়তো কোর্টকাছারি করবেন।

ডি. এম সাহবে বলেন,

— ছেলে- মেয়ে দুজনেই এডাল্ট। তারা কোন অন্যায় কাজ করেনি! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আর দেখবেন ওই স্মাগলাররা যাতে কোন অবস্থাতে ছাড়া না পায়। সাবধানে চার্জসীট দেবেন। বেস্ট অব্ লাক্।

মনোজবাবু এবার নিশ্চিন্ত হয়ে বের হয়ে আসে সাহেবদের স্যালুট করে। একটা দিক সামলানো গেছে। কিন্তু কিরণকে সামলানো যাবে কি করে তাই ভাবছে এবার।

ফার্ম হাউসে এসেছে ঝিলিক। প্রতাপ তখন কলেজে। মনোজও এসে পড়ে। ঝিলিক নতুন পরিবেশে ভালোই আছে। ঠাকুমাও শুধোয়।

— কি দিদি। এখন ভাবছ এ কোন বিয়ে দিল ঠাকুমা! বাসর জাগা হল না — এবার ফুলশয্যা হবে কিনা কে জানে!

ঝিলিক বলে,

— সে আপনিই জানেন। আপনার ফুলশয্যা হয়েছিল তো ঠাক্‌মা!

মিনতিদেবীর মনে পড়ে হারানো সেই অতীত দিনের কথা। মেয়েদের জীবনে একবারই আসে ওই রাত। কত দিন কেটে গেছে। মিনতির মনে পড়ে সেই রাতের কথা। বলে সে,

— হয়নি আবার! তোমারও হবে। আর তোমার ঠাকুরদা ছিল নিরীহ। আমার নাতি কেমন হবে কে জানে! তোমার ফুলশয্যার ব্যবস্থা করবোই।

মনোজ এসে পড়ে। মিনতি দেবী বলে,

— মনোজ, ঝিলিককে এবার ও বাড়িতে নিয়ে যাবো।

মনোজ চমকে ওঠে।

— সেকি মাসীমা! ওদিকে কিরণতো লবঙ্গের নাম শুনলে বন্দুক বের করে বসবে। যদি ওর মেয়েকেই গুলি করে বসে, শেষে একটা বিপদ হবে।

মিনতি বলে,

— সেসব হবে না। ওর বন্দুক আমি আলমারীতে সরিয়ে দিয়েছি। আর এসব তো একদিন জানবেই। তাই বলছি যা হবার আগেই হয়ে যাক্। আমি ঠিক করেছি আজ বিকালেই ঝিলিককে ঘরে নিয়ে যাবো। ঘরের বউ হয়ে এই মাঝ মাঠে পড়ে থাকবে? তুমি বিকালে একবার এসো। তোমার কথাতো কিরণ শোনে। তাকে বোঝাতে হবে। ঝিলিক এখন আর লবঙ্গ লতিকার মেয়ে নয়। মুখার্জী বাড়ির বৌ। তারও আইনি অধিকার রয়েছে।

মনোজ বলে,

— আসবো। তবে কি হবে জানিনা মাসীমা।

কিরণ এখন খুশীই। চঞ্চলের দলবল বেশ হৈ চৈ করে লবঙ্গের মিটিং মিছিল করতো। হাওয়া গরম করে দিত। আজ ওদের একটাও মিটিং হয়নি। অনেকে বলছে মেয়েকে হারিয়ে লবঙ্গ লতিকা নাকি ভেঙে পড়েছে। তারপর চঞ্চলকে পুলিশ এ্যারেস্ট করে লবঙ্গের যুদ্ধের সেনাপতিকেই শেষ করেছে। কিরণও মনোজের ওপর খুব খুশী। এর মধ্যে ফোনও করেছে কিরণ।

— এতদিনে একটা কাজের মত কাজ করেছ মনোজ। তার মেয়েটাও নাকি হারিয়ে গেছে! এবার মিটিং-এ ওকে যা তুলোধনা করবো — একটা ভোটও পাবেনা তোমাদের লবঙ্গ। আমাকে টেক্কা দেবে ওই লবঙ্গ লতিকা!

কিরণ মিটিং - এ বের হবার জন্য তৈরী হচ্ছে। এর মধ্যে ভাষণও তৈরী হয়েছে। লবঙ্গের মেয়ে চলে গেল! তাই নিয়ে লবঙ্গকে যেন কাঠগোড়ায় দাঁড় করাবে কিরণ।

এমন সময় মিনতিদেবী আর সঙ্গে ওই ঝিলিক আর প্রতাপ ঢুকে তাকে প্রণাম করতে দেখে অবাক হয় কিরণ। সুন্দর সুশ্রী মেয়ের মুখে চোখে এক অদ্ভুত শ্রী। নতুন কনের মত সেজেছে আর প্রতাপের পরনেও ধুতি পাঞ্জাবী। কিরণ মিনতিকে জিজ্ঞাসা করে,

— কি ব্যাপার মা?

মিনতি বলে — কিরণ, এই তোমার নতুন বৌমা। আমার সাধের নাতবৌ ঝিলিক।

কিরণ প্রথমে খেয়াল করেনি। তখনও মিটিং নিয়ে ভাবছে। তাই বলে,

— তা বেশ! নতুন বৌমা —

এরপরই ব্যাপারটা বুঝে যেন ফায়ার হয়ে গর্জে ওঠে ঘর কাঁপিয়ে,

— হোয়াট! আমার ছেলের বৌ! মানে প্রতাপ বিয়ে করেছে এই মেয়েটাকে? এটা কি ছেলেখেলা? আমি একবারও জানলাম না — মতও দিলাম না, অথচ বিয়ে হয়ে গেল!

তারপরই প্রতাপের দিকে এগিয়ে গিয়ে গর্জে ওঠে,

— এ্যাই রাসকেল!

মিনতি বলে,

— ওর কি দোষ! আমি নিজে ওর বিয়ে দিয়েছি! আর কেন দিয়েছি তাই শোন —

— ওসব কোন কথা শোনার দরকার নেই। আমি এ বিয়ে স্বীকার করছি না। দূর করে দাও ওই মেয়েকে। কার না কার মেয়ে!

মিনতি বলে,

— যে সে ঘরের মেয়ে নয়! শহরের নামী উকিল ছিলেন কালীপদবাবু, তাঁরই নাতনি। ওর মা লবঙ্গলতিকা।

এবার কিরণ যেন বোমার মত ফেটে পড়ে।

— হোয়াট! ওই বুলডোজারের মেয়ে আসবে আমার বাড়িতে, আমার ছেলের বৌ হয়ে? নেভার — এ আমি টলারেট করবো না। বিয়ের কনে পালিয়েছে! বাজে মেয়ে —

মিনতি বলে,

— আমিই ওকে এনে ফার্মে রেখে বিয়ে দিয়েছি। ও বাজে মেয়ে নয়। ও এখন এই বাড়ির বৌ।

— এ আমি মানি না। বৌ- ছেলের বৌ! এই রাস্কেল! তোর এত বড় সাহস। পড়াশোনা মাথায় উঠলো — উনি গেলেন কিনা বিয়ে করতে। আমার নাম্বার ওয়ান এনিমির মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করতে! গেট আউট — দুজনেই গেট আউট ফ্রম্ মাই হাউস!

কিরণ গর্জাচ্ছে — এ আমার বাড়ি। এখানে তোমাদের ঠাঁই হবে না। এই মুহূর্তেই প্রতাপ তোমার ওই বৌকে নিয়ে বের হয়ে যাও। যাও —

কাঁদছে ঝিলিক। প্রতাপ কি করবে জানে না। এমনিতে নিরীহ ধরনের ছেলে সে। তাই বলে সে ঠাকুমাকে,

— ঠাকমা!

কিরণ গর্জাচ্ছে।

— ঠাকুমা কি করবে? এ আমার বাড়ি। আই সে গেট আউট!

হঠাৎ এমন সময় বাইরে গাড়িটা এসে থামে। গাড়ি থেকে নেমে আসছে লবঙ্গ লতিকা। রাগে সেও বিশাল দেহকে ফুলিয়ে বিশালতর করে উঠে আসছে হলঘরের দিকে।

লবঙ্গ মেয়ের ব্যাপারে খোঁজ করার জন্য সোজা ডি. এম সাহেবের বাংলোতেই গিয়ে উঠেছিল। টাউন থানার দারোগা যে কিরণের আত্মীয়, আর লবঙ্গের সঙ্গে কিরণের সম্পর্কটার খবর জেনেই হয়তো থানা অফিসার সঠিক তদন্ত করে নি। তাই সে একটা জিপ নিয়ে ডি. এম সাহেবের কাছে গেছে।

ডি. এম সাহেব এর আগে মনোজের কাছে তার মেয়ের ব্যাপারে সবই শুনেছেন। এবার লবঙ্গ এসে ওই থানা অফিসারের বিরুদ্ধে নালিশ করে — ওরা যে তার মেয়ের অপহরণের কেসটা দেখবে না এই অভিযোগ করে। ডি এম সাহেব বলেন,

— আরে আপনার মেয়েকে একটা হার্ডকোর ক্রিমিন্যালের হাতে তুলে দিতে গেছিলেন! তার মানে আপনিও ওই চঞ্চলের ওইসব কাজের ব্যাপারে জড়িত! নাহলে একজন মা হয়ে কেন এসব করতে গেছিলেন! আপনার নিশ্চয়ই কোন স্বার্থ ছিল।

লবঙ্গলতিকা এবার ঘামছে। কথাটা যে স্বয়ং ডি. এম সাহেব তাকে বলবেন তা ভাবেনি। লবঙ্গ বলে,

— চঞ্চলের এসব ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না।

— অর্থাৎ না জেনে শুনে আপনি আপনার মেয়ের চরম সর্বনাশ করতে গেছিলেন. কিন্তু আপনার মেয়ে সেটা জেনে নিজেকে বাঁচাবার জন্যই বের হয়ে গেছিল। আর ওই পুলিশ অফিসারই তাকে উদ্ধার করে আপনার মেয়েকে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

— মানে! এবার চমকে ওঠে লবঙ্গ — আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে? কোথায়?

ডি. এম সাহেব বলেন,

— শহরের নামী ডাক্তার কিরণবাবুর একমাত্র ছেলের সঙ্গে। ছেলেটাও ডাক্তারী পড়ছে।

লবঙ্গের সামনে যেন মাটি দু ফাঁক হয়ে গেছে। আর সেই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে লবঙ্গের ভারি দেহটা যেন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। তার বুকের ভিতর তখন যেন টর্নেডোর ঝড় চলছে। আর রক্তে জেগেছে খুনের নেশা। সে হাতের কাছে কিরণ আর তার ছেলেকে পেলে দুজনকেই খুন করতো। অস্ফুট স্বরে লবঙ্গ বলে,

— বিয়ে হয়ে গেছে ওই ডাক্তারের ছেলের সঙ্গে!

তারপর চীৎকার করে ওঠে,

— এসব কনস্ পিরেসি। আমাকে শায়েস্তা করতে চায়। এসব ওই ডাক্তারের ষড়যন্ত্র। ইট ইজ সিরিয়াস এ চিটিং কেস। কেস আন্ডার সেকসন্ ফোর টোয়েন্টি। ডি. এম সাহেব

লবঙ্গকে মাঝে মাঝে এজলাসে এমন হাত পা নেড়ে চীৎকার করতে শুনেছে। এখানেও তাই করতে দেখে বলেন,

— এটা এজলাস নয়। আমার বাংলো। যা ঘটেছে তাই বললাম। এখন ওখানে গিয়ে মেয়ে জামাইকে আশীর্বাদ করুন গে ম্যাডাম। চলি — আমাকে একটা ইনস্পেকশনে যেতে হবে।

ডি. এম সাহবে ওকে ফেলে রেখে তার গাড়িতে উঠে বের হয়ে গেলেন।

লবঙ্গ খবরটা পেয়ে কি করবে জানে না। কেশব তার সঙ্গে নেই। লবঙ্গ অবশ্য একাই একশো। এবার সে ওখান থেকেই গাড়ি নিয়ে সোজা চলে এসেছে কিরণের বাড়িতে।

কিরণ তখন গলা তুলে ছেলে বউকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবার জন্য চীৎকার করছে। মিনতিও তৈরী। এবার সেও ছেলেকে তার মুখের মত জবাব দেয়। মিনতি বলে,

— কাকে গেট আউট করছিস কিরণ? এ বাড়ি, বিষয়-আশয়, ফার্ম সব আমার। আমার সম্পত্তি। গেট আউট হতে হয় তুই হবি। আমার ঘরের থেকে তোর ওই চেম্বার - ডাক্তারখানা, ওই ভোটের অফিস সব তুলে নে যা। ওদিকে পথের ধারে তাঁবু খাটিয়ে ওখানেই থাকবি। এ বাড়িতে নয়। এ বাড়ি আমার। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে — এখন সবকিছু মানিয়ে নেবে তা নয়, ফুঁসছে — যা তুই নিজে গেট আউট হ। তা নয় উনি গেট আউট করছে প্রতাপ - ঝিলিককে!

কিরণ মায়ের কথায় এবার ঘাবড়ে যায়। কথাটা সত্যি!

এমন সময় বাড়ির মধ্যে লবঙ্গ ঢুকে সামনে ঝিলিককে নববধূর বেশে দেখে যেন ক্ষেপে ওঠে। তার সেই মেয়েটা আজ মাথায় সিঁদুর বেনারসী শাড়ি পরে যেন একেবারে পর হয়ে গেছে। আর তাকে পর করেছে তাদের চিরশত্রু ওই কিরণ।

লবঙ্গ গর্জে ওঠে,

— ওমা! ঝিলিক তুই এখানে! ওই শয়তানটা আমার মেয়েকে অপহরণ করে এনে জোর করে বিয়ে দিয়েছে! নেভার! এসব আমি টলারেট করবো না। ওসব শাখা ভেঙে সিঁদুর মুছে চলে আয় আমার সঙ্গে। জোর করে আমার মেয়ের সর্বনাশ করতে আমি দেব না। চলে আয়।

লবঙ্গও বিশাল দেহ নিয়ে এবার যেন তার মেয়েকে দখল করে নিতে চায়। মিনতিও ওই বিশালদেহী লবঙ্গের রূপ দেখে ঘাবড়ে গেছে। ও যে এমনভাবে বাড়িতে এসে চড়াও হবে তা ভাবতে পারেনি। কিরণও। মিনতিও ভীত ত্রস্ত হয়ে বলে,

— ওরে কিরণ, ওই বুলডোজার এসে তোর বাড়ি থেকে তোর ঘরের বৌকে ছিনিয়ে

নিয়ে যাবে আর তাই দেখবি চুপ করে!

ঝিলিকও তখন মাকে ওইভাবে আসতে দেখে ঘাবড়ে গেছে। এবার কিরণের সম্মানে লাগে। তার বাড়ি চড়াও হয়ে এসে বাড়ির বৌকে নিয়ে যাবে লবঙ্গ, এটা হতে দেবে না কিরণ। লবঙ্গকে বাধা দিতে হবে পদে পদে। কিরণও তার কর্তব্য স্থির করে ফেলে গর্জে ওঠে,

— খবরদার আমার বাড়িতে এসে ঝামেলা করবেন না। ও এখন আমাদের বাড়ির বৌ-

লবঙ্গও ফুঁসলে ওঠে,

— এ বিয়ে আমি মানি না। চলে আয় ঝিলিক।

ঝিলিক এবার কঠিন স্বরে বলে,

— তুমি মানো না, আমি মানি। তুমি তো আমার জীবনকে বরবাদ করার জন্য, আর নিজের স্বার্থে একটা দাগী ক্রিমিন্যাল স্মাগলারের হাতে তুলে দিতে গেছিলে! এরা আমাকে তুলে এনে বাঁচিয়েছেন। এদের ঘরের বৌ-এর সম্মান দিয়েছেন। এই আমার স্বামী। এই আমার শ্বশুর। এই আমার ঠাক্‌মা। আমি এখানেই থাকবো! তোমার ঘরে নয়। লবঙ্গ গর্জে ওঠে,

— মুখ ভেঙে দেব।

— ফুঁসে ওঠে কিরণও, গায়ে হাত দিলে গুলি করে দেব। বিনু — এ্যাই বিনু আমার বন্দুক আন। আজ মার্ডারই করে দেব। আমার ঘর থেকে আমার বউমাকে নিয়ে যাবে? গুলিসে উড়া দেগা। লাও বন্দুক —

এমন সময় এসে পড়ে মনোজ। সে বাইরে লবঙ্গের গাড়িটাকে দেখেছে। আর ভিতরে ওইসব হৈ চৈ শুনে বলে,

— কি হচ্ছে কিরণ! এতে গুলিগোলা চালাবার কথা উঠছে কেন?

লবঙ্গ লতিকা এবার গর্জে ওঠে,

— আমি কেস করবো। আমার মেয়েকে জোর করে বিয়ে দেবে?

মনোজ বলে — ম্যাডাম। আপনিই তো বাড়ি চড়াও হয়ে এসে এখন ঝামেলা করছেন। শান্তি ভঙ্গের দায়ে আমি এক্ষুনি আপনাকে এ্যারেস্ট করতে পারি তা জানেন? আপনিই তো আইনভঙ্গ করছেন —

কিরণ বলে,

— তাই করো। অ্যারেস্ট করে হাজেত নিয়ে যাও। আমার বাড়িতে ঢুকে আমাকে অপমান করবে!

ঝিলিক বলে — মা তুমি যাও।

লবঙ্গ বলে — যাচ্ছি। এবার কোর্টেই দেখা হবে। আইন দিয়েই এর জবাব দেব।

কিরণ বলে — তাই হবে। আমিও হাইকোর্ট যাবো। দরকার হলে সুপ্রিম কোর্ট যাবো। আমাকে কোর্ট দেখাবেন না। যা পারবেন করে নেবেন।

লবঙ্গও জবাব দেয়,

— ঝিলিক, এটা ভালো কাজ করলি না! কোর্টেই যাচ্ছি। কোর্টেই এর বিচার হবে।

বের হয়ে যায় লবঙ্গ অসহায় রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে। এবার বাড়িতে শান্তি নামে, একটা প্রচন্ড কান্ডের পর। মনোজও দেখেছে ব্যাপারটা। মিনতি বলে — ঠিক করেছিস কিরণ, ওকে উচিত জবাবই দিয়েছিস। কিরণ তখন যুদ্ধ জয়ের উল্লাসে উল্লাসিত। লবঙ্গ সেদিন ওর বাড়ির সামনে আবীর মেখে নৃত্য করেছিল। আজ কিরণ তার মেয়েকে এ বাড়িতে পেয়েছে। লবঙ্গের একটা বড় সম্পদকে সে ছিনিয়ে নিতে পেরেছে। এটা যেন তার জয়ই। কিরণ বলে,

— মা, কাজটা তুমি ভালোই করেছ। ওর ঘর থেকে ওর মেয়েকেই এনেছো ওর অমতে। ভেরি গুড।

মনোজ বলে — তাহলে ঝিলিককে বৌমা বলে স্বীকার করছ তো?

কিরণ কথাটাকে খুব খুশী হয়না। তবু বলে,

— তা স্বীকার করছি। আইনত ও আমার ছেলের বৌ। কিন্তু মা, আমার একটা শর্ত আছে। সেটা মেনে নিলে তবেই পুরোপুরি ওকে মেনে নিতে পারবো।

মিনতি দেবী চায় বাড়িতে শান্তি আসুক। বলে,

— ঝিলিকের মা তো শাসিয়ে গেল। ওর সঙ্গে তো শত্রুতা বাড়ালি! এখন ঘরে শান্তি আন বাবা। যা হয়েছে সেটাকে মেনে নে, ঝিলিকের দিকে চেয়ে।

মনোজ পুলিশের লোক। চোর — ক্রিমিন্যালদের শায়েস্তা করে সে। মনস্তাত্তিক দিকটা থেকেই সে আক্রমণ করে তাদের। তাদের বিশ্বাস অর্জন করলে দাগী আসামীর স্বভাবও বদলানো যায়। কিরণ তার কাছে কোন সমস্যাই নয়। মনোজ বলে,

— মাসীমা, কিরণ তো বলছে ওর শর্ত মানলে ও এসব মেনে নেবে। বাড়িতে শান্তি বজায় থাকবে। কি আছে তোমার শর্তগুলো শোনা যাক্। তার আগে একটু চা হোক।

ঝিলিক বলে — আমি চা করে আনবো?

মনোজ বলে,

— ভেরি গুড। তোমার হাতের চা খেতে খেতেই আমাদের চুক্তিপত্রও সই হয়ে যাবে। মাসীমা আপনি কিন্তু অবজেকশন তুলে ব্যাপারটাকে জটিল করে দেবেন না। যাও ঝিলিক, চা করে আনো।

কিরণ দেখে প্রতাপও চলেছে ঝিলিকের সঙ্গে। এবার কিরণ গম্ভীর কণ্ঠে বলে প্রতা পকে,

— তুমি পড়ার ঘরে যাও। যখন তখন দোতলায় উঠবে না।

প্রতাপ মাথা নীচু করে ওদিকের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

কিরণ অবশ্য মায়ের এই বুদ্ধিতে মনে মনে খুশীই হয়েছে। লবঙ্গ আজ তার বাড়িতে এসেছিল। কিরণ তার মেয়েকে ঘরে রেখে লবঙ্গকে একটা আঘাত করতে পেরে খুশীই হয়েছে। আর ঝিলিককে দেখে কিরণের পছন্দও হয়েছে। মেয়েটা ওই দাগী আসামীর হাতে পড়লে শেষ হয়ে যেত। চঞ্চলকে এখন জেলেই যেতে হবে। প্রতাপ — ঝিলিককে সেই সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়েছে। তবে কিরণের দুঃখ তাকে আগে এসব কথা মা জানায়নি।

মনোজ বলে,

— জানলে তুমি মত দিতে না ভায়া। তাই জানানো হয়নি। আর ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল — তুমিও ভোট নিয়ে ব্যস্ত ছিলে, তাই এটা সেরে নিতে হয়েছে। ওদের বিয়ে না হলে আজ লবঙ্গের অভিযোগে ওর মেয়েকে অপহরণ করার দায়ে তোমাকে এ্যারেস্ট করতে হত। সেটাকে লবঙ্গের জয় হতো।

কিরণও ব্যাপারটা বুঝে বলে,

— না। ঠিকই করেছ। তবে কি জানো? প্রতাপের এখন মন দিয়ে পড়ার দরকার। দুটো বছর কোন দিক নজর দেওয়া যাবে না। এখন শুধু পড়া আর ক্লাশ করা। নতুন বৌ পেয়ে যদি পড়ার ডিসটার্ব হয়, তাই আমার আপত্তি। সেইজন্য আমি চাই প্রতাপ এখন বাড়িতে নয়, কলেজ হোস্টেলেই থাকবে। ওখানে ঠিক পড়াশোনা করবে।

মিনতি বলে,

— সে কি রে! একমাত্র ছেলে — কাছেই বাড়ি। তবু সে থাকবে হোস্টেলে!

— ইয়েস। ওকে হোস্টেলেই থাকতে হবে। এটা আমার প্রথম এবং প্রধান শর্ত। ছুটি ছাটার দিন সকালে বাড়িতে আসবে। থাকবে দিনভোর। সন্ধ্যার আগেই ফিরে যাবে হোস্টেলে। বৌ - এর সঙ্গে নো কানেকশন।

মিনতি বলে, ওমা! স্বামী — স্ত্রী বলে কথা। তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকবে না? একি রকম শর্ত রে তোর?

কিরণ বলে,

— যতদিন না প্রতাপের ফাইনাল এম বি বি এস পরীক্ষা হচ্ছে, ততদিন নো কানেকশন — নো মিটিং। দুজনের কেউ কাউকে চিনবে না। এই আমার শর্ত। মানতে পারলে আমি রাজী। নাহলে নট্। তারজন্য গৃহত্যাগ করতে হয় আমি করবো। ওই মাঠে তাবু খাটিয়েই

ডাক্তারী করবো, এবাড়িতে নয়।

মনোজ বলে,

— মাসীমা, কিরণ ঠিকই বলছে। প্রতাপের এখন পড়ার সময়। কেরিয়ার বিল্ড করার সময়। এখন তাকে সবকিছু ত্যাগ করে মনদিয়ে পড়াশোনাই করতে হবে।

কিরণ বলে,

— তাই বল তোমার মাসীমাকে। আর নাতবৌ থাকবে তোমার জিম্মায়। প্রতাপ পড়াশোনা শেষ করে সংসারী হবে। তার আগে নয়। কি মনোজ অন্যায় বলেছি?

মনোজও পুরোপুরি সায় দেয়,

— না, ঠিকই বলেছ। একথা আমিও মানছি। মাসীমা, আপনি প্রতাপের ভালো তো চান? আপনিও চান যে ভালোভাবে পাশ করুক। বাবার মত বড় ডাক্তার হোক।

মিনতি বলে,

— তা তো চাই বাবা!

— তাহলে আর অমত করবেন না। এ সময় ওর বিয়ে দেওয়াই উচিত হয়নি। তবে কাজটা যখন হয়ে গেছে, তখন এটাও মেনে নিন। প্রতাপকেও তা মানতে হবে।

মিনতি বলে,

— তা ঠিক আছে। তবে ফুলশয্যা হবে না? ওদের বিয়েতে তো কিছুই করতে পারলাম না —

কিরণ বলে,

— কালই শুভকাজ সন্ধ্যায়। যা দরকার বলো উৎসবের আয়োজনের কোন ত্রুটি হবে না। তবে আমার শর্ত মানতে হবে।

মনোজও বলে,

— তাই হবে। তবে কাল বেশী রাত অবধি আমি থাকতে পারবো না কিরণ। শহরে ইদানীং বেশ কয়েকটা চুরি বেড়েছে। আমাকে ফোর্স নিয়ে রাতে টহল দিতে হবে।

কিরণ বলে,

— আরে সন্ধ্যায় খেয়ে যাবে তো! তারপর রাতে চোর ডাকাতের পিছনে ঘোরোগে। হ্যাঁ লবঙ্গদেবীকেও নিমন্ত্রণটা করে এসো। হাজার হোক, তার মেয়ের বৌভাত।

মনোজ বলে,

বেয়ানের জন্য তোমার দরদ বেড়ে গেছে দেখছি —

কিরণ বলে,

না - না ওর মেয়েকে ঘরে এনেছি, এবার ভোটে ওকে হারাবোই। ওর হিসাব সব

ঢুকিয়ে দিতে হবে।

প্রতাপ পাশের ঘরে বসে সব শুনছে। বেশ বুঝেছে, বাবা তাকে আর ঢুকতেই দেবে না।

একদিনের মধ্যে কিরণ উৎসবের আয়োজন করে ফেলেছে। শহরের নামী দামী লোকেরা জেনে গেছে তার ছেলের বিয়ের কথা। সারা বাড়িটা আলোয় সেজে উঠেছে। লবঙ্গকেও নিমন্ত্রণ করেছে এরা।

লবঙ্গলতিকার তখন ছত্রভঙ্গ অবস্থা। তার মেয়েকেই যে ওই কিরণ ডাক্তার এইভাবে তুলে নিয়ে গিয়ে তার ছেলের বৌ বানিয়ে মহোৎসব করবে তা ভাবতেও পারেনি সে। লবঙ্গের পরিচিত দু চারজন উকিল সৌরিনবাবু — মনতোষ বাবুরা বলেন,

— লবঙ্গ, এতো খুব সুসংবাদ। কিরণবাবুর ছেলেও ডাক্তারী পড়ছে। ভালো ছেলে। সত্যিই সুপাত্র পেয়েছ।

লবঙ্গ জানে ওদেরও বৌভাতে নিমন্ত্রণ আছে। ওরা কিরণের বন্ধু। লবঙ্গ ওদের কথায় বলে,

— আরে কিরণবাবু — ওটা একটা মিছরির ছুরি। ডেঞ্জারাস লোক। সৌরিনবাবু বলে,

— এখন তো তোমার আত্মীয়। আজ যাচ্ছো তো ওর বাড়িতে। লবঙ্গ বলে — দেখি।

ওর বুকে তখন আগুন জলছে। মেয়েটাও বেইমান। জেনে শুনে তার শত্রুপক্ষের ঘরের বৌ হয়ে গেল, প্রেম করে। দুনিয়ার উপর লবঙ্গের যেন অবিশ্বাস এসে গেছে। চঞ্চলও নেই। তার দলবল সমেত জেলে। তবু কেশববাবু যেন একাই একশো। বলে কেশব,

— ভেঙে পড়োনা লবঙ্গ। এম এল এ ভোটে জয়ী হয়ে ওই কিরণকে এবার জবাব দিতে হবে। আমি এবার ক্যাম্পেন জোরদার করছি।

বৌভাতের সন্ধ্যায় কিরণ বাড়ীতে ব্যস্ত। তখন লবঙ্গ আরও বেশী করে মিটিং করতে শুরু করে। আর এবার জনতাকে জানায় ওই কিরণ, মায়ের বুক থেকে তার সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়েছে — ও অমানুষ।

কিরণের বাড়িতে তখন বৌভাতের উৎসব চলছে। আজ কিরণ তার পুত্রবধুকে সকলের সঙ্গে পরিচিত করাতে চায়। ঝিলিককে মিনতিও ভালবাসে। একদিনেই এসে পড়েছে এ বাড়ির জামাই বিজিত আর প্রতাপের দিদি করুণা, তাদের ঘাটশিলার কোয়ার্টার থেকে। মল্লিকাও এসে এবাড়ির উৎসবে ভার নিয়েছে। করুণা নিজে সাজিয়েছে ঝিলিককে। ঝিলিককে যেন সত্যিই রানীর মত দেখাচ্ছে। লোকজনের কলরব অতিথিদের আনাগোনা

— মেয়েদের হাসির সুর মিশছে সানাই এর সুরে। ওদিকে প্যান্ডেলে অতিথিদের ভুরি ভোজের আয়োজন হয়েছে। কিরণ একদিনেই সব আয়োজন করেছে। শহরের বহু নামী দামী লোকই এসেছে।

মনোজ ভেবেছিল লবঙ্গ লতিকা মেয়েকে আশীর্বাদ করতে আসবে। কিন্তু দেখেছে সে আসেনি। মনোজ বলে,

— কিরণ, তোমার সেই বুলডোজার রোলার তো এল না!

কিরণ বলে,

— ওর কথা ছাড়ো তো। যা ঘা দিয়েছি, এবার শেষ ঘা দেব ভোটে হারিয়ে। তখন দেখবে মাথা নীচু করে আসবে।

রাত হয়েছে। উৎসবের কলরব থেমেছে। মনোজ বলে,

— কিরণ, এবার চলি ভায়া। শহরে যা ক্রাইম হচ্ছে, রাতে টহল দিতে বের হতে হবে। হ্যাঁ, বিয়ে বাড়ি — বাড়িতে সোনা দানা — টাকাকড়িও রয়েছে। রাতে একটু সাবধানে থেকো। আমিও ওয়াচ্ রাখতে বলবো।

মনোজ চলে যায়।

এবার আলো নিভে যায় বাইরের। বেচু, হরিপদ আরও দু একজন লোক রাতে প্যান্ডেলে রয়েছে। রাতের স্তব্ধতা নামে। ওদিকে ফুলশয্যার রাত্রি। ঝিলিক — প্রতাপের জীবনে এতদিন পর আজ এসেছে মিলনের রাত। মিনতিও খুশী। প্রতাপ চলে গেছে তার ঘরে। করুণা সারা ঘরে খাটে ফুল দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে। বিজিতও বলে,

— ভায়া, ফুলের রাজ্যে, ফুলপরীকে নিয়ে এবার স্বপ্নের আকাশে উড়ান দাও।

বিজিতকে করুণাই টেনে নিয়ে যায় পাশের ঘরে। বলে,

— তুমিও কি থাকবে নাকি ওখানেই। গেড়ে বসলে যে-

বিজিত বলে,

— থাকতে তো মন চায়। তা তুমি যে এলাউ করবে না তা জানি। চলি ভায়া — গুড নাইট — ঝিলিক — ভেরি গুড নাইট।

করুণা বিজিতের হাত ধরে টেনে বাইরে এনে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যায়।

একজন প্রতাপ — ঝিলিকের উপর নজর রেখেছিল, সে কিরণ। তার শর্তই ছিল প্রতাপ-ঝিলিকের মধ্যে প্রতাপের ডাক্তারী পাশ না করা অবধি নো কানেকশন। তাই এবার সে তার সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করতে এগিয়ে আসে। কিরণ তৈরী ছিল বন্দুক নিয়ে।

প্রতাপ আজকের দিনটার জন্য অপেক্ষা করছিল। বিজিতরা ওদের ঘরে রেখে চলে যেতে প্রতাপ এবার এগিয়ে গিয়ে ঝিলিককে বুকে টেনে নেয়। ঝিলিকও আজকের

দিনটার জন্য অপেক্ষা করছিল। আজ দুজন - দুজনার কাছাকাছি। আজ তাদের জীবনের মধু চন্দ্রিমা রাত. ঝিলিকও নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করে প্রতাপের বাহু বন্ধনে। হঠাৎ দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ শোনা যায়। কিরণ ডাকছে,

— প্রতাপ, প্রতাপ বের হয়ে এসো।

বাবার হাঁক ডাক শুনে বের হয়ে আসে প্রতাপ।

— কি হয়েছে বাবা?

কিরণ বলে — কিছু হয়নি। তবে সাংঘাতিক কিছু হতে পারে।

কিরণ ডাক্তার হাতে বন্দুক নিয়ে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রতাপ দেখছে বাবাকে। কিরণ ওকে দেখে এগিয়ে আসে। প্রতাপের পরণে দামী ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবী। কিরণ বলে,

— প্রতাপ, শহরে এখন চুরি ডাকাতিও খুব বেড়েছে। বাড়িতে আজ অনুষ্ঠান। অনেক সোনা দানা রয়েছে। বাড়ির নিরাপত্তার কথা তো ভাবতে হবে। চোর - ডাকাত হামলা করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাছাড়া ওই চঞ্চলের দলও হয়তো হামলা করতে পারে। তাই রাত জেগে পাহারা দিতে হবে আমাদের। তুমি বন্দুক নিয়ে বাইরের বারান্দায় পায়চারী করো। এদিক থেকে ওদিক। দোতলা থেকে বাগানের দিকেও নজর রাখবে, যেন কেউ হামলা করতে না পারে। তুমি এদিকটা দেখো — আমি নজর রাখছি। খুব হুঁশিয়ার। নাও — বন্দুকটা রাখো। তুমিতো ভালো বন্দুক চালাতে পারো। দরকার হলে ফায়ার করবে।

প্রতাপও বাবার হুকুম মত কাঁধে বন্দুক নিয়ে ফুলশয্যার রাতে বারান্দায় রাত জেগে পাহারা দিতে থাকে।

বিজিত করুণা ওদের ঘর থেকে দেখছে ফুলশয্যার রাতে প্রতাপ নতুন বৌকে ছেড়ে এদিকে বন্দুক কাঁধে গলদঘর্ম হয়ে বারন্দায় এমাথা ওমাথা করছে। আর কিরণ চেয়ারে বসে ছেলের দিকে কড়া নজর রেখেছে। করুণা অবাক হয়।

— ওগো একি কান্ড! কি হচ্ছে এসব?

বিজিত বলে,

বেচারা প্রতাপের প্রেমের অগ্নিপরীক্ষা হচ্ছে। তোমার বাবা মাইরী একনম্বর বেরসিক। ফুলশয্যার রাতে কিনা এই কান্ড!

মিনতিও বের হয়ে আসে। দেখে প্রতাপ ঘামছে আর কাঁধে বন্দুক দিয়ে মিলিটারী ভঙ্গিতে মার্চ করছে। গরদের পাঞ্জাবী — ধুতি ন্যাতা হয়ে গেছে। মিনতি বলে,

— ওরে কিরণ, এসব কি হচ্ছে!

কিরণ কঠিন স্বরে বলে,

— ঘরে যাও মা। আমাকে আমার কর্তব্য করতে দাও।

ভোর হয়ে আসছে। তখন প্রতাপ বন্দুক ঘাড়ে পাহারা দিচ্ছে। আর কিরণ পাহারা দিচ্ছে প্রতাপকে। ওদিকে ফুল দিয়ে সাজানো ঘরের এককোণে ঝিলিক অপেক্ষা করে করে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না। প্রতাপের মনে হয় — ফুলশয্যার রাতএ নয় — তার জীবনের এক দুঃসহ — বিভীষিকাময় রাত। এ রাতের শেষ হবে না।

তবু সব রাতেরই শেষ হয়। এই রাতের শেষেও দিন আসে। কিরণ এর আগেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে। প্রতাপ আজই কলেজ হোস্টেলে চলে যাবে।

দুপুরে খেতে বসেছে প্রতাপ। বিজিত — কিরণও রয়েছে। করুণা পরিবেশন করছে। কিরণ বলে — প্রতাপ, তোমার জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে নাও। বেচু আজই কলেজ হোস্টেলে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে। কাল থেকে তো তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস শুরু। এই ক্লাশগুলো ফাঁকি দিও না।

মিনতি অবাক হয়।

— কি বলছিস কিরণ! কাল সারারাত তো বন্দুক ঘাড়ে পাহারাদারি করালি। আর আজই ছেলেটাকে বাড়ি থেকে তাড়াবি! বিজিত - করুণা রয়েছে। ক'টা দিন প্রতাপ বাড়িতে থেকেই কলেজ করুক। তারপর না হয় হোস্টেলে যাবে।

কিরণ গম্ভীর ভাবে বলে,

— না। আমার সঙ্গে তার আগেই কথা হয়ে গেছে। এখন কথাতো রাখতে হবে। তুমি তো জানো, আমার কথার নড় চড় হয়না। প্রতাপ, গেট রেডি —

বিজিতও জানে শ্বশুরকে। তাই চুপ করে থাকে সে। প্রতাপও বাবার কথার অমান্য করে না। মিনতি গজগজ করতে থাকে।

ঝিলিক দেখছে ঠাকুমাকে, কেমন যেন অসহায়।

প্রতাপকে কিরণবাবু গোছগাছ করে গাড়িতে তুলে দেয়। বলে,

— সুপার তো আছে। ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে। উনি তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন।

বেচুও গাড়ি নিয়ে তৈরী। কিরণ বলে,

— বেচু, ছোটবাবুকে হস্টেলে পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসবি। দুদিন ধরে ইলেকশনের মিটিং-এ যেতে পারিনি। আজ দুটো মিটিং আছে।

মিনতি - করুণাও এসেছে প্রতাপের গাড়ির কাছে। ঝিলিক দেতালার বারন্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সেও কদিন ধরে দেখছে প্রতাপের উপর নির্যাতনটা। তাকে অবশ্য শ্বশুর

স্নেহই করেন। এ বাড়ির সকলেই ঝিলিককে মেনে নিয়েছে। আর প্রতাপকেই সহ্য করতে হচ্ছে অনেক নির্যাতন। বিজিত-করুণা সবই দেখছে। করুণা বলে,

— বাবা যা শুরু করেছে তাতে ঝিলিক-প্রতাপের সমূহ বিপদ। একটা কিছু করো।

বিজিত বলে,

— ঠাকুমাই যেখানে হার মেনেছে, আমি কি করবো! আমি তো এ বাড়ির জামাই!

করুণা বলে,

— একটা কিছু করতেই হবে। বাবার এই অন্যায় অবিচার আমি মেনে নেব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো ঝিলিক।

প্রতাপ বাড়ি ছেড়ে হস্টেলের পরিবেশে এসেছে। শহরের বাইরে এদিকে তখন ছিল লাল মাটির রুক্ষ প্রান্তর। তার ওদিকে বয়ে গেছে নদীটা। তার ধারে শাল, পিয়াল, মহুয়ার বন। দুরে দুরে ছোট ছোট গ্রামও দু একটা ছিল। এখন শহরের বাইরে সেই প্রান্তরে গড়ে উঠেছে বিশাল এলাকা নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ। ওদিকে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড, কলেজ, আউটডোর। লোকজন — রোগীদের ভিড় থাকে সবসময়। কলেজের ওদিকে নদীর ধারে ওদের হস্টেলের বিল্ডিংগুলো। প্রতাপ তারই একটা বিল্ডিং - এর দোতালায় একটা ঘরে ঠাই পেয়েছে। প্রতি ঘরে দুজন করে ছাত্র। লাগোয়া বাথরুম। একটু ব্যালকনি। সেই ছোট ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নদী, ওদিকে বনভূমি, শ্যামলা ধানের ক্ষেত চোখে পড়ে।

প্রতাপের ওই নাটকীয় প্রেম, তাদের বিয়েব কথা, প্রতাপের বেশ কিছু বন্ধুরা জানে। সুনীল, দীনবন্ধু, রাখালরা প্রতাপের কলেজের দিনের বন্ধু। একসাথে কলেজের পড়া শেষ করে মেডিক্যালে ভর্তি হয়েছে। সুনীল, দীনবন্ধুরা ঝিলিককে চেনে। ওরা বৌভাতে নিমন্ত্রণেও গেছিল। আজ ওকে হস্টেলে বিছানা, স্যুটকেশ নিয়ে ঢুকতে দেখে বলে দীনবন্ধু,

— প্রতাপ তুই! বাড়ি ছেড়ে, বৌকে ছেড়ে এখানে? কি ব্যাপার স্বর্গ ছেড়ে, অপ্সরা ছেড়ে এখানে?

প্রতাপের সেই দুঃখময় রাত্রির কথা, বাবার শর্তের কথা শুনে সুনীল বলে,

— সর্বনাশ! এখনও দু বছর বাকী ফাইনালের। ততদিন এইভাবে চলতে হবে!

— হ্যাঁ, বাবা বলেন এখন পড়াই হবে তপস্যা। এই তপস্যায় কোন বাধা তিনি হতে দেবেন না।

দীনবন্ধু বলে,

— থামতো! কত বড় বড় মুনি ঋষিদের তপস্যাও ভঙ্গ হয়েছে। তোর তপস্যাতো ছাই। আলবৎ হবে।

প্রতাপের মনে পড়ে ঝিলিকের কথা। আসার সময় তার কান্নাভরা দুচোখ সে দেখেছিল। প্রতাপের মনেও কি বেদনার সুর। প্রতাপ বলে,

— কিন্তু কি করে তা হবে রে?

দীনবন্ধু বলে,

— একটু ভাবতে দে। ছুটির দিনে তোর বাড়িতে গিয়ে একবার সব দেখে আসতে হবে। তারপর পথ একটা বের হবেই।

লবঙ্গ এখন একাই। বাড়িতে কাজের মেয়ে আর পুরানো কাজের লোক আর ড্রাইভার। মুহুরীও আসে। লবঙ্গ এখন সব ভুলে থাকতে চায়। ঝিলিকের কথা মনে পড়ে। কিরণই কেড়ে নিয়েছে ষড়যন্ত্র করে। লবঙ্গও এখন ঝিলিকের উপর খুশী নয়। মেয়েটা তার অগোচরে কিরণের ছেলের সঙ্গে প্রেম করতো। লবঙ্গের সব রাগ গিয়ে পড়ে কিরণের উপর।

কেশব এখন পুরোপুরি ভোটের কাজে নেমেছে। লবঙ্গও ভোটের কাজে ময়দানে নামে। ভোটে তাকে জিততেই হবে। কিরণকে সে হারাবেই।

কিরণও বসে নেই। সে এখন নতুন উদ্যমে ভোটের কাজে নেমেছে। আর এমনিতে সে জনপ্রিয় ডাক্তার। বহু মানুষকে সে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে। নানা জনহিত কাজের সঙ্গে যুক্ত সে।

মিনতির সংসার ঠিকই চলছে। কিরণও খুশী। এখন ঝিলিকই তার দেখাশোনার ভার নিয়েছে। ঘরের বেশীর ভাগ কাজই সে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। কিরণের ভোটের মিটিং - এর ভাষণও কপি করে দেয় ঝিলিক।

মনোজ বলে,

— কিরণ, বিনা পয়সায় দেখছি দারুন সে ক্রটারী পেয়ে গেছ।

কিরণ বলে,

— তা সত্যি ঝিলিক খুবই কাজের মেয়ে। কাজকর্ম সব ঠিকঠাক করে। মায় আমার জামাকাপড়, ভোটের কাজ, ডাক্তারীর হিসাব সবটাতেই এক্সপার্ট। আর রান্না — চমৎকার।

মিনতি বলে,

— সব ঠিকই হচ্ছে বাবা মনোজ। দুঃখ হয় প্রতাপের জন্য। ও বেচারা হস্টেলে কি খায় না খায়! দিনরাত পড়া আর পড়া। ঝিলিক এত কাজের মধ্যেও পথ চেয়ে থাকে প্রতাপের জন্য।

রবিবার দিন সকালে এসেছে প্রতাপ সঙ্গে দীনবন্ধু। মিনতি ওদের আশার পথ চেয়েছিল। সেই বিয়ের সময় বাড়িটা কদিন জমজমাট ছিল। বিজিত-করুণাও চলে গেছে

তাদের চাকরীর জায়গায়। কিরণও নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। তবু মিনতির সময় কাটে ঝিলিকের সঙ্গে। আজ প্রতাপ আর দীনবন্ধু এসেছে। ঝিলিকও ঘরে ছিল। কিরণ দেখে দুজনকে। প্রতাপ আর ঝিলিকের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয় আর কি খুশীতে ওদের দুজনের চোখ মুখ যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সেটা কিরণের সাবধানী চোখ এড়ায় না। ঝিলিক ভিতরে চলে গেছে। প্রতাপ, বাবা - ঠাকুমাকে প্রণাম করে, দীনবন্ধুও। আজ রবিবার। কিরণের চেম্বার নেই। সে পেপার পড়তে থাকে। আর নজর রাখে প্রতাপ — ঝিলিকের উপর। আজকালকার ছেলেমেয়েদের বিশ্বাস নেই।

প্রতাপ চা-জলখাবার খাওয়ার পর দীনবন্ধুকে বলে,

— তুই বোস্, আমি একটু উপর থেকে আসছি।

প্রতাপ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে যাবে, হঠাৎ বাবার ডাক শুনে চাইল। কিরণ সিঁড়ির মুখেই বসেছিল। খবরের কাগজে মুখ রেখে গোয়েন্দাগিরি করছিল। জানেতো ফাঁক পেলেই প্রতাপ উপরে যাবে, আর যেতে দেখে শুধোয়,

— কোথায় যাচ্ছ?

প্রতাপও জানতো যে ঝিলিকের সঙ্গে দেখা করার পথেই বাধা হয়ে থাকবে তার বাবা। প্রতাপ বলে,

— ইয়ে, মানে বাথরুমে যাচ্ছিলাম।

কিরণ বলে,

— নীচে দুটো টয়লেট খালি পড়ে আছে।

প্রতাপ ফিরে আসে। দীনবন্ধুও দেখছে ব্যাপারটা। প্রতাপের একটা চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ঝিলিকও দেখছে দোতালা থেকে ব্যাপারটা।

দীনবন্ধু বুঝেছে ওই কড়া হিটলারকে সহজে এড়ানো যাবে না। প্রতাপ দীনবন্ধু রয়েছে একতলায় প্রতাপের পড়ার ঘরে। জানলা দিয়ে দেখা যায় বাগানে এসেছে কিরণও। সেও আজ হঠাৎ উদ্যান প্রেমী হয়ে ওঠে। ঝিলিক ফুল তোলার ছল করে এদিকে আসবে, কিন্তু দেখা যায় কিরণ এদিকের গাছগুলোকে নিরীক্ষণ করতে আসছে। প্রতাপ রেগে বাগানের জানলাটাই বন্ধ করে দেয়। বলে,

— দেখেছিস দীনু, বাবার কান্ড। লাইফ হেল করে দিল। নিজের বৌ-এর সঙ্গে দুটো কথা বলার অধিকারও নেই। চল হোস্টেলে ফিরে যাই।

দীনবন্ধু বলে,

— আরে চিংড়ি মাছের মালাইকারী, মাংসের ঝোল এসব ছেড়ে যাবি?

প্রতাপ বলে,

— বৌ-এর চেয়ে খাওয়াটাই বড় হল?

দীনবন্ধু বলে,

— আরে খাওয়া হবে, বৌও থাকবে। চল দেখি তোদের বাগানটা যদি কোন পথ বের করা যায়।

ঝিলিক তার ফুল তোলার কাজ শেষ করে ভিতরে চলে গেছে। তাই কিরণও বাগান থেকে ফিরে এসে ওই সিঁড়ির মুখের চেয়ারে গেড়ে বসেছে। মনোজও এসেছে। আজ মনোজও অবাক হয়। নিচের তলায় ঝিলিক অন্যদিন এসে তাদের চা দিয়ে যায়। আজ ঝিলিক আর আসে না। বাড়ির কাজের লোক চা আনে।

মনোজ শুধোয়,

— ঝিলিক কোথায়?

কিরণ বলে,

— ও বিজি আছে। নাও চা খাও।

জবাব দিচ্ছে মনোজকে তবে কিরণের চোখ রয়েছে অন্য দিকে। মনোজের পুলিশি চোখ। সে দেখছে কিরণের কান্ডটা। সে যেন প্রতাপকে পাহারা দিয়ে রেখেছে। সিঁড়ির সামনে পথ আটকে রেখেছে। যাতে দোতালায় না যেতে পারে।

মনোজ বলে,

— কি ব্যাপার বলো তো! সকাল থেকেই আজ পাহারাদারি শুরু করেছ! ডাক্তারী ছেড়ে এবার এই কাজই করো।

কিরণ বলে,

— তোমরা আমার শর্ত পালন করতে চাও না। তাই কাজটা আমাকেই করতে হচ্ছে।

মনোজ বলে,

— এ সব তোমার পাগলামি।

কিরণ বলে,

— আমার আদর্শ নীতিকে আমি মেনে চলি হে। এটা আমাকে করতেই হবে। ইট ইজ মাই ডিউটি।

বাগানে প্রতাপ-দীনবন্ধু ঘুরছে। বেশ খানিকটা এলাকা নিয়ে বাগানটা। প্রাচীর ঘেরা, তবে খুব উঁচু নয়। পাচীলের ধারে একটা গাছও আছে, যার ডালটা ওদিকে বের হয়ে গেছে। আর বাড়ির গায়েই রয়েছে একটা পুরোনো যুঁই গাছ। যুঁই লতাটা মেশ মোটা হয়ে উঠে গেছে দোতালার বারন্দার গায়ে। ওখানে বেশ কিছু লতাপাতা মেলে তিনতলার ছাদে উঠে গেছে। দীনবন্ধু দেখছে ওই যুঁই গাছকে। বেশ মোটা লতাপাতা ফুল নিয়ে গাছটা

উপরে উঠে গেছে। দীনবন্ধু দেখছে প্রতাপকে। তীর্থের কাকের মত দোতলার দিকে তাকিয়ে আছে প্রতাপ।

দীনবন্ধু শুধোয়,

-- তোদের ঘর কোনটা? মানে ঝিলিক কোন ঘরে থাকে?

প্রতাপ বলে,

— ঠিক উপরের ঘরটাতেই। কেন?

দীনবন্ধু কথা বলে না। বাগানের এদিক ওদিক ঘুরে প্রতাপকে নিয়ে ওর পড়ার ঘরে আসে।

মিনতি নেমে এসেছে পূজা সেরে। ও দেখে কিরণ তখনও সিঁড়ির মুখে চেয়ারে বসে কাগজ দেখছে। এর মধ্যে ভোটের ছেলেরাও এসেছে। ও ঘর থেকেই তাদের নির্দেশ দিচ্ছে।

মিনতি বলে,

--- এখানে কি করছিস?

কিরণ মায়ের কথার কোন জবাবই দিল না। মিনতিও দেখেছে প্রতাপ এসে অবধি দোতালায় যায়নি। এবার সেও বোঝে কিরণই তার পথ আটকে বসে আছে।

প্রতাপ-দীনবন্ধু র খাবারের আয়োজনও হয় নীচে। ওদের নেমন্তন্ন খাইয়েই যেন বিদায় করতে চায় কিরণ। ওরা খেতে বসেছে। ঝিলিককে দুএকটা পদ পরিবেশন করতে দেওয়া হয়েছে। কিরণ নজর রেখেছে। ঝিলিক স্তব্ধ হয়ে পরিবেশন করছে।

দীনবন্ধু বলে,

— দারুণ রান্না হয়েছে। চিংড়ির মালাইকারী, মাংসটাও বেশ সুস্বাদু হয়েছে।

প্রতাপের কাছে সব কেমন স্বাদহীন হয়ে গেছে। অসহায় ব্যর্থ রাগে, সে মনে মনে ফুঁসছে।

কিরণ বলে,

— খাও প্রতাপ। বৌমা সত্যিই দারুণ রান্না করে।

প্রতাপ-দীনবন্ধুকে বিকালের গাড়িতে তুলে বিদায় দিল কিরণ। যাবার সময় বলে,

— প্রতাপ, সামনের রবিবার ভোট। সেদিন সবাই ব্যস্ত থাকবে। তুমি বরং তার পরের রবিবার আসবে। সেদিন বিজয় উৎসব করা যাবে। দীনবন্ধু, তুমিও আসবে।

ওরা চলে যায়। মিনতি রাগে গজগজ করতে করতে বলে,

— ওকি খেতে আসে এতদুর থেকে? কি তোর ব্যবহার বলতো কিরণ?

কিরণ বলে,

— এ আমার নীতিগত ব্যাপার। ও তোমরা বুঝবে না।

ঝিলিক বুদ্ধিমতী। ও বুঝেছে ব্যাপারটা। ঝিলিকের মনে পড়ে মায়ের কথা। ঝিলিক প্রতাপকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। কিন্তু এইভাবে তাদের দুজনকে দুদিকে রাখা হবে, এটা ভাবেনি।

ব্যাপারটা মিনতি দেবীও লক্ষ্য করেছে। তারও নিজের কাছে অপরাধী বলে মনে হয়। ঝিলিকও মনমরা হয়ে থাকে। সব কাজ করে, তবু সে কেমন চুপচাপ। সেদিন মিনতি দেবীই বলে,

— মায়ের কথা মনে পড়ছে?

ঝিলিক চুপ করে থাকে। চোখে জল আসে। মিনতি বলে,

— সত্যি, মায়ের কাছে কতদিন যাওনি। যাও ঘুরে এসো আজই।

ঝিলিকের বাবা ওদের বিয়ের পর এ বাড়িতে এসেছিল। তাদের বৌভাতেও এসেছিলেন তিনি। এ বিয়েতে তিনি খুশীই হয়েছেন। তবু ঝিলিকের মনে পড়ে মায়ের কথা। মাকে একাই ফেলে এসেছে সে। আজ তাই যাবার কথা শুনে ঝিলিক বলে,

— বাবা কিছু বলবেন না তো?

মিনতি ছেলের উপর চটেই আছে। বলে সে,

— ও কি বলবে? আমি ওকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব। আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে এসব ভোটের লড়াই করতে লজ্জা হয় না! যাও তো তুমি, বেচুকে বলছি, ও নিয়ে যাবে। যাও ঘুরে এসো।

লবঙ্গ এখন মরীয়া হয়ে গেছে। তাকে জিততেই হবে। সামনের রবিবার সেই ভোটের দিন। খুব ব্যস্ত সে। কিরণের ক্যাম্পে কি হচ্ছে সে সব খবরও আসছে এখন। কি কৌশল নেবে তারা, তার আলোচনা হচ্ছে। এর মধ্যে বোমার মশলা কিনতে হাজার দশেক টাকাও দেওয়া হয়েছে। সেই মালও আসছে।

কলিং বেলটা বেজে ওঠে। একজন লোক দরজাটা খুলে দেয়। লবঙ্গ তখন বুথের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ ঝিলিককে সিঁদুর শাখা পরা অবস্থায় এ বাড়িতে হাজির হতে দেখে তার মাথায় রক্ত উঠে যায়। আজ সে তার মেয়ে নয়। তার মেয়েই আজ তার সাথে চরম শত্রুতা করছে। আর এখন ভোটের মুখে তাদের রণকৌশল জানার জন্য কিরণই ঝিলিককে এখানে পাঠিয়েছে গুপ্তচর হিসাবে।

ঝিলিক মাকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে আসে। আজ ঝিলিক মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে, মায়ের এতটুকু স্নেহের জন্যই এসেছে আজ অনেক আশা নিয়ে।

— মা, মাগো —

লবঙ্গ এবার তার বিরাট দেহ আন্দোলিত করে বলে,

— মা! আজ এসেছ মায়ের কাছে? কি মতলবে এসেছ তা জানি।

অবাক হয় ঝিলিক মায়ের কথা শুনে। বলে সে,

— এ কি বলছ মা?

লবঙ্গ গর্জে ওঠে,

— আমার কাছে ন্যাকামি করতে এসো না। ওই কিরণ ডাক্তারই তোমাকে পাঠিয়েছে আমার দলের গোপন খবর জানতে। তুমি আমার মেয়ে আর নও, আমার সর্বনাশ করেও খুশী হওনি। এসেছ এবার আমাকে ভোটে হারিয়ে চরম সর্বনাশ করতে।

— এসব কি বলছ মা?

ঝিলিকের চোখে জল নামে। বলে সে,

— এসব মিথ্যা কথা মা। আমি এসেছিলাম তোমার কাছে। আমাকে কি ক্ষমা করবে না? আমি তো কোন অন্যায় করিনি।

লবঙ্গ বলে,

— থাক্। আর নাকে কাঁদতে হবে না। আমি তোমাকে এতটুকু বিশ্বাস করি না। যাও, চলে যাও এখান থেকে — তারপরই লবঙ্গ ডাক দেয় — কিরণ — কিরণ -

ঝিলিক মায়ের মুখে ওই নাম শুনে চমকে ওঠে। তাহলে কি তার শ্বশুরমশাই এখানে আসেন। দেখা যায় লবঙ্গের ডাক শুনে এগিয়ে আসে ওদিক থেকে একটা বিরাট আকারের অ্যালশেসিয়ান কুকুর।

লবঙ্গ বলে,

— এই আমার পোযা কুকুর কিরণ। একে তুমি চেন না। কিন্তু কেউ বেইমানি করলে কিরণই তার জবাব দেবে। কুকুরটা জিব বের করে হাঁপাচ্ছে।

ঝিলিক বের হয়ে আসে। বেশ বুঝেছে মাও আজ তাকে পর করে দিয়েছে। আজ মা তাকে কুকুর দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়াতে চায়। আর কোনদিনও সে মায়ের কাছে আসবে না।

সন্ধ্যায় কিরণ বাড়ি ফিরেছে। ঝিলিক আজ কিরণকেও সব কথা বলে। সব শুনে কিরণ গর্জে ওঠে,

— আমার নামে কুকুর পুযেছে! ওর নামে আমি তিনটে বুলডগ পুষবো। আমার বৌমাকে বাড়ি থেকে আউট করে দেবে! ওর ঐ বাড়িই আমি কিনে নেব।

মিনতি বলে,

— কিনতে হবে কেন? ও বাড়িতো ঝিলিকেরই হবে। এখন চুপ করে থাকো।

রবিবার ভোটের দিন। দুপক্ষই উঠে পড়ে লেগেছে। জিততে হবে। মাঝে মাঝেই

শহরের এখানে ওখানে ছোট বড় ঝামেলা হচ্ছে। মনোজ দারোগার ডিউটি আজ দশগুণ বেড়ে গেছে। সারাটা দিনই আজ তুমুল উত্তেজনার মধ্যে কাটে। বিকালে ভোট শেষ হতে শহর যেন ঝিমিয়ে পড়ে। এতদিনের রণ প্রস্তুতি আজ শেষ হয়। এখন ওদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে ভোটের বাক্সে দুদিন পরেই।

কলেজ হোস্টেলে অবশ্য ভোটের এই উত্তেজনাটা নেই। শহরের বাইরে এখন চলছে হাসপাতালের কাজ। ছেলেদের পড়াশোনার ব্যাপারে তেমন কোন বাধাও হয়নি। হোস্টেলে দীনবন্ধুর ঘরে ওদের আড্ডাটা বেশ জমে উঠেছে, দীনবন্ধু প্রতাপের কেসের তদন্তের ফরেনসিক রিপোর্ট পেশ করেছে। প্রতাপের বাবা যে পবিত্র প্রেমেরে কোন মর্যাদাই দিতে চায় না, সেই কথাই ফুটে উঠেছে দীনবন্ধুর রিপোর্টে। প্রতাপ ওদিকে বসে আছে। সুনীল — রাখালরা বলে,

— এর প্রতিবাদ করা উচিত। প্রতাপের কেসটা একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।

দীনবন্ধু বলে,

— তার আগে প্রতাপকেই তৈরী হতে হবে, প্রেমের জন্য, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য করার জন্য। ওর বাবা যতই বাধা দিক, প্রতাপকে সেই বাধা উত্তীর্ণ হবার জন্য ট্রেনিং দেব। ওকে ছদ্মবেশও ধারণ করতে হতে পারে। দরকার হলে দোতালায় ওঠার ট্রেনিংও নিতে হবে। ওর বাবার সঙ্গে যুদ্ধ করা যাবে না। ছলে — বলে — কৌশলে বাড়ির মধ্যে ঢুকে প্রতাপকে তার রাজকন্যাকে পেতে হবে।

খাটের নীচ থেকে একটা দড়ি বের করে দীনবন্ধু বলে,

— ব্যালকনির থেকে এই দড়ি বেঁধে নাম্ আর ওঠার চেষ্টা কর। কয়েকদিন ট্রাই করলেই পেরে যাবি।

বিকালে ক্লাশ থেকে ফিরে ছেলেরা মাঠে ফুটবল খেলে। তখন বারন্দায় দড়িটা বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দিয়েছে দীনবন্ধু। মোটা দড়িতে মাঝে মাঝে গিট বাঁধা।

দীনবন্ধু বলে,

— প্রতাপ ট্রাই কর। দোতালার ব্যালকনিতে উঠতে হবে। তোর তো রিস্টের জোরও আছে। পারবি। ওঠ, ট্রাই কর —

প্রতাপ বলে,

— ওরে বাবা! পারবো না। পড়ে যাবো।

দীনবন্ধু জোর করাতে চেষ্টা করে প্রতাপ। খানিকটা উঠেই হাঁপাচ্ছে সে। আবার চেষ্টা করতে থাকে।

ভোটের ফল বের হবে আজ। কিরণ সকাল থেকে উঠে ছটফট্ করছে। ঝিলিক চা দিতে আসে। কিরণ তখন পায়চারী করছে।

ঝিলিক বলে,

— বাবা, আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? দেখবেন আপনিই জিতবেন।

ঝিলিক এখন চায় তার মা হেরে যাক। ঝিলিকের কথায় কিরণ বলে,

— সত্যি বলছ মা!

— হ্যাঁ, বাবা। আমার মা হতে পারেন উনি, কিন্তু দেশের জন্য কাজ করার কোন যোগ্যতাই নেই। জনগণ তা জানে। তাই তারা দেখবেন আপনাকেই জিতিয়ে দেবে।

কিরণ এবার চা নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে। বলে,

— না, তোমার বুদ্ধি আছে।

লবঙ্গও এখন বাড়িতে হোম যজ্ঞ শুরু করেছে। এতদিন ধরে কেশব তার সঙ্গে ভোট যুদ্ধে এক হয়ে লড়েছে। লবঙ্গ এবার মা কালীর আশীর্বাদে জয়ী হবার জন্য আজই বাড়িতে হোম যজ্ঞের আয়োজন করেছে। হোম যজ্ঞ শেষ করে লবঙ্গ যাবে ভোট গণনা কেন্দ্রে। মা তাকে নিশ্চয়ই জয়ী করবে। কেশব বলে,

— লবঙ্গ, তোমার হোম যজ্ঞ শেষ হলে এসো। আমি ভোট গণনা কেন্দ্রে যাচ্ছি। আমাদের কারোর সেখানে থাকা দরকার।

হঠাৎ বিকট বোমা ফাটার শব্দে চমকে ওঠে লবঙ্গ। বাইরে বিরাট শোরগোল ওঠে। ব্যান্ড বাজাচ্ছে। জনতার কলরব ওঠে। কে বলে,

— ভোটের ফল বের হয়েছে বোধ হয়। কে জিতলো?

লবঙ্গ কথাটা শুনে ধড়মড় করে উঠে যায় হোম যজ্ঞ ফেলে।

পুরোহিত বলে,

— মা দুগ্গা বিব্রত হবে। যেও না —

লবঙ্গ পুরোহিতের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে মোটা দেহ নিয়ে এবার বিপুল বেগে এগিয়ে আসে দরজার কাছে। তখন বোমা ফাটাচ্ছে লোকজন ওদিকের রাস্তায়। লবঙ্গ খুঁজছে তার দলের লোকদের। কিন্তু তাদের দেখা নেই। হঠাৎ কানে আসে জয়ধ্বনি।

— জিতলো কে? কিরণ ডাক্তার — আবার কে? কিরণ ডাক্তার জিন্দাবাদ —

কে চীৎকার করে,

— লবঙ্গ লতিকা মুর্দ্দাবাদ। হেরে গেল কে? লবঙ্গ লতিকা গাঙ্গুলী — আবার কে?

লবঙ্গের কানে কথাগুলো যেন তীরের মত এসে বেঁধে। দেখে ওই ধোয়ার মধ্যে একটা জীপ বের হয়ে আসছে। আর তাতে বিজয়ীর বেশে কিরণ ডাক্তার। কাঁচাপাকা চুল

আবীর মাখা। দুহাত তুলে জনতাকে সে নমস্কার জানাচ্ছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে লবঙ্গের মেয়ে ঝিলিক। একটা লাল শাড়ি পরণে। তার মাথাতেও লাল আবীর।

কিরণ আজ যেন লবঙ্গের সেই শীল্ড জিতে তার বাড়ির সামনে নাচার প্রতিশোধই নিতে এসেছে। আর আজ কিরণের পাশে রয়েছে তার নিজের মেয়ে ঝিলিক, যাকে সে একদিন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ঝিলিকও যেন আজ তার মায়ের এই পরাজয়ে আনন্দে ফেটে পড়ছে।

লবঙ্গের হাত পা কাঁপছে। মনে হয় এক্ষুনি যেন ছিটকে পড়বে সে। তখনও তার বাড়ির সামনে শোভাযাত্রা দাঁড়িয়ে আছে। তুমুল বাদ্যি বাজনা আর নৃত্য চলছে। লবঙ্গ সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভিতরে আসে। বাইরে তখনও ওই জয়ধ্বনি আর বাজনার শব্দটা লবঙ্গের মনে ঝড় তুলেছে।

পুরোহিত বলে,

— মা জননী, পূর্ণাহুতি দিচ্ছি।

লবঙ্গ এবার রেগে বলে,

— আর পূর্ণাহুতি দিয়ে কাজ নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন মানে মানে কেটে পড়। নইলে ওই হোমের আগুনেই তোমার মুন্ডুটা গুঁজে দেবো। যত্তোসব ফোর টোয়েন্টি।

লবঙ্গ এবার অসহায় রাগে ফুঁসছে। আজ কিরণ ডাক্তার তাকে সব দিক থেকেই বিপর্যস্ত করেছে। তবু লবঙ্গ তার নীতি থেকে সরে আসবে না। তার মেয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না। জানবে তার মেয়ে নেই। স্বামী থেকেও না থাকা। সে তার লড়াই একাই লড়বে। আজ লবঙ্গ সকলকে চিনে নিয়েছে।

মিনতির বাড়ির ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কিরণ আজ খুশী। আজ সে মুখের মত জবাব দিয়েছে। ঝিলিকও সত্যি এই বাড়ির লক্ষ্মী। তার আসার পরই কিরণ ভোটে জিতেছে। পরাস্ত করেছে লবঙ্গকে। মিনতিকে বলে কিরণ,

— মা, তোমার নাত বৌ ভারি পয়মন্ত। আজ সকালে ওর মুখ দেখে উঠেছিলাম, ব্যস জয়ী হয়ে গেলাম।

মিনতি বলে,

— ওরে, এ যে লক্ষ্মী তা জেনেই ওকে ঘরে এনেছি। তুই এম.এল.এ হলি। দেখবি প্রতাপও ভালো ভাবেই পাশ করবে। তাহলে আজ প্রতাপকেও বাড়িতে আসতে বল।

কিরণ বলে,

— না। দুদিন পর রবিবার, তখন আসবে। সে দিনই বাড়িতে আনন্দ উৎসব হবে। হ্যাঁ,

বিজিতদেরও আসতে ফোন করে দিচ্ছি। ওরাও আসুক, সেদিন শহরের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে ফোন করবো।

রবিবার কিরণ বেশ ঘটা করে বিজয় উৎসবের আয়োজন করেছে। বিজিত-করুণারাও এসেছে। ঝিলিকও এখন এই বাড়ির নিয়মটাকে বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে। মিনতি তবু বোঝে ঝিলিকের বেদনাটা। ঠাকুমা প্রতাপের কথা বললে ঝিলিকই বলে,

— এ নিয়ে তুমি ভেবনা ঠাকুমা। ওর পড়ার চাপ। এখন পড়াশোনাই করুক।

ঝিলিকও নিজেকে এই বলেই সান্ত্বনা দেয়।

প্রতাপ এই নির্বাসনকে মেনে নিয়েছে। ছুটির দিন বাড়িতে আসে। বাবা তাকে পাহারা দিয়ে রাখে। ঝিলিককে দুর থেকেকোন দিন দেখে মাত্র। কিন্তু কাছে যাবার উপায় নেই। আজও বাড়িতে আসে প্রতাপ। উৎসবের পরিবেশ। বাবার হাঁকডাক শোনা যায়। মনোজও এসেছে। প্রতাপকে দেখে কিরণ হুঁসিয়ার হয়ে ওঠে। বলে,

— বসো এখানে।

এর মধ্যে বিজিতও এসে পড়ে। প্রতাপকে দেখে বলে,

— প্রতাপ এসে গেছো। চলো।

কিরণ তার জামাইকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। বলে,

— ওই পাশের ঘরে গিয়ে কথা বল তোমরা। উপরে খবর দিচ্ছি। চা জলখাবার ওখানেই পাঠিয়ে দেবে।

বিজিতও জানে তার শ্বশুর পাহারাদারি শুরু করেছে। প্রতাপকে উপরে উঠতেই দেবে না। তবু বিজিত বলে,

— আজ থাকছো তো প্রতাপ। রাতে জমিয়ে গল্প করা যাবে।

কিরণ বলে,

— না, ওর পড়াশোনা আছে। সন্ধ্যার আগেই চলে যেতে হবে হোস্টেলে।

মিনতি শুনছিল। সে বলে,

— সন্ধ্যার আগে কেন? এক্ষুনি চলে যা ভাই হোস্টেলে। আজ রাতে লোকজন আসবে। খাওয়া দাওয়া হবে। আর বাড়ির একমাত্র ছেলে, সেই থাকবে না। এ যেন শিব হীন যজ্ঞ!

মনোজ বলে,

— ঠিক তাই। কিরণকে বলে — সবাই যখন তোমার ছেলের খোঁজ করবে, কি জবাব দেবে তার?

মিনতি বলে কঠিন স্বরে,

— বলবে ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

কিরণও বুঝেছে ওদের দিকেই বেশী ভোট। একটা রাত তাকে পাহারাদারি করতে হবে। তাই করবে। সেই ভেবেই কিরণ বলে,

— ঠিক আছে। একটা রাত না হয় থাকবে। প্রতাপও খুশী হয়।

সন্ধ্যার পর অতিথিদের সমাগম শুরু হয়েছে। শহরের অনেকেই আসে এবার তাদের নতুন এম-এল-একে শুভেচ্ছা জানাতে। কিরণবাবুর অন্যতম হরেন মিত্তিরও। এসেছে এবার কেশব বাবুও। সে জানে তার দলকে রাখতে গেলে এবার কিরণের সাহায্যও দরকার।

কিরণ তার লোক পাঠিয়েছিল লবঙ্গের কাছে। তাকেও নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে। কিন্তু লবঙ্গ আসেনি। ওদিকে অতিথিদের ভুরি ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। মেয়েরাও এসেছে। ঝিলিক-করুণা তাদের আপ্যায়নে ব্যস্ত।

ঝিলিক আজ যেন এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখছে। আজ হয়তো প্রতাপ আসবে তার কাছে। আজ রাতে থাকবে প্রতাপ। ওর রাত্রিবাস করার অনুমতি মিলেছে। ঝিলিক তাই যেন প্রহর গুনছে।

প্রহর গুনছে প্রতাপও। বিজিত বলে,

— এত ছটপট্ করছো কেন ভায়া? এতদুর যখন ম্যানেজ করেছি, বাকীটাও ম্যানেজ হয়ে যাবে। তোমার বাবার বিজয় উৎসবের রাত হবে তোমারও উৎসবের রাত। একটু ধৈর্য ধরো।

রাত হয়ে গেছে। অতিথি সব পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে গেছে। বাড়ির লোকেদের খাওয়া দাওয়া হতে রাত হয়ে যায়। বিজিত এবার প্রতাপকে নিয়ে দোতালায় উঠতে যাবে, দেখে সিড়িতে বন্দুক হাতে কিরণ, পাশে বেচু। কিরণ ওদের বলে,

— প্রতাপ নীচে তোমার পড়ার ঘরে তোমার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। যাও, রাত হয়েছে, শুয়ে পড়োগে। বিজিত তুমি উপরে চলে যাও।

বিজিত বুঝেছে দোতালায় প্রতাপের নো এন্‌ট্রি। কিরণবাবুর নীতি অতীব কঠিন। বিজিত মাথানীচু করে প্রতাপকে নীচে রেখে উপরে চলে গেল। একা দাঁড়িয়ে আছে প্রতাপ। কিরণ বলে,

— কি হল? দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও, শুয়ে পড়োগে।

দিনের বেলা হলে প্রতাপ সোজা বাড়ি থেকে বের হয়ে হিমালয়ে চলে যেত সন্ন্যাসী হবার জন্য। এখন রাত্রি, তাই মাথা নীচু করে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। বাইরের আলোগুলো নিভে গেছে। বাগানে নেমেছে অন্ধকার।

একফালি ম্লান চাঁদের আলোয় বাগানটা আলো আঁধারিতে ভরে উঠেছে। প্রতাপের ঘুম আসে না। তার পড়ার ঘরের একটা দরজা রয়েছে বাগানের দিকে। নীরব রাগে অভিমানে ফুঁসছে প্রতাপ। ও যেন এ বাড়ির একজন অবাঞ্ছিত অতিথি।

সারা বাড়ির লোক শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। ঘুম আসে না তার। বাগানে সে এসেছে। ঠান্ডা হাওয়া বইছে। হঠাৎ তার নজর পড়ে বাগানের যুঁই লতার দিকে। পুরুষ্ট লতাটা বাঁক খেয়ে বেশ কয়েকটা ভাঁজের মত হয়ে দোতালার বারন্দা ছাড়িয়ে তিনতলার দিকে উঠে গেছে। দীনবন্ধুর কথা মনে পড়ে। সেই তাদের বাড়িতে এসে সবকিছু দেখে তাকে দড়ি ধরে দোতালায় ওঠা নামা প্র্যাকটিস করিয়েছে। প্রতাপের মনে হয় তার চেষ্টা এবার কাজে লাগবে। দীনবন্ধুও এমনি কিছু করতে বলেছিল। এই লতা ধরেই সে উপরে উঠবে। হাজির হবে ঝিলিকের কাছে। কেউ টেরও পাবে না। প্রতাপ ঝিলিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার এই পথ ধরেই ফিরবে নিরাপদে।

প্রতাপের মনের মধ্যে যেন নতুন শক্তির সঞ্চার হয়েছে। একবার চারদিক চোখ বুলিয়ে নেয় সে। কেউ কোথাও নেই। বাবা বাড়ির ভিতরে পাহারা দিচ্ছে সিঁড়ির মুখে। প্রতাপ এদিক দিয়েই উপরে উঠে যাবে।

নিস্তব্ধ রাত্রি, ঘুমন্ত শহর। দুরে দু'একটা কুকুরের ডাকছে। আবার স্তব্ধতা নামে। রাতের বাতাসে যুঁই ফুলের মিষ্টি সুবাস ওঠে। ঝিলিকের মুখ খানা মনে পড়ে।

প্রতাপ এবার ওই যুঁই লতা ধরে উঠতে থাকে উপরের দিকে। পায়ের কাছে লতার খাঁজগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে পা ফেলে উঠছে সে। হোস্টেলে দড়ি ধরে ওঠা নামা প্র্যাকটিস করাতে কাজটা অনেক সহজ হয়। এবার প্রতাপ সাবধানে লতা থেকে বারন্দায় নামে। সামনেই ঘিলিকের ঘর।

ঝিলিক আশা করছিল, হয়েতো আজ উৎসবের দিনে কিরণ বাবু আদর্শনীতি থেকে কিছুটা সরে যাবে আর প্রতাপ আসবে তার ঘরে। সে আজ সামান্য প্রসাধনও করেছিল, ঘরে কিছু ফুল এনে রেখেছিল। কিন্তু যেমন সে আশা করেছিল সে রকম কিছুই ঘটেনি। বিজিত একাই উপরে উঠে আসে। প্রতাপকে আসতেই দেয়নি। তার কান্না আসে। বিজিত-করুণারা চলে গেছে তাদের নিজেদের ঘরে। ঝিলিক নিজের বিছানায় এসে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তার মনে হয় তার সব কিছুই যেন হারিয়ে গেছে। এই উৎসবের আনন্দ জগতে যেন সে নির্বাসিতা।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। বারন্দার জানলাটা খোলা। শীতের শুরু। তাই বেশ মিষ্টি হাওয়া আসছে। রাত কত জানে না। বাইরে ঘন অন্ধকার।

হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় ঝিলিকের। বারন্দায় কি যেন একটা পড়েছে।

তারপরই দেখে তার জানলার দিকে একটা ছায়ামুর্তি এগিয়ে আসছে সাবধানে। ঝিলিক জানে এখন শহরে চুরি ডাকাতিও হচ্ছে। তাই ছায়ামুর্তি তার জানলার দিকে এগিয়ে আসতে এবার ঝিলিক বিকট স্বরে চীৎকার করে ওঠে — চোর — ডাকাত — ডাকাত। রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে তার ওই তীব্র চীৎকারটা সারা স্তব্ধতাকে খান খান করে সারা বাড়ি ভরিয়ে তোলে। নীচের ঘরে কিরণ তখন বন্দুক রেখে ইজিচেয়ারে সবে হাত পা মেলেছে। ওই চীৎকার শুনে পর পর দুটো গুলিই করে। গুলির শব্দ বাড়ি কাঁপিয়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে। বাড়ির লোকেদেরও ঘুম ভেঙে যায়। হৈ চৈ করে চীৎকার করছে তারা - চোর - চোর - ডাকাত।

প্রতাপ ভাবতেই পারেনি যে তীরে এসে এইভাবে তরী ডুবে যাবে। বাবাতো গুলি চালাচ্ছে, কে জানে বাইরে এসে পড়বে হয়তো। প্রতাপও চকিতের মধ্যে ওই যুঁইলতা ধরে নেমে পড়ে। ঝোপের ওদিকে গুঁড়ি হয়ে দৌড়ে সিধে বাগান থেকে ওর ঘরে ঢুকে সাবধানে দরজা বন্ধ করে চাদর চাপা দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

ওদিকে তখন কিরণ সব লোকজন নিয়ে বাড়ির সমস্ত আলো জ্বেলে ডাকাত ধরতে বের হয়েছে। বিজিতও নেমে এসেছে। এমনিতে ফরেস্ট অফিসার সে। কিরণ বলে ঝিলিককে,

— বৌমা, থানায় ফোন করে মনোজকে বলো।

মিনতিও জেগে উঠেছে। সে রীতিমত ভীত হয়ে বলে,

— ওরে, থানায় যাসনে। আজকালকার চোর-ডাকাতদের কাছে বন্দুক-রিভলবার থাকে।

প্রতাপও এবার বাবার হাঁক ডাক শুনে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বের হয়ে আসে নীচের ঘর থেকে। কিছুই যেন জানে না, এইভাবে জিজ্ঞাসা করে,

— কি হয়েছে?

কিরণ বলে,

— নাক ডাকিয়ে ঘুমোবি আর বাড়িতে ডাকাত এসে প্রাণে মেরে যাবে। বাড়িতে ডাকাত এসেছিল।

ওদিকে সেই যুঁইগাছের নীচেকার ওদিকে ঝোপের মধ্যে একটা রুমাল পড়ে থাকতে দেখে বিজিত তুলে নেয়। কিরণ তার লোকজন অবশ্য জানতে পারেনি ব্যাপারটা।

কিরণ বলে,

— প্রতাপ তুমিও বিজিতদের সঙ্গে বাগানে যাও — হুঁসিয়ার। ব্যাটারা হয়তো সবাই পালাতে পারেনি। ব্যাটারা ধরা পড়বেই।

ততক্ষণে মনোজও ফোন পেয়ে পুলিশ নিয়ে এসে পড়েছে। তারাও বলে,

— এদিক ওদিক খুঁজে চোর ডাকাতের কোন হদিশই পায়নি।

রাত তখন শেষ হয়ে আসছে। কাজের মেয়ে চাও করেছে। মনোজ বলে,

— চোর ডাকাত এলো এখানে?

কিরণ বলে,

— কেন? কেন আসবে না?

— তা আসতে পারে, তবে ওরা এলে কিছুতো চিহ্ন থাকতো। জানলা দরজা ভাঙতো। বাগানে পায়ের ছাপ থাকতো। তেমন তো কিছুই দেখছি না। মানে — ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন টপ্ন দেখে গুলি চালাননি তো?

কিরণ চটে ওঠে,

— সবটাতেই তোমার রসিকতা! আরে দারুণ বুদ্ধি করে আগেই গুলি চালিয়ে ওদের তাড়িয়েছি। এবার তুমি দ্যাখোগে তোমার লোকজন কারো গুলি লেগেছে কিনা। চোর ডাকাত তো তোমরাই। আমি এসেমব্লীতে কোশ্চেন তুলবো তোমাদের নিয়েই।

মিনতি বলে,

— কাক ভোরে তোদের ওসব থামা। চা নে।

প্রতাপ বলে,

— বাবা, সকালেই আমি চলে যাচ্ছি। মর্নিং-এ হাসপাতালে ডিউটি।

মিনতি বলে,

— তাই যা। এ বাড়িতে থেকে শান্তিতে ঘুমোতেও পারবি না। হোস্টেলে যা ভাই। বাড়ি তো নয় যেন চিড়িয়াখানা।

বিজিত তার ঘরে বসে চা খাচ্ছে। ঝিলিক-করুণাও রয়েছে। করুণা বলে,

— ওমা! বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল! কি সাংঘাতিক কান্ড!

বিজিত বলে,

— ডাকাত বাবাজীকে ধরতে পারিনি। তবে একটা জব্বর সূত্র পেয়েছি। এ থেকেই ডাকাতের কিনারা হতে পারে।

পকেট থেকে রুমালটা বার করে। আকাশী রং-এর রুমাল। সুন্দর ভাবে সুতোর কাজ করা। আর একটা ইংরাজী 'পি' অক্ষর লেখা। রুমালটা দেখে ঝিলিক চমকে ওঠে।

— জামাইবাবু, এটা কোথায় পেলেন?

বিজিত দেখছে ঝিলিককে। ঝিলিকের ব্যাকুলতা দেখে এবার প্রশ্ন করে,

— এটা তোমার রুমাল?

— না। এটা ওর। আমিই ওকে দিয়েছিলাম।

বিজিত এবার কোন কথা না বলে বাইরের বারন্দায় যায়। ঝিলিকের ঘরের সামনে দোতালার বারান্দায় সেই যুঁইফুলের লতার গাছটা উঠে গেছে। দেখা যায় তার ডাল পাতা কিছু

ভাঙা। বারন্দায় ছড়িয়ে আছে কিছু ফুল পল্লব। ঝিলিক-করুণাও এসেছে। বিজিত বলে,

— কাল এখানেই সেই ডাকাত দেখেছিলে?

ঝিলিক বলে,

— হ্যাঁ।

বিজিত বলে,

— ঝিলিক, প্রতাপ এত কষ্ট করে দোতালায় উঠে এলো, আর তুমি তাকে রাত দুপুরে ডাকাত বলে তাড়ালে? বেচারা তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে এই রুমালটা পড়ে গেছে। ভাগ্যিস শ্বশুরমশাই বা মনোজ কাকাবাবুর হাতে পড়েনি।

করুণা তার ভাই এর কান্ড দেখে অবাক হয়।

— এসব কি বলছ গো? প্রতাপই তাহলে —

বিজিত বলে,

— এসব কথা কাউকে বলো না। প্রতাপের ফিউচার ফিউজ হয়ে যাবে।

হোস্টেলের পড়ুয়ারাও প্রতাপের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওদের অবশ্য স্বার্থ আছে। প্রতাপ যদি আজকের মিশনে সাক্সেসফুল হয় ওদের একটা জোর খাওয়া হবে। তাই প্রতাপ ফিরতে ওরা ঘিরে ধরে।

— কি হল রে? বর্ডার পার হয়ে কেল্লা ফতে করেছিস তো?

প্রতাপ বলে,

— না। ব্যাড লাক। পরিখা পার হয়েও ঢুকেও গেছিলাম। রাজকন্যার প্রাসাদে যাবার মুখেই হৈ চৈ শুরু হল। যা তোপধ্বনি শুরু হল, কোনমতে প্রাণে বেঁচে ফিরেছি ধরা পড়তে পড়তে।

দানবন্ধু বলে,

— দুর ব্যাটা! তোর দ্বারা কিস্‌সু হবে না। আগে থেকে বলে রাখবি তো।

সুনীল বলে,

— ঠিক আছে। নেক্সট রবিবার আট্‌ঘাট্‌ বেঁধে ট্রাই করবি।

এমন সময় বিজিত আসে হোস্টেলে। প্রতাপকে বলে বিজিত,

— ভায়া, তোমার একটা জিনিস ফেরৎ দিতে এসেছি। এই নাও। পালাতে গিয়ে এই চিহ্নটা ফেলে এসেছিলে।

রুমালটা এগিয়ে দেয়। প্রতাপও অবাক হয়। এবার সুনীল — দীনবন্ধুরা বলে,

— বিজিতদা, বেচারার একটা গতি করুন। বছর পার হয়ে গেল বেচারার বিয়ে হয়েছে, একদিনের জন্যও বৌকে কাছে পেল না।

বিজিতও ভাবছে কথাটা। বাড়ি ফিরেছে সে। মিনতি শুধোয়,

— প্রতাপের সঙ্গে দেখা হলো ?

বিজিত দেখা করে এসেছে। আজ তার সঙ্গে বিশদ আলোচনাও করে এসেছে বিজিত। অবশ্য সেসব কথা ঠাক্‌মাকে জানায় না। বিজিত বলে,

— হ্যাঁ।

বিজিত করুণার মধ্যে কথা হয়েছে এ নিয়ে। করুণাকে সব কথা খুলে বলে। করুণা তার ফরেস্ট বাংলোতে একাই থাকে। সুন্দর জায়গা। সামনে সুবর্ণরেখার বালুচর। ওপারে পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত। চারিদিক বন পাহাড়ে ঘেরা।

করুণা বলে কিরণকে,

— বাবা, ঝিলিক তো বাড়িতে একাই রয়েছে। আমিও বাংলোয় একা থাকি। ঝিলিককে কদিনের জন্য নিয়ে যাই ওখানে, ওর ভালো লাগবে। আর তুমিও এসেমব্লীর মিটিং - এর জন্য কলকাতায় থাকবে প্রায় দশ পনের দিন। সে কদিন ঝিলিক আমার কাছে থাকবে। তুমি ফিরলে আবার পৌছে দিয়ে যাবে তোমার জামাই।

মিনতিও ঝিলিকের কাছে নিজেকে অপরাধী বলে মনে করে। বিয়ের পর থেকে স্বামীর সান্নিধ্য পায়নি সে। মিনতিও বলে,

— কিরণ, করুণা যখন এত করে বলছে, ঝিলিক ওখানে গিয়ে থাকুক কয়েকদিনের জন্য।

কিরণ বলে,

— তোমার আসুবিধা হবে।

মিনতি বলে,

— না না। এরা সব রয়েছে। কদিন এরাই চালিয়ে নেবে। কদিন বাইরে ঘরে আসুক ঝিলিক।

বিজিতকে বলে,

— তাই হোক। আমিই দিন দশেক পরে পৌছে দিয়ে যাব ঠাকুমা।

কিরণ তার ডায়েরী দেখে বলে,

— আমিও কাল থেকে দিন দশেক কলকাতায় থাকবো। তাহলে কালই তোমরা বের হয়ে পড়ো ঝিলিককে নিয়ে। তবে দশদিনের মাথায় পৌছে দিয়ে যাবে।

বিজিত বলে,

— ওর জন্য ভাববেন না। আমি ঠিক সময়মত জানিয়ে দেব।

ফরেস্ট কলোনীটা শহরের বাইরে। সামনেই সুবর্ণরেখার বিস্তার। রূপালী বালুচরের

বুকে বয়ে চলেছে সুবর্ণরেখার জলধারা। এখন শীতের দিন। তাই নদীর জলও কম। ওদিকে উঠে গেছে তাম্রাভ পাহাড় এর সীমারেখা। এদিকেই দেখা যায় ফুলডুংরি পাহাড়। ওদের বুকে অরণ্যের ছায়া।

বাংলোর চারপাশে রয়েছে বেশ কিছু পুরানো শাল, মহুয়া, পিয়াল গাছের জটলা। স্টেশন থেকে আসতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। ঝিলিকের প্রথম বার এমন পাহাড় বন অঞ্চলে আসা। আজ সে ওই বাড়ির বন্দীদশা থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। দেখছে সে দুই চোখ মেলে ওই নতুন জগৎকে।

ঝিলিক বলে,

— চমৎকার জায়গা।

বিজিত হেসে বলে,

— আরও চমৎকার লাগবে।

বিজিত আগেই প্রতাপকে সব খবর দিয়ে এসেছিল। ওরা বেরিয়ে আসার পরেই প্রতাপ দশটার ট্রেনে রওনা হয়ে যায়। ওই ট্রেনটা ঘাটশিলা স্টেশনে পৌছাবে বেলা চারটার পরই। বিজিত বিকালে করুণা-ঝিলিককে মার্কেটে নামিয়ে দিয়ে সোজা গাড়ি নিয়ে স্টেশনে চলে এসেছে। যথাসময়ে ট্রেন ইন করে আর প্রতাপও এসে পৌছায় ঘাটশিলায়। এর আগেও প্রতাপ দুএকবার দিদি জামাইবাবুর কোয়ার্টরে এসেছে। জায়গাটা তার চেন। একটা রিক্সা নিয়েই চলে যেতে যাবে, দেখে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বিজিত।

— আপনি?

বিজিত বলে,

— ওয়েলকাম টু ঘাটশিলা ব্রাদার।

প্রতাপ এদিক ওদিক দেখে বলে,

— দিদিকে দেখছি না?

বিজিত বলে,

— সব ঠিকঠাক আছে ব্রাদার। চলো, তোমাকে কোয়ার্টারে ছেড়ে দিয়ে আসি। ওনাদের কেউ তোমার আগমনের কথা জানে না। একটা সারপ্রাইজ দেব ওদের। ওঠো গাড়িতে।

শূন্য কোয়ার্টারের সামনে গাড়িটা এসে হাজির হয়। প্রতাপ অবাক হয়,

— কেউ তো নেই!

বিজিত বলে,

— এত অধৈর্য হচ্ছো কেন ব্রাদার? কেষ্ট পেতে গেলে একটু কষ্ট করতে হয়। বসো, বেয়ারা চা দিচ্ছে। আমি ঘুরে আসি।

করুণা-ঝিলিক বাজার সেরে মালপত্র নিয়ে একটা রেস্তোরায় বসে অপেক্ষা করছে। বিজিতের দেখা নেই। চারিদিকে লোজনের আনাগোনা। ছোট শহর। তবু লোকজন কম নেই। বাজারও বেশ জমজমাট। ঝিলিক বলে,

— জামাইবাবু গেল কোথায়?

করুণা বিরক্তিভরে বলে,

— কে জানে! কোন বন্ধুকে পেয়ে হয়তো আড্ডায় জমে গেছে। ওকে নিয়ে হয়েছে আমার বিপদ।

হঠাৎ দেখা যায় হন্তদন্ত হয়ে আসছে বিজিত জিপ নিয়ে।

করুণা বলে,

— এতক্ষণ কোথায় আড্ডা মারছিলে? ঝিলিক কত ভাবছে।

— আর তুমি? তুমি অবশ্য আমার জন্য আর ভাবোই না।

বিজিতের কথায় করুণা বলে,

— তা সত্যি! যা শুরু করেছো।

ওরা মালপত্র তুলে বের হয়ে যায় শহর থেকে।

প্রতাপ একাই বসে আছে লাউঞ্জে। বিকালের সূর্য পাহাড়ের কোলে বসে পড়েছে। তার দেখা আর পাওয়া যায় না, তবে পাহাড় বনের সবুজ শেষ সূর্যের আলোর খেলা চলছে। খবর গেছে পাখীদের কাছে যে, তাদের ঘরে ফেরার সময় হয়ে গেছে। তারা দল বেঁধে তাদের ঠিকানায় ফিরছে। প্রতাপ একা বসে প্রকৃতির এই সুন্দর রূপ দেখছে। ওদিক থেকে জিপটাকে এসে থামতে দেখে চাইল। নামছে করুণা-ঝিলিক। প্রতাপকে বসে থাকতে দেখে ওরা অবাক হয়। প্রতাপও এগিয়ে আসে।

— দিদি!

ঝিলিক এই পড়ন্ত বেলায় সূর্যের লালাভ আলোর সামনে প্রতাপকে দেখে। খুশীতে ফেটে পড়ে। তবে তার উচ্ছ্বাসটা তখন চেপে রাখে ঝিলিক।

করুণা প্রতাপকে বলে,

— কখন এলি?

— এই তো সাড়ে চারটের ট্রেনে। তোকে কিছু বলেনি জামাইবাবু?

করুণা বুঝেছে বিজিত তাকে না জানিয়েই প্রতাপকে এখানে এনেছে। করুণা ম্লান হেসে বলে,

— ভিতরে আয়।

ওরা সবাই ভিতরে যায়।

এবার প্রতাপ আর ঝিলিক দুজনে রয়েছে ঘরে। ঝিলিক দেখছে প্রতাপকে। প্রতাপের মনে ঝড় ওঠে। সে আজ এতদিনের প্রতীক্ষার পর ঝিলিককে কাছে পেয়েছে। বিনা দ্বিধায় দুজনে আজ দুজনের কাছে আসে। এখন তাদের জীবনের একটি স্মরণীয় মুহূর্ত।

করুণা পাশের ঘরে বিজিতকে বলে চাপা গলায়,

— এটা কি করলে? বাবা যদি জানতে পারে তাহলে কি হবে জানো?

বিজিত বলে,

— বা রে! ওখানে তুমিই বলেছিলে, বাবা খুব অন্যায় করছেন। ওদের উপর অবিচার করছেন। একটা কিছু করো। আমিই তাই প্ল্যান করে ওদের কাছাকাছি আসার সুযোগ করে দিলাম। আর তাই দোষ হল আমার?

করুণা বলে,

— না। তা বলছি না। তবে কাজটা কি ঠিক হলো?

বিজিত বলে,

— এখন ওসব ভাবার কিছু নেই। আরে বাবা, বেআইনি কাজতো কিছু করিনি। তার জন্য তোমার বাবা যদি আমাকে গুলি করেন — করুন। তার মেয়েই বিধবা হবে।

তারপরই গলা তুলে বিজিত বলে,

—কি প্রতাপ-ঝিলিক কফি খাবে তো? হট কফি উইথ পকোড়া।

লবঙ্গলতিকার জীবনের উপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। বাবা কালীপদ বাবুর আমল থেকেই লবঙ্গ তার জেদ অহংকার সম্বল করে এগিয়েছে। বাবার টাকার অভাব ছিল না। প্রচুর রোজগার করেছেন তিনি। লবঙ্গকেও আইন পাশ করিয়ে কোর্টে তারও একটা ভালো পরিচিতি এনে দেন তিনি। লবঙ্গের ওই বিশাল দেহ তার সতেজ কণ্ঠস্বর আর রণংদেহী ভাবটা প্রতিপক্ষের উকিলদের বাকরোধ করে দিত। এমন কি জজসাহেবও বারের ওই একমাত্র মহিলা উকিলকে সমীহ করতেন। ফলে চারপাশ থেকে তার কাছে লোক আসতে থাকে। লবঙ্গ সেদিন থেকে সফল। তাই তার প্রতাপ আরো বেড়েছিল। নিজের মেয়েকেও সে ভেবেছিল পাশ করিয়ে ওকালতি পড়াবে। সেইমত ঝিলিককে তৈরী করতে চেয়েছিল লবঙ্গ। সেই সঙ্গে তার স্বপ্ন ছিল একবার এম-এল-এ হতে পারলে মন্ত্রী হতে পারবে লেডিজ কোটায়। কিন্তু কিরণ তার সব আশায় জল ঢেলে দিয়েছে। প্রথমেই তার মেয়ে ঝিলিককে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। ঝিলিক এখন কিরণের পুত্রবধু। ঝিলিক মায়ের কাছে এখন শত্রুপক্ষ। আর সবচেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছে ভোটের লড়াইয়ে হেরে গিয়ে। কেশবও আসে। সে বলে,

— লবঙ্গ, রাজনীতির লড়াইয়ে হার জিত আছেই, এবার জিতেছে কিরণ, সামনের বারে তুমি নিশ্চয়ই জিতবে। এখন থেকেই তার প্রস্তুতি নিতে হবে। আর চঞ্চলদের অভাব নেই। এক চঞ্চল গেছে, দশটা চঞ্চল তৈরী হয়েছে। রাজনীতির নেতারাই চঞ্চলদের গড়ে তোলে। সামনের বারে তুমি জিতবেই।

লবঙ্গ তবু ভুলতে পারে না সেই জ্বালাটা। ওর স্বামী নিখিলও আসে। এখন সেও খুশী হয়েছে। ঝিলিক ঠিক কাজই করেছে। লবঙ্গের হাত থেকে বের হয়ে এখন কিরণ বাবুর ঘরে গেছে ঝিলিক।

নিখিল মাঝে মাঝে মেয়েকেও দেখতে যায়। কিরণবাবু, মিনতি দেবীও নিখিলকে তাদের আত্মীয়ের সম্মান দেয়। নিখিল লবঙ্গের কাছেও আসে। সন্ধ্যার পর কোর্ট থেকে ফিরে এখন ঠাকুরের ছবিতে ধূপ ধূনো দেয় প্রণাম করে। নিখিলও দেখে ব্যাপারটা। তার মনে হয় লবঙ্গও যেন কোথায় নিজের কাছে হেরে গেছে। তাই ঠাকুরের কাছে কৃপাপ্রার্থী। মনটা হয়তো কিছুটা নরম হতে চলেছে। সে পাশের ঘর থেকে দেখে ব্যাপারটা।

সেদিন নিখিল বলে,

— ঝিলিককে তুমি বের করে দিয়েছ?

অন্য দিন হলে লবঙ্গ ফুঁসে উঠতো। আজ লবঙ্গ ঠাকুরের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ধূপ জ্বলছে। ঠাকুরের ছবিতে ফুলের মালার সুবাস মিশছে ধূপের সুগন্ধের সঙ্গে। লবঙ্গের মনে হয় ঠাকুরের মুখে মিষ্টি হাসির আভা। আজ তার মনে হয় এতদিন ধরে লড়াই করেছে, প্রতিযোগীতা করতে গিয়ে তাব জীবন থেকে শান্তিই হারিয়েছে। মুছে ফেলেছিল তার মন থেকে স্নেহ, ভালোবাসা, কর্তব্য সবকিছুকেই। আজ সে ক্লান্ত পরাজিত। তাই সে নতুন করে বিচার করছে তার অতীতের কথাগুলোকে। মনে হয় অনেক ভুলই করেছে সে। বঞ্চিত করেছে সে নিজেকে পদে পদে।

নিখিলের ওই কথায় আজ সে ফুঁসে ওঠে না। চুপ করে থাকে। নিখিল দেখছে যেন নতুন এক লবঙ্গকে। পাশের মন্দিরে কোথাও শাঁখ ঘন্টা বাজে। দেবীর আরতি শুরু হয়েছে। লবঙ্গও সেই দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়।

প্রতাপ-ঝিলিকও আজ নতুন করে যেন এই সুন্দর জগৎটাকে দেখছে। বিয়ে হয়েছিল তাদের। কিন্তু ফুলশয্যার সেই মধুর স্বপ্নময় রাত তাদের জীবনে আসেনি। সেই রাতের কথা আজও প্রতাপ ভোলেনি। বাবা তার ঘাড়ে বন্দুক চাপিয়ে পাহারাদারি করিয়েছিল।

আজ তাদের জীবনে এসেছে বিয়ের অনেক দিন পর ফুলশয্যার রাত্রি। আজ তার দুজনে এসেছে বুরুডির ফরেস্ট বাংলোয়। এই সুন্দর পাহাড় বন ঘেরা পরিবেশে দুজন

দুজনকে কাছে পেয়েছে। এই খুশীর মুহূর্তে ঝিলিক তবু বলে প্রতাপকে,

— এ্যাই! পড়াশোনা ঠিকমত করছ তো? সামনেই ডাক্তারী পরীক্ষা।

প্রতাপ ঝিলিককে কাছে টেনে নিয়ে বলে,

— ওর জন্য ভেব না। আর কটা মাস — পরীক্ষা হলে বাঁচি। আর তার জন্যে আমিও তৈরী। তোমাকে কাছে পাবার জন্য আমাকে ভালো ভাবে পাশ করতেই হবে।

পূর্ণিমার রাত। লেকের জল চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। দূরে কোন আদিবাসী বস্তি থেকে বাঁশীর সুর ভেসে আসে। এই রাতে আজ ঝিলিকও নিঃশেষে আত্মনিয়োগ করে। দুটি দেহ — দুটি মন পূর্ণিমার এই চাঁদ এই প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে তাদের ফুলশয্যার মধুর রাত্রি যাপন করে।

কটা দিন ওদের কেটে যায় স্বপ্নের মধ্যে। সব অন্ধকার রাত্রির যেমন শেষ আছে, সব আলো ঝলমল দিনগুলো দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যায়।

কিরণ তখন কলকাতায়। সে এসেছে বিধানসভার অধিবেশনে। স্বাস্থ্য পরিসেবা নিয়ে তার এলাকায় নানা সমস্যা আছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতেও দেখেছে কিরণ। সেখানের ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছে। তার মনে হয়েছে সামান্য পরিকাঠামোর উন্নতি করতে পারলে জনসাধারণের উপকার করা যাবে।

কিরণ এবার বিধান সভায় গ্রামীণ স্বাস্থ্যপরিসেবা পরিকাঠামো এসব বিষয় নিয়ে প্রস্তাব দেয়। তার আলোচনা প্রস্তাব উপস্থিত সাংবাদিকদের ভালো লাগে। তারাও বিষয়টাকে বিশদভাবে কাগজে লেখে। জনসাধারণের মধ্যে — সরকারী মহলেও বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হয়।

কিরণ প্রথম থেকেই বিধানসভায় তার বেশ কিছুটা প্রাধান্যের পরিচয় দেয়। অবশ্য এত কাজের মধ্যেও কিরণ তার বাড়ির কথা ভোলেনি। মাকে ফোন করে। আর ঝিলিকের খবরও নেয়। বিজিত বলে ফোনে,

— ঝিলিক ভালোই আছে। কালই আমি ওকে পৌছে দিচ্ছি।

ফোন রেখে বিজিত প্রতাপকে বলে,

— ব্রাদার, অদ্য শেষ রজনী। কাল ভোরের ট্রেনেই ফিরতে হবে। স্টেশনে নেমে তুমি ফিরবে হোস্টেলে আর আমি ঝিলিককে বাড়িতে পৌছে দেব। তোমার পিতাশ্রীর হাতে চার্জ হ্যান্ডওভার করে আমি ব্যাক টু প্যাভেলিয়ান। তবে খুব সাবধান। এই কদিনের কথা যেন তোমার বাবা জানতে না পারে। হুঁসিয়ার।

প্রতাপ যথারীতি হোস্টেলে ফিরেছে। ক'মাস পরেই পরীক্ষা। এবার প্রতাপ মন

দিয়ে পড়াশোনা করে। এমনিতে সে মেধাবী। তবু প্রতাপের মনে হয় ঝিলিক যেন তাকে আরো ভালো ফল করতে অনুপ্রাণিত করেছে। সুনীল, দীনবন্ধুরা বলে,

— ব্যাটা চুপি চুপি হনিমুন সেরে এলি, আমাদের খাওয়াতে হবে। না হলে দেব সব তোর হেড কোয়ার্টারে ফাঁস করে।

প্রতাপ বলে,

— ওটা করো না ভাই। বাবা হয়তো গুলিই করে দেবে। বরং চলো আজ সন্ধ্যায় রেস্তোরায় পার্টি দেব।

প্রতাপ তার কথামত বন্ধুদের নামী হোটেলে ভুরিভোজ করায়।

ওদিকে মিনতিও ঝিলিকের ফেরার অপেক্ষা করে আছে। কদিনের মধ্যেই সে এ বাড়ির নয়নের মণি হয়ে গেছে। কদিন ছিল না মেয়েটা। মিনতি তার কথাই ভেবেছে। আর এবার ঝিলিক ফিরতেই ঠাক্‌মা তাকে কাছে টেনে নেয়। কয়েকদিনের মধ্যেই ঝিলিক যেন অনেকটা বদলে গেছে। ওর চোখে মুখে কি পরম পাবার খুশীর উচ্ছ্বাস। আর সেটা মিনতির চোখ এড়ায় না। বলে মিনতি,

— কদিন বাইরে বেশ আনন্দেই ছিলি নারে ঝিলিক?

ঝিলিক তার আসল আনন্দের খবরটা ঠাক্‌মাকে জানাতে পারে না। বলে,

— হ্যাঁ, ঠাক্‌মা, দিদি জামাইবাবু খুব আদর যত্ন করেছে।

কিরণও এসে পড়ে কলকাতা থেকে। মিনতি বলে,

— কদিন আসেনি প্রতাপ, ওকে আসতে বল।

প্রতাপ এসেছে সেদিন বাড়িতে। এখন তার সাহসও বেড়ে গেছে। কিরণ অবশ্য যথারীতি তার দিকে নজর রেখেছে। এর মধ্যে প্রতাপ কাজের ছেলের হাত দিয়ে চিরকুট পাঠিয়েছে ঝিলিককে। প্রতাপ এবার আটঘাট বেঁধেই নামবে। দোতালায় ওঠা নামার পথটা দেখে নেয় একবার। সেই যুঁইলতা তার ডালপালা বি[illegible] করে উঠে গেছে উপর দিকে। আর ঝিলিককে এবার আগাম নোটিশও দেওয়া হয়ে গেছে।

কিরণ দেখে প্রতাপ এবার আর উপরে যাবার চেষ্টাও করে না। এর মধ্যেই পড়ার ঘরে বসে পড়াও শুরু করেছে। বাবার কাছে মেডিসিনের ব্যাপারে দু - একটা পয়েন্টও জেনে নেয়।

কিরণ আজ নিশ্চিন্ত। প্রতাপ বিকালে বেরিয়ে গেছে। কিরণও শহরে তার অফিসে গিয়ে কিছু কাজকর্ম সেরে রাত্রে ফেরে। খাওয়া দাওয়ার পর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে সে। মিনতিও পুজা পাঠ সেরে দুধ খই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘুম আসে না ঝিলিকের। সে দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছে। তার ভয় হয়। বাবা যদি জানতে পারে। প্রতাপকে

এভাবে আসতে নিষেধ করতো, কিন্তু সে সময় সুযোগ পায়নি সে।

স্তব্ধ রাত্রি। প্রতাপ আজ এসেছে অভিসারে। ওদিকের পাচীলের ধারের ডালটা ধরে সহজেই বাগানে আসে। বাগানের দিকটা তখন অন্ধকার। পথের আলোগুলোও দুরে। সন্তর্পণে এগিয়ে আসে বাড়ির দিকে। যুঁইলতার ডালটা ধরে উপরে উঠছে নিঃশব্দে। ঝিলিকও বারন্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। দেখছে সে প্রতাপ দোতালায় উঠে আসছে। ঝিলিক কি বলতে যাবে, প্রতাপ ইশারায় ওকে চুপ করতে বলে ভিতরে আসে। ঝিলিক চাপা স্বরে বলে,

— এভাবে এসো না। বরং আমি যখন বাড়ি যাবো তুমি বিকালে চলে আসবে। সন্ধ্যার পর ফিরে যাবে।

প্রতাপ চেনে নিখিল বাবুর বাড়ি। বাড়িটা প্রায় খালিই পড়ে থাকে। প্রতাপ বলে,

— তা হলে এই শনিবারই এসো ওখানে।

মিনতির ঘুম কমে গেছে। রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়। হঠাৎ ঝিলিকের ঘরে কার কথার ফিস্‌ফিস্ শব্দ শুনে চমকে ওঠে মিনতি। এত রাতে ঝিলিক কার সঙ্গে কথা বলছে! মিনতি উঠে পড়ে। তার মনে হয় কেউ যেন এসেছে। সশব্দে দরজা খুলে মিনতি বের হয়।

প্রতাপকে ফিরতে হবে। সেও বের হয়ে এসেছে। আর এই সময়ই মিনতি বের হয়। ঝিলিক অস্ফুট কণ্ঠে বলে,

— ঠাক্‌মা! এই —

প্রতাপও দেখেছে ঠাকমাকে। রাতে যে ঠাক্‌মা বের হয়ে আসবে তা ভাবেনি সে! হাতে নাতে ধরা পড়ে যাবে। প্রতাপও সেই ঘুঁইলতাকে অবলম্বন করে নিমেষের মধ্যে বাগানে নেমে যায়। লতাটা ডালপালা ফুল সমেত ভেঙে ওঠে। মিনতিও এগিয়ে আসে।

— কে? কে যেন নেমে গেল ঝিলিক?

ঠাক্‌মা ছানি পড়া চোখে স্পষ্ট দেখতে পায়না মূর্তিটাকে। তবে বারান্দায় মূর্তির পিছনটাকে দেখেছে মাত্র।

ঝিলিক বলে, কই? কেউ নাতো!

— ডালপালা গুলো পড়ে আছে? সন্দেহের স্বরে বলে ঠাক্‌মা।

ঝিলিক বলে,

— দমকা হাওয়া দিচ্ছে তাই পড়ে আছে। আমিও বের হয়ে এসেছি ডালপালা নড়ার শব্দে।

ওদের কথাবার্তা শুনে ওদিকের ঘর থেকে কিরণ বের হয়ে আসে। হাতে বন্দুক। সেও দেখছে এদিক ওদিক। বাগান অন্ধকার। অবশ্য প্রতাপ তখন ডালধরে বাগানের পাচিল পার হয়ে গেছে। মিনতি বলে,

— মনে হল কে যেন বেরিয়ে গেল ওই লতা ধরে।

কিরণও দেখছে — দুচারটে ফুল পাতা পড়ে আছে বারান্দায়।

কিরণ বলে — হুঁ। এর আগেও একদিন ওই লতা ধরে ডাকাত ওঠার চেষ্টা করেছিল। আজ আবার সেই চোরটা। কালই এর বিহিত করছি। এখন শোও গে। আমি রাম সিং- দের সজাগ থাকতে বলছি।

ঝিলিক বলে — যাও ঠাক্‌মা — শুয়ে পড়ো।

ঝিলিক ওর ঘরে চলে যায়। মিনতির চোখের সামনে সেই আবছা একটা ছেলের পিছনদিকটা ফুটে উঠেছে। তবে কি ঝিলিক তাকে মিথ্যা কথাই বলেছে! মিনতির মনে যেন একটা সন্দেহের কালো ছায়া ঘনিয়ে আসে।

কিরণ পরদিন লোক লাগিয়ে এতদিনের জুঁই লতার গাছটাছ গোড়া থেকে কেটে নির্মূল করে দেয়। মনোজও এসেছে। মিনতিও রয়েছে। কিরণ তখন গাছ কাটার তদারকি করছে। মনোজ বলে,

— একি! এতদিনের সাধের গাছটা কেটে ফেলছো?

কিরণ বলে,

— কাল রাতে আবার চোরটা এসেছিল। ওই লতা ধরেই দোতলার বারান্দায় উঠেছিল। নেহাৎ মা জেগে উঠতে ব্যাটা আবার ওই লতা ধরেই নেমে পালিয়েছে।

মনোজ বলে,

— এত বাড়ি থাকতে চোর বেছে বেছে কেন তোমার বাড়িতেই হানা দেয় কেন?

— তোমাদের লোকজন নাকে তেল দিয়ে ঘুমায় তাই। এবার সম্বন্ধী বলে ছাড়বো না। তোমাদের নামে বিধানসভায় মুলতুবী প্রস্তাবই আনবো।

মিনতি বলে,

— চোরের ব্যাপারে কিছু করিস বাবা!

অবশ্য ফোনে চোরের কাছে এই খবর পৌঁছে গেছে যে তার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। ঝিলিকই ফোন করে প্রতাপকে সংবাদটা দেয়। প্রতাপ সমস্ত ঘটনাটা শুনে হাসতে থাকে। ঝিলিক বলে,

— তুমি হাসছ। আমার অবস্থাটা বোঝ একবার! এভাবে আর এসো না।

প্রতাপ বলে,

— ঠিক আছে। এই শনিবার মন্দিরে পূজো দিতে যাচ্ছো বলে তোমার বাবার ওখানে এসো। সামনের সপ্তাহ থেকে পরীক্ষা শুরু। তখন আর দেখা হবে না।

মিনতি দেবী সেই আবছা দৃশ্যটা কিছুতেই ভুলতে পারে না। তার মনে হয় একটা ছেলেকেই সে দেখছিল ঝিলিকের ঘর থেকে বের হতে। ঝিলিকও সঙ্গে ছিল। তাদের ফিসফিস কথার শব্দও শুনেছে সে। আর ঝিলিকও মিনতিকে দেখেই ভাগিয়ে দিয়েছে।

এ বাড়িতে এইভাবে আগেও একজন এসেছিল বলেই মনে হয় মিনতির। আর সে আসে ঝিলিকের ঘরেই। ওই মেয়েটাকে এতদিন মিনতি বুকে করে রেখেছিল। আজ মনে হয় ঝিলিক তাকেও ঠকিয়েছে।

শনিবার ঝিলিকও প্রতাপের কথামত তার বাবার বাড়িতে এসেছে। প্রতাপও চলে আসে। ঝিলিক বলে,

— এইভাবে লুকোচুরি খেলছি। ঠাক্‌মা তো রীতিমত সন্দেহ করছে আমাকে।

প্রতাপ তৈরী হয়েই এসেছিল। একটা ব্যাগ থেকে হোস্টেলের সেই দড়িটাও এনেছে। ঝিলিককে বলে,

— এটা তোমার ঘরে রেখে দাও। রাতের বেলায় তিনবার পাখির ডাক শুনে বাইরে এসে আমাকে ঝোপের ধারে দেখতে পেলে দড়িটা রেলিং-এ বেঁধে দেবে। ব্যস্ উঠে যাবো। আর চলে গেলে এটা খুলে দেবে। ঝিলিক বলে,

— আমার বড্ড ভয় করছে। ঠাক্‌মা যদি দেখে ফেলে।'

প্রতাপ অভয় দিয়ে বলে — ঠাক্‌মা টেরই পাবে না,

বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। ওদের ফিরতে হবে,

— চলো, তোমাকে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে বড় রাস্তা থেকে আমি রিক্‌সা নিয়ে হোস্টেলে চলে যাবো।

মিনতির শরীরটা কদিন ভালো যাচ্ছে না। তাই ঝিলিকই মন্দিরে যায়। আজ যেন তার মন্দিরে যাবার আগ্রহটা বেশী আর সেটা মিনতির নজর এড়ায় না। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। তখনও ঝিলিক ফেরেনি। কিরণ তার চেম্বারে। সে জানেনা ঝিলিক বেরিয়েছে। সে পছন্দও করে না ঝিলিক যখন তখন বাইরে যায়। তাই কিরণ জানতে পারলে অশান্তি করবে। মিনতিও চিন্তিত। শেষ অবধি রিক্‌সা নিয়ে নিজেই বের হয়।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে। রোড ল্যাম্পের আলো তেমন জোরালো নয়। প্রতাপ ঝিলিক আসছে। প্রতাপ উজ্জ্বল খুশীতে কথা বলছে। ঝিলিক কিন্তু রাস্তার দিকে নজর রেখেছে। সে মন্দিরে এসে ডালাটা নিয়ে চলে যাবে, প্রতাপও চলে যাবে অন্যদিকে। হঠাৎ ঝিলিক বলে,

— প্রতাপ, ঠাক্‌মা আসছে।

— মিনতিও রিক্‌সা থেকে আবছা আলোয় দেখে একটা মেয়ের পাশ থেকে একটা ছেলে যেন পালিয়ে গলির মধ্যে ঢুকে গেল। মিনতি আরও অবাক হয়, মেয়েটা কাছে আসতেই দেখে ঝিলিক। ঝিলিক এগিয়ে এসে বলে,

— ঠাক্‌মা, আপনি আবার এলেন কেন? আমিতো যাচ্ছিলাম।

— মিনতি বলে,

— তোমার সঙ্গে কে কথা বলছিল?

ঝিলিক চমকে ওঠে। তারপর বলে,

— কই না তো! পথ দিয়ে আর কেউ যাচ্ছিল তাদের দেখেছেন।

ঝিলিক ওই প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য বলে,

— চলুন, মন্দিরে আরতি শুরু হয়ে গেছে।

ঝিলিকই ঠাক্‌মাকে নিয়ে যায় মন্দিরে।

কিরণবাবু এখন খুবই ব্যস্ত মানুষ। সকালে রোগী দেখতে দেখতে বেলা হয়ে যায়। বিকালে আবার জনসংযোগ সরকারী মহলে যোগযোগ করেন। তবে সবকাজের মধ্যে নজর রাখে ঝিলিক আর প্রতাপের উপর। এখন প্রতাপের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। তাই কিরণ খানিকটা নিশ্চিন্ত। এই মাসে বিধান সভার বিশেষ অধিবেশনও সেরে এসেছেন। এখন এদিকের কাজ নিয়েই ব্যস্ত কিরণ।

লবঙ্গলতিকা লড়াই করে এখন যেন কিছুটা ক্লান্ত। তার স্বামী নিখিলও আসে মাঝে মাঝে। সেও চায় লবঙ্গ তার অতীতকে ভুলে তার মেয়ে জামাইকে কাছে টেনে নিক। লবঙ্গও কথাটা এবার ভাবছে। এখন শহর শান্ত। ভোটের সেই মন কষাকষি নেই। লবঙ্গও এখন কেশববাবুর কথা ভাবে। ওই লোকটার জন্য সে ঝিলিকের সর্বনাশ করতে গেছিল। নবু ভটচাযও তার সর্বনাশ করতে গেছিল। এখন মনে হয় তারাই লবঙ্গকে অহেতুক উত্তেজিত করেছিল। আজ মনে হয় সেদিন ঝিলিককে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে ঠিক করেনি।

সেদিন প্রতাপ — ঝিলিক এসেছে নিখিলের বাড়িতে। পরীক্ষা প্রায় শেষ প্রতাপের। সে এবার তার বন্দীদশা কবে শেষ হবে সেই দিন গুনছে। আবার সে বাড়িতে ফিরে যাবে। তবু ক্ষণিকের সান্নিধ্যের জন্যই প্রতাপ আসে নিখিলবাবুর বাড়িতে। ঝিলিকও আসে। ওদের মধ্যে কথা হয়। ঝিলিক বলে, তুমি বাড়ি ফিরে এলে আবার আমরা ঘাটশিলায় যাবো।

প্রতাপ বলে,

— না — না, পুরীতে যাবো।

হঠাৎ এমন সময় দরজা খুলে লবঙ্গকে দেখে চুপ করে যায় ওরা। প্রতাপ রীতিমত চমকে ওঠে। অথচ পালাবার পথও নেই। মহিলা বোধহয় সঙ্গে অ্যালসেশিয়ানটাও এনেছে। হয়তো ওটাকেই প্রতাপের দিকে ছেড়ে দেবে। ধারালো দাঁত দিয়ে কুকুরটা প্রতাপকে ফালা ফালা করে দেবে। ঝিলিকও মাকে দেখছে। আরও অবাক হয় মায়ের হাতে একটা প্যাকেট দেখে। ঝিলিক তবু মাকে প্রণাম করে। দেখাদেখি প্রতাপও প্রণাম করে। লবঙ্গ দেখছে মেয়েকে। প্রতাপের পাশে চমৎকার মানিয়েছে। লবঙ্গ ঝিলিককে কাছে টেনে নেয়। ঝিলিক মায়ের বুকে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

— মা - মাগো।

লবঙ্গের চোখে জল নামে। এতদিন পর আজ সে তার মেয়েকে ফিরে পেয়েছে। ঝিলিক বলে,

— তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি মা। আমাকে ক্ষমা করো।

লবঙ্গ বলে,

— নারে! দুঃখ আমিও তোকে কম দিইনি। কি যে হয়েছিল আমার! আজ সেই ভুল ভেঙেছে। তাইতো তোদের কাছে ছুটে এসেছি। প্রতাপ - তুমিও আমাকে হয়তো ভুল বুঝেছ!

আজ লবঙ্গ যেন তার সব কিছু ফিরে পেতে চায়। সংঘাতের মধ্যে দিয়ে নয় - শান্তির মধ্যে দিয়ে লবঙ্গ কিরণবাবুর সঙ্গে তার ঝগড়াটার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চায়।

কিরণবাবু কলকাতা থেকে ফেরার পর কলকাতার নেতারা তার প্রস্তাবগুলো নিয়ে এবার চিন্তাভাবনা শুরু করে। গ্রামের স্বাস্থ্য পরিসেবা নিয়েও নানা পরিকল্পনা হয়। গ্রামের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো যাতে আবার নতুন করে প্রাণ পায় সেদিকেও নজর দেওয়া হবে। কিরণও তাই এসব কাজে ব্যস্ত।

সেদিন মিনতি হঠাৎ চমকে ওঠে। দেখে ঝিলিক বেসিনে বমি করছে। চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে। খালি ওয়াক্ ওয়াক্ করছে। কিছুই ওঠে না।

— কি হল রে! বমি করছিস?

ঝিলিক বলে,

— ও কিছু না ঠাক্‌মা। কাল অতটা ধোকার তরকারী খেয়েছি, তাই কেমন অম্বল মত করেছে?

ডাক্তারের বাড়ি। হজমের ওষুধ — টুকটাক ওষুধ হাতের কাছেই আছে। ঠাক্‌মা বলে,

— দুটো ট্যাবলেট খেয়ে নে। নাহলে বলি কিরণকে -

ঝিলিক বলে,

— ওসব কিছু না ঠাক্‌মা। ওষুধপত্র লাগবে না। ঠিক হয়ে যাবে।

ঝিলিক চলে যায় তার ঘরে।

মিনতি দেবী ভাবছে কথাটা। ঝিলিকের শরীরটা কদিন ভালো যাচ্ছে না, তা দেখে মিনতি। তার খাওয়া দাওয়া কমে গেছে। কিছুদিন ধরে ঝিলিকের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছে মিনতি।

মিনতির হঠাৎ মনে পড়ে সেই রাতের কথা। একজন কাকে যেন ঝিলিকের ঘর থেকে বেরিয়ে পালাতে দেখেছিল। কালী মন্দিরেও যাবার নাম করে অন্য কোথাও গেছিল ঝিলিক। কার সঙ্গে কথা বলতেও দেখেছে মিনতি। কিন্তু ঝিলিককে প্রশ্ন করতে ও ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছে। তার মনে হয়েছিল ঝিলিক তাকে মিথ্যা কথা বলছে। এখন মনে হয় কিরণের অমতে ' াবঙ্গ লতিকার মেয়েকে ঘরে এনে যেন সে ভুলই করেছে।

কিন্তু এখন আর করার কিছুই নেই। কিরণকেও কিছু বলতে পারবে না। ঝিলিকের উপরই নজর রাখছে মিনতি।

দুপুরে খেতে বসেও দেখে ঝিলিকের খাবারও তেমন ইচ্ছা নেই। মিনতি বলে,

— খা ঝিলিক, ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করছিস — খাচ্ছিস না!

ঝিলিক বলে — খিদে নেই ঠাক্‌মা।

মিনতি আরও ভাবনায় পড়ে।

সেদিন কিরণ সকাল বেলায় চেম্বার করার পর বিকেলে দূর গ্রামে কলে গেছে। বাড়িটা ফাঁকা। বাইরে চেম্বারে সেদিন কিরণ বাবুর সহকারী ডাক্তার নন্দবাবু চেম্বারে রয়েছেন। মিনতিদেবী দুপুরে খাওয়ার পর একটু দিবানিদ্রা দিয়ে উঠে মুখ হাত ধুয়ে রামায়ণ মহাভারত নিয়ে বসেন। আগে নিজেই পড়তো। এখন চোখের দৃষ্টির জন্য ঠিক পড়তে পারেন না। তাই ঝিলিককে ডাকে। ঝিলিক ও জানে বিকেলে ঠাকুমাকে রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনাতে হবে।

সেদিন ঝিলিকের শরীরটা আরও খারাপ হয়েছে। বেশ কিছুদিন থেকেই শরীরটা এমন চলছে। ঝিলিক কাউকে কিছু বলেনি, মাঝে মাঝে নিজের বাথরুমে বমি করে গোপনে। আর দেখছে ঠাকুমা যেন তার দিকে আরও বেশী করে নজর দিয়েছে। ঝিলিকও দেখছে ঠাকুমা যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। তাই দেখে ঝিলিকও তাকে এড়িয়ে যায়। আগে ঝিলিক নিজেই ঠাকুমার ঘরে রমায়ণ মহাভারত নিয়ে বসতো।

মিনতিদেবী দেখছে কদিন ঝিলিককে ডাকতে হচ্ছে, তবে আসছে। ঝিলিকও ক্রমশ ঠাকুমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। মিনতি তাই নিজে এসেছে ঝিলিকের ঘরে। ঝিলিক তখন বাথরুমে। বমির শব্দ কানে আসে মিনতির। ঝিলিক তাহলে বমি করছে। কোনরকমে চোখে

মুখে জল দিয়ে বের হয়ে আসে ঝিলিক। আর চোখের সামনে তার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। মাথাটা ঘুরে যায়। দরজার বাইরে ছিটকে পড়তে যাবে, মিনতি দেবী তাকে ধরে ফেলেন।

তার চীৎকারে বাড়ির কাজের মেয়েরাও এসে হাজির হয়। ওরা ঝিলিকের অচেতন দেহটা নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। তারপর চোখে মুখে জল দিতে জ্ঞান ফেরে ঝিলিকের। মিনতি দেবী বলেন,

— ও মানদা, বাইরের চেম্বার থেকে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন।

ঝিলিক বলে,

— আমার কিছু হয়নি ঠাকুমা। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল।

মিনতি ওসব কিছু শুনতে চায়না। মানদা বলে,

— ঠাকুমা, ডাক্তারবাবু কলে গেছেন। ওখানে দেখলাম নন্দ ডাক্তারবাবু রয়েছেন।

মিনতি বলে,

— তাকেই ডাক, বলবি আমি ডেকেছি। কিরণ তো নেই — ওকেই ডাক।

মানদা ডাক্তারবাবুকে ডাকতে চলে যায়।

কিরণবাবুর গাড়িটা চলেছে তখন শহর ছাড়িয়ে গ্রামের দিকে। শহরের জৌলুষ এখানে নেই। রুক্ষ প্রান্তর — তাম্রাভ প্রান্তরে ঘাস হয়না। জায়গায় জায়গায় ইউক্যালিপটাসের জঙ্গল। আগে ছিল শালবন। কিরণ দেখে সেই শালগাছকে মানুষ নির্মূল করে সেই জায়গাতে নতুন করে ইউক্যালিপটাস - এর গাছ না হয় সেগুন গাছ পুঁতেছে। ইউক্যালিপটাস এর গাছে এর মূল থেকে একবারই একটা গাছ জন্মায় আর সেগুনও তাই। তবু শাল গাছ কেটে সাফ করে দেশ ছাড়া করতে চায়। তবু ওই ইউক্যালিপটাসের ফাঁকে দুএকটা শালগাছ জন্মায়। তাই জায়গাটা বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। অরণ্যের বুকে এসেছে সবুজের স্নিগ্ধতা। গ্রামগুলো দূরে দূরে।

কিরণ এতদিন রাজনীতি করেনি, তবে গ্রাম, গ্রামের মানুষকে সে দীর্ঘদিন ধরে চেনে। তাদের সুখ দুঃখের খবরও রাখে। তার মনে হয় এসব হিসাব যেন বেশ সুকৌশলে সাজানো। এবার রাজনীতিতে এসে সে এই হিসাবের গরমিলটাকে বড় করেই দেখতে পায়। তার মনে হয় এসব খরচের হিসাব মতো দেখানো হয়েছে। তবে সেই খরচের অনেক খাতে প্রয়োজনীয় টাকা গ্রামের মানুষের কাছ অবধি পৌঁছয়নি — মাঝপথে পথ হারিয়ে কোনদিকে চলে গেছে।

তাই বহু গ্রামের অবস্থা এখনও আগেকার মতই রয়েছে। ভাঙাচোরা পথের নিশানা — মাজা ডোবা — খরার রাজ্য। মাঝে মাঝে এখনও বৃষ্টি হলে কিছু হয় নইলে অজন্মা।

দু'চারজন এর মধ্যে নেতা সেজে ভালোই আছে, তাদের হাতে পথ হারানো টাকার অনেকটাই চলে এসেছে — নানা ভাবে। এমন এক পঞ্চায়েত নেতার বাড়িতে রোগী দেখতে এসেছে কিরণ। ওই জরাজীর্ণ গ্রামের মধ্যে তার দোতলা বাড়ি। বাইরে বেশ কয়েকটা ধানের, মকাই, পাওয়ার টিলার, পাম্পসেট এসবও রয়েছে তার বাড়িতে। সেই নেতার মাকে দেখার জন্য ডাক পড়েছে কিরণবাবুর। গ্রামের লোকও জুটে গেছে। জিপটা সোজা নেতার বাড়ির কাছ অবধি এসেছে। রাস্তাটা এসে থেমে গেছে এখানেই। কিরণ রোগী দেখে প্রেসক্রিপশন করছে — হঠাৎ একটা মেয়েকে এগিয়ে আসতে দেখে চাইল। গ্রামের মাতব্বরদের দেখে মেয়েটা অবাক হয়। লেখাপড়া জানে মেয়েটা। কালো তবে চেহারায় একটা শ্রী ছিল। আজ তা কিছুটা মলিন। তবু চোখ দুটোতে যেন নীরব ব্যাকুলতা। মেয়েটা বলে,

— বাবা একবার আমার শ্বশুরমশাইকে দেখতে যাবেন ? পাশেই ওদিকে আমাদের বাড়ি।

সেই নেতাই কড়াস্বরে বলে,

— উনি এখন ব্যস্ত। ওকে ডিসটার্ব করোনা।

মেয়েটা থেমে যায়। কিরণ দেখছে মেয়েটাকে। বলে সে,

— কোথায় তোদের বাড়ি ?

— ওই তো ওই যে আমগাছ দেখছেন ওইটাই আমাদের বাড়ি। আমার শ্বশুরমশাইয়ের খুব অসুখ। বাড়িতে আমার স্বামী নেই, আমি বড় বিপদে পড়েছি বাবা।

কিরণের এবাড়ির কাজ শেষ হয়ে গেছে। কিরণ বলে,

— একটু দাঁড়াও। আমি যাবো।

গ্রামের মানুষও এহেন বড় ডাক্তার, এত বড় নেতাকে ওই মেয়েটার কথায় রাজী হতে দেখে অবাক হয়। কিরণবাবু সেই নেতাকে কি কি ওষুধ দিতে হবে, কি কি পথ্য হবে সব বুঝিয়ে দিয়ে বের হয়ে আসে। আর কৌতুহলী জনতাও ডাক্তারবাবুকে এই আচরণ করতে দেখে বিস্মিত হয়। কে বলে চুপিচুপি,

— একটা রোগী দেখতে এসে আর একটা রোগী দেখে ডাক্তারবাবু ডবল ফি মারবে হে।

কে বলে,

— গোকুলের বৌ ডাক্তারের ফি দেবে কোথা থেকে বুঝবে এই বার।

কিরণ চলেছে ঐ মেয়েটির পিছনে — দুতিনটে বাড়ির পর একটা মাটির ঘর, খড়ের চাল। সীমা প্রাচীর এককালে ছিল। এখন ভেঙে পড়েছে। ওই গোকুল মুখুজ্যের অসুখ ওর একমাত্র ছেলে দুর্গাপুরে কোন প্রাইভেট কারখানায় কাজ করে। এখানে বৌমা আর বৃদ্ধ শ্বশুর থাকে। গোকুলের ছেলে মাঝে মাঝে বাড়ি আসে। কিরণ দেখছে এদের সংসারের অবস্থা। মেয়েটাকে দেখে কিরণের ঝিলিকের মুখটা মনে পড়ে। ঝিলিকের

চোখেও সে এমনি সেবাপরায়ণার ছাপ লক্ষ্য করেছে সে।

কিরণ রোগী দেখে বলে,

— ওযুধ পত্রতো দিতে হবে মা। আর বেশ কিছুদিন ওযুধ খেতে হবে। ঠিকমতো ওষুধ না পড়ার জন্য রোগও বেড়েছে।

গোকুল বলে,

— আমার ছেলে কাল আসবে।

— তাহলে ওকে কালই শহরে আমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন এই প্রেসক্রিপশন দিয়ে। ভয় নেই, ঠিকমতো ওযুধ খেলে সেরে যাবেন।

ঐ মেয়েটা বলে,

— সেই আশীর্ব্বাদই করুন বাবা। আমার মা, বাবা কেউ নেই। উনিই আমার মা-বাবা। স্বামীতো কাজের খাতিরে বাইরে থাকে।

কিরণ বের হয়ে আসছে, মেয়েটার ডাক শুনে চাইল।

— বাবা! মেয়েটা এগিয়ে আসে, ওর হাতে দুগাছা চুড়ি। ওইটুকুই তার সাধ্য। বাবা, আপনার ভিজিট ওযুধের দামতো দিতে হবে। যদি এগুলো দয়া করে নেন,

কিরণ মেয়েটাকে দেখছে। শ্বশুরের চিকিৎসার জন্য নিজের শেষ সম্বলটুকুও তুলে দিতে চায় তার হাতে।

কিরণ বলে,

— ছিঃ মা, আমি ডাক্তার। মানুষের সেবা করাই আমার কর্তব্য। তারজন্য তোমায় ওইসব দিতে হবে না। তুমি রাখো মা। কাল তোমার স্বামীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। ওযুধ পত্র নিয়ে আসবে। টাকার জন্য তোমাদের ভাবতে হবে না।

গ্রামের লোকও ভিড় করছিল। তারাও দেখে ভাবছিল হয়তো ফিজ না পেয়ে ডাক্তারবাবুর ঐ কম্পাউন্ডার হয়তো কোন ঝামেলা বাধাবে। সেবার শহরের শরৎ ডাক্তারকে দত্তরা ডেকে এনে ঠিকমত ভিজিট, ওষুধের দাম, গাড়ির তেলের দাম দিতে পারেনি। তাই নিয়ে যা ঝামেলা হয়েছিল তা গ্রামের লোক আজও ভোলেনি। আজ তারা কিরণ ডাক্তারের কথা শুনে অবাক হয়। ডাক্তার যে এইভাবে টাকা ছেড়ে দিয়ে যায়, বিনাপয়সায় ওষুধও দেয় তা যেন প্রথম দেখছে ওরা।

কিরণ গাড়িতে ওঠে। মেয়েটা পিছু পিছু এসেছে। যাবার সময় মেয়েটা প্রণাম করে কিরণকে। কিরণ ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদও করে। কিরণ চলে আসে গ্রাম থেকে। তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। কেন জানেনা তার চোখের সামনে বারবার সেই গ্রামের মেয়েটির মুখ ভেসে ওঠে, যেখানে তার শ্বশুরের জন্য ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে।

কিরণের জন্য ঝিলিকও মাঝে মাঝে এরকম ব্যাকুল হয়ে ওঠে। দুদিন কিরণের শরীর খারাপ হয়েছিল — আটদশ বার ভোটের ক্যাম্পেনে গেছে — তারপর রোগীদেরও ভিড়। দিনরাত পরিশ্রম করতে হয়েছিল, ঠিকমত বিশ্রামও পায়নি। তাই এবার অসুস্থ হয়ে পড়ে কিরণ ডাক্তার। ঝিলিকই নন্দবাবুকে ডেকে আনে। কিরণ ওর বৌমাকে বলেছে,

— তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন ঝিলিক। এমন কিছুই হয়নি আমার। একটু বিশ্রাম নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঝিলিকের সেই মুখখানার ছবিই বারবার ভেসে উঠছিল ওই মেয়েটার মুখের উপর। কিরণ তার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেনি।

বাড়িতে তখন স্তব্ধতা নেমেছে। মিনতি দেবী আজ নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারেনা।

কিরণ নেই বাড়ীতে, সে কলে গেছে। হঠাৎ ঝিলিক অসুস্থ হয়ে পড়তে সে চেম্বার থেকে নন্দ ডাক্তারকে ডেকে পাঠায় বাড়ির ভিতরে। ঝিলিককে দেখার জন্য। মেয়েটা অনেক দিন ধরেই বেশ ভুগছে। শরীর ভালো নেই। খাওয়া দাওয়া কমে গেছে ঝিলিকের, তারপর হঠাৎ আজ বাথরুমে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। ভাবনার কথা।

নন্দ ডাক্তার এসেছে ঝিলিকের ঘরে। বিছানায় শুয়ে আছে ঝিলিক। ডাক্তারবাবু ঝিলিককে পরীক্ষা করে। চোখ — জিভ — নাড়ি তারপর স্টেথো দিয়ে বুক দেখে। কি ভেবে বলে নন্দ,

— মাসীমা একটা সুখবর বলেই মনে হচ্ছে।

মিনতি অবাক হয়ে বলে,

— সুখবর মানে?

— কিরণবাবুতো মনে হচ্ছে দাদু হতে চলেছে। আপনার নাতবৌ মা হতে চলেছে।

মিনতির পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। তার কথা বলার সাধ্যও নেই এই সংবাদ শুনে। নন্দবাবু ওদিকে নজরই দেয়নি। ঝিলিককে বলে,

— মাসীমা আমি আজ সন্ধ্যার ট্রেনেই কলকাতা যাচ্ছি। কিরণকে বলা আছে। তিনদিন পর আসবো। চলি — ফিরে এসে কিন্তু মিষ্টিমুখ করাতে হবে।

নন্দ ডাক্তার সুখবরটা শুনিয়ে চলে যায়। ঝিলিকের মন খুশীতে ভরে ওঠে। তার মনে পড়ে পাহাড় বন ঘেরা লেকের ধারে সেই গেস্ট হাউসের কথা। দুতিন রাত ছিল সে আর প্রতাপ।

কিন্তু সব খুশী এবার নিমেষের মধ্যে গভীর দুশ্চিন্তায় পরিণত হয়। মিনতি এবার

চাপাস্বরে যেন ফেটে পড়ে। তার কণ্ঠস্বরও বদলে গেছে। মিনতি জানে প্রতাপের সঙ্গে ঝিলিকের কোন দেখা সাক্ষাৎ যোগাযোগ হয়নি। কিরণ বন্দুক হাতে রাতের পর রাত পাহারা দিয়েছে। দিনে ও পথ আগলে বসে থেকেছে সিঁড়ির মুখে। তাহলে হলো কি করে?' ঝিলিকের ঘর থেকে সেই রাতে একজনকে বের হয়ে নীচে চলে যেতে দেখেছিল মিনতি। কিন্তু ঝিলিক সে কথা উড়িয়ে দিয়েছিল। সেদিন মন্দিরের পথেও মিনতি ঝিলিকের সঙ্গে দূরে একটা তরুণকে দেখেছিল। ঝিলিক সেই কথাটাও মানেনি।

আজ সে মা হতে চলেছে। তাহলে কি এর মূলে রয়েছে সেই রহস্যময় তরুণের অস্তিত্ব। ঝিলিক অন্য ছেলের সঙ্গে মেশে — আজ মিনতির মনে এই ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে। ঝিলিক আজ মিনতির ওই কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠে। তার মনের সব সুর হারিয়ে যায়। মিনতি কঠিন স্বরে বলে,

— নিজের চোখে দু-তিনদিন দেখেছি তোমার ঘরে কেউ আসে। কার সঙ্গে তুমি মন্দিরে যাবার নাম করে বের হয়ে যাও?

ঝিলিক চুপ করে থাকে। মিনতির সন্দেহ তত বাড়ে।

— কে সে? জবাব দাও। চুপ করে রইলে কেন?

ঝিলিক প্রতাপকে কথা দিয়েছে, ওদের মেলামেশার কথা সে আর কাউকে জানাবে না। আর বাবা যদি জানতে পারে প্রতাপের সঙ্গে এত বাধা সত্ত্বেও তারা বেশ কয়েকবার মিলিত হয়েছে, তাহলে হয়তো ওকে গুলিই করে দেবে। তাই ঝিলিক চুপ করে থাকে। মিনতির ধারণাটা একেবারে গেঁথে যায় — ঝিলিক নিশ্চয়ই চরম একটা অপমানজনক কলঙ্কময় ঘটনা ঘটিয়েছে। মিনতি এবার এক দুঃসহ গ্লানিতে ফেটে পড়ে। সে বুঝেছে এই বাড়ির বৌ একটা চরম সর্বনাশই ঘটিয়েছে। আর এ বাড়ির মান সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

মিনতি সেই সর্বনাশের কথা ভেবে অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে,

— একি সর্বনাশ করলি ঝিলিক। মুখুজ্যে বংশের সুনামে তুই কালি লেপে দিলি। তোকে নিজে ঘরে নিয়ে এলাম আর তুই আমাদের সঙ্গে এইভাবে শত্রুতা করলি। এখন কি হবে? আমি কিরণ কে কি বলবো? মিনতি কাঁদতে থাকে।

কিরণ ডাক্তার কল থেকে ফিরেছে অনেক রাত্রে। তখন সে পরিশ্রমে ক্লান্ত। সারা বাড়ি তখন থমথমে। রাত-ও হয়েছে। মিনতি দেবীর মুখটাও ভার। বাড়িতে আর কেউ জানেনা এসব কথা। মিনতি দেখে কিরণও ক্লান্ত। এসময় আর ওসব কোন কথাই বলেনা। কিরণ খেতে বসেছে। বলে,

— কই ঝিলিককে দেখছি না।

— তোর জন্য অপেক্ষা করছিল। কদিন ওর শরীর ভালো নেই — তাই আমিই ওকে শুতে পাঠিয়েছি। নে রাত হয়েছে। তুই-ও এবার শুয়ে পড়তো। কিরণ খেয়ে উঠে হাতমুখ ধুয়ে তোয়ালে হাত মুছতে মুছতে বলে,

— ঝিলিকের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। কাল ওকে একবার চেক আপ করিয়ে নেব।

মিনতি কোন কথা না বলে চলে গেল।

প্রতাপের দুটো প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা বাকি। একটা আজই হবে। আর একটা কাল। প্রতাপ এরপর হাসপাতাল ডিউটিতে ব্যস্ত থাকবে। ওদিকে পরীক্ষার ফলও বেরিয়ে যাবে। প্রতাপ জানে সে বেশ ভালো ভাবেই পাশ করবে। কদিন ঝিলিকের সঙ্গে দেখাও হয়নি। বাড়িতে ফোন করে কিন্তু ঠাকুমা এখন বাড়িতে ফোনের দিকেও নজর রেখেছে। প্রতাপ জানে ঠাকুমাও ঝিলিককে ডেকে দেবে না। হয়তো ব্যাপারটা বাবার কানেও পৌঁছবে। তাই বাড়ির খবর — বাবার খবর নিয়েই প্রতাপ ফোন ছেড়ে দেয়। ঝিলিকও দেখে ঠাকুমা ফোন এলেই নিজেই ধরে। আগে ঝিলিক ধরতো। এখন থেকে ঝিলিককে নজর বন্দী করে রেখেছে মিনতি দেবী।

কিরণ নিজের ঘরে বসে কাগজ পড়ছে। চা দিতে আসে বাড়ির কাজের লোক। এটা এতদিন ঝিলিকই করেছে —

আজ কাজের লোককে চা দিতে আসতে দেখে কিরণ বলে,

— বৌমা ওঠেনি? তুই চা আনলি।

— মা আমাকে দিয়েই চা পাঠালেন।

কিরণ একটু অবাক হয় ঝিলিকের অনুপস্থিতিতে, এমন সময় মিনতি দেবী ঘরে ঢোকেন। আজ মিনতি দেবীর মনে হয় নন্দ ডাক্তারের কথাই ঠিক। ঝিলিকের দেহে আসন্ন মাতৃত্বের সব লক্ষণই ফুটে উঠেছে — আর গোপন করার কোন উপায় নেই। কিরণকেও এখন সব জানানোর দরকার। এতবড় সর্বনাশের খবরটা আর চেপে রাখাও যাবে না।

মিনতি বলে,

— একটা কথা তোকে না জানিয়ে পারছি না।

কিরণ তখন কাগজে তার স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিবেশনের উপর একটা সম্পাদকীয় নিবন্ধ মন দিয়ে পড়ছে। ওই পত্রিকার সাংবাদিকও তার সেই পরিকল্পনা সাদরে গ্রহণ করেছে। মিনতির কথায় কিরণ বলে,

— কি কথা বলে ফ্যালো।

মিনতি এবার নিজেকে সংযত করে বলে,

— ঝিলিক মা হতে চলেছে।

কিরণ তখন লেখাটার মধ্যে ডুবে আছে। সে বলে,

— এতো খুব ভালো কথা। তারপরই মায়ের কথার প্রকৃত অর্থ বুঝে হাতের খবরের কাগজ ফেলে ছুটে আসা ধনুকের মত সোজা হয় চেয়ার ছেড়ে ফুঁসে ওঠে এবার কিরণ।

— কি বললে? [redacted] মা হতে চলেছে? নেভার --

এ হতেই পারেনা। কে বলছে?

মিনতি বলে,

— কদিন থেকে ওর শরীর খারাপ। কাল অজ্ঞান হয়ে যেতে নন্দকে চেম্বার থেকে এনে দেখাতে নন্দই পরীক্ষা করে দেখে জানিয়ে গেল। কিরণ জানে নন্দ অভিজ্ঞ ডাক্তার। তার চিকিৎসা পদ্ধতি আর সিদ্ধান্তে কারও সন্দেহ নেই। কিরণ বিড়বিড় করে বলে,

— চলো।

— কি বললি?

— চলো তোমার সেই আদরের নাতবৌ এর কাছে। তার সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া করতে হবে। কি করে এটা সম্ভব হলো — আই মাস্ট নো। প্রতা পকে কে আসতে দিয়েছিল বাড়িতে। তুমিই ওদের প্রশয় দিয়েছিলে আমাকে না জানিয়ে। তারপর দেখাচ্ছি ওই হতভাগা প্রতাপকে। মিথ্যাবাদী —

মিনতি দেবী বলে,

— ওরে প্রতাপ এসবের কিছু জানে না। ওর সঙ্গে ঝিলিকের দেখাও হয়নি।

কিরণ এবার বোম ফাটার মত ফেটে পড়ে।

— তা হলে এসব হল কি করে?

মিনতি বলে,

— খাল কেটে কুমীর এনেছিলাম রে। ঝিলিক আসার পর এবাড়িতে কদিন রাতে চোর এসছিল মনে পড়ে? কিরণেরও এবার মনে পড়ে সেই চোর আসার কথাটা। ওই চোর আসা বন্ধ করতে কয়েকদিন নিজেও রাতে পাহারা দিয়েছে। কিরণ বলে,

— হ্যাঁ।

মিনতি বলে,

— তখন কিন্তু আমি ঝিলিকের ঘর থেকে একটা ছেলেকে বের হয়ে আসতে দেখলাম। চোখে ভালো দেখতে পাইনা তাই ঠিক ঠাহর করতে পারিনি। তারপরও দেখেছি ঝিলিককে ফি শনিবার শনিমন্দিরে পূজো দিতে যাবার নাম করে বেরোতে — একদিন তো পথে ওকে তেমন একজনের সাথে দেখেছি। ঝিলিক কথাটা উড়িয়ে দিয়েছে। ওরে সেই শয়তানটা

ঝিলিকের সঙ্গে মিশে আমাদের বংশের মুখ ডোবালো এইভাবে।

— আমাকে বলোনি কেন আগে? আমি গুলি করে সেই শয়তানের বাচ্চাকে উড়িয়ে দিতাম। এখন সর্বনাশ হয়ে যাবার পর বলে কি হবে? এখন কি করি?

কিরণ অসহায় বন্দী পশুর মত গজরাচ্ছে।

এবার তার মনে হয় তার চির শত্রু লবঙ্গের কথা। লবঙ্গ চায় তাকে বারবার হারাবার চেষ্টা করে পারেনি এবার হয়তো তাই তার মেয়েকে দিয়ে এইভাবে তাদের মুখে কলঙ্কের কালি লেপে দিয়েছে। এসব ঐ লবঙ্গেরই পরিকল্পনা। কিরণ গর্জে ওঠে,

— এসব ঐ উকিল লবঙ্গের কাজ। সে ইচ্ছা করেই ভেবে চিন্তে তার মেয়েকে আমার ঘরে বৌ করে পাঠিয়েছে। আমার এমন সর্বনাশ করার জন্য। ওই লবঙ্গকে আমি ছাড়বোনা। আগে ঝিলিককে দেখছি, তারপর দেখবো ওই বুলডোজার মহিলাকে।

কিরণ আজ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছে। তার বাড়ির বৌ - এর এতবড় দুঃসাহসিক কলঙ্কের কথা শুনে। ঝিলিকও কি জবাব দেবে জানেনা।

কিরণ গজরাচ্ছে,

— জবাব দাও। এতবড় সর্বনাশ কেন করলে আমাদের? এইসব করতেই তোমার মা তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। এসব তারই ষড়যন্ত্র।

ঝিলিকের বাবা নিখিলবাবু সেইদিন এবাড়িতে এসেছেন। আগে আসতো লবঙ্গের অজানতে। কিন্তু নিখিলবাবু এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত ঝিলিক প্রতাপ তার বাড়িতে আসে মাঝে মাঝে — আর লবঙ্গও সেদিন এসেছিল।

মা - মেয়ের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝি আর নেই। লবঙ্গও প্রতাপকে মেনে নিয়েছে তার জামাই হিসাবে। নিখিলবাবুও চায় দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্কটা সহজ হোক। কিরণবাবুর সব ভালো তবে একটা দোষ খুবই একগুঁয়ে আর জেদী। তবু নিখিলবাবুর বিশ্বাস সব কিছু একদিন ঠিক হয়ে যাবে।

আজ এবাড়িতে পা দিয়ে সে চমকে ওঠে। কিরণবাবু বাড়ি কাঁপিয়ে গর্জন করছে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মত। আর ঝিলিকের ঘরে ঢুকে ওইসব কথা বলে ঝিলিকের কৈফিয়ত চাইছে। সেইসঙ্গে লবঙ্গের শত্রুতার কথাটাই বারবার উঠছে। কিরণও এবার লবঙ্গ আর লবঙ্গের মেয়েকে চরম শিক্ষাই দেবে।

এ বাড়ির কাজের মেয়েদের মধ্যে এখন রসালো বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তারাও শুনছে বড় বাড়ির লেখাপড়া জানা সুন্দরী বৌ এর কেচ্ছার কাহিনী। চাপা স্বরে তাই নানা গুঞ্জন ওঠে বড় বাড়ির এসব গোপন কেচ্ছা নিয়ে। নিখিলও শোনে, ঝিলিক নাকি মা হতে চলেছে। কিরণ বাবুর কথামতো প্রতাপ এবাড়িতে দুবছরের মতো প্রায় নির্বাসিত

হয়ে গেছে। প্রতাপের প্রবেশের অধিকার নেই দোতলায়। রাত গভীরে আসে ঝিলিকের গোপন প্রেমিক। এনিয়ে কয়েকবার রবও উঠেছিল। তারপরই ঝিলিক মা হতে চলেছে।

কিরণ আজ ঝিলিকের স্বভাব চরিত্র নিয়ে অনুযোগ করে আর এ যে লবঙ্গেরই পরিকল্পনা কিরণকে ছোট করার — এইটাই বিশ্বাস করছে কিরণ। তাই ঝিলিককে ও নানা কথা শুনতে হয়।

কিরণ বলে,

— মা ওকে ঘরে আটকে রেখে দাও। তারপরে দেখছি ওর মাকে। দরকার হয় চরম ব্যবস্থাই নেব। প্রতাপকেই বলবো ওই চরিত্রহীন মেয়েটাকে ডিভোর্স করে দিতে।

নিখিল আর দাঁড়ায় না। বেশ বুঝেছে ঝিলিকের সুখের জীবনে নেমে এসেছে চরম অশান্তির ছায়া। নিখিলও বুঝেছে কিরণ আর মিনতির মনে একটা ধারণা জন্মেছে যে ঝিলিক কিছু গর্হিত কাজই করেছে। তাই এবার তাদের একমাত্র মেয়ের জীবনে চরম সর্বনাশই ঘটতে চলেছে নিখিল ছুটে যায় লবঙ্গের কাছে।

লবঙ্গ এখন অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। সেও ভাবছে কিরণের সঙ্গে সম্পর্কটা সুস্থ করে তোলার কথা। লবঙ্গ ইদানীং মন দিয়ে মামলা শুরু করেছে। তার পশারও বাড়ছে। লবঙ্গ মুহুরীকে কোর্টে পাঠিয়েছে আজকের মামলার হাজিরা দেবার জন্য — এর মধ্যে লবঙ্গও স্মরণ করে ঠাকুর দেবতার পূজো সেরে আহার পর্ব সেরে কের্টে গিয়ে হাজিরা হবে। এমন সময় নিখিলকে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকতে দেখে চাইল লবঙ্গ।

— কি ব্যাপার? ঝড়ো কাকের মত এসে ঢুকলে?

নিখিল বলে,

— ঝিলিক মা হতে চলেছে।

— তাই নাকি? এতো দারুণ সুখবর।

নিখিল ও বাড়ির পরিবেশটা দেখে এসেছে। কিরণ বন্দুক হাতে ঝিলিককে শাসাচ্ছে। আর লবঙ্গের সঙ্গেও এবার তার শেষ বোঝাপড়া হবে তাই ঘোষণা করছে। লবঙ্গও বাড়ির অবস্থাটা আর ঝিলিকের অবস্থার কথা শুনে ফুঁসে ওঠে।

— কি বললে? ওই কিরণ এবার আমার মেয়েকে এইসব অপবাদ দেবে আমার নামে যাতা বলবে? ওর নিজের ঘরের বৌ - এর উপর এসব অকথ্য টরচার করবে? কি ভেবেছে ঐ কিরণ ডাক্তার? আমি কি মরে গেছি?

লবঙ্গও এবার তার মনের সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে আবার নিজের ফর্মে ফিরে আসে। লবঙ্গ বিশাল দেহ দুলিয়ে তড়পাচ্ছে,

— বধূ নির্যাতনের কেসেও ওকে এবার জড়াচ্ছি। এ্যারেস্ট করে নিয়ে আসবো কোমরে

দড়ি পরিয়ে।

নিখিল বলে,

— আবার ওসব কোর্ট কাছারী করবে? নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ এর কথা ভাবো।

নিখিল লবঙ্গের মত মাথা গরম করেনা। সেও ভেবেছে কথাটা?

— এনিয়ে বাইরে গোলমাল করে লাভ নেই। প্রতাপ ও ঝিলিককে ভালবাসে। সে ও ভালোছেলে। তার স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য বোধও আছে। তার জন্য তার স্ত্রীর এতবড় অপবাদকে সে মেনে নেবে না। ঝিলিক কে এখানে আনো — প্রতাপও এখানেই আসবে। নিজেও সে ডাক্তার হবে। ওর রেজাল্টও বের হবে এই মাসেই। প্রতাপ ঝিলিক থাকবে এখানে। তোমার বাজারের ঐ বাড়িটাকে প্রতাপের নিজের ক্লিনিক, চেম্বার করে দেবে। কিরণের একমাত্র সন্তান আর বৌমাকে যদি কৌশলে সরিয়ে আনতে পারো কিরণের পায়ের তলে মাটি সরে যাবে। ওই ছেলেছাড়া তার আর কিছুই নেই। সেই ছেলেকে যদি সরিয়ে আনতে পারো ব্যস — দেখবে কিরণের বেলুন চুপসে গেছে। লবঙ্গ ভাবছে এবার নিখিলের কথা। নিখিলের কথামত যদি কাজ করা যায় বাইরের লোকও টের পাবেনা। ঝিলিক কে নিয়ে শহরে আলোচনা হোক এটাও চায়না লবঙ্গ। লবঙ্গও এবার সমস্ত বিষয়টা মন দিয়ে ভাবছে। লবঙ্গ বলে,

— প্রতাপ কি রাজী হবে?

নিখিল বলে।

— ঠিক মতো বোঝাতে পারলে প্রতাপ রাজী হবেই। আর তার নিজের স্ত্রীর এতবড় বিপদের সময় সে একটা কিছু করবেই। সে এখন আর বাবার মুখাপেক্ষী নয়। আমি তাকে বলছি সব কথা। ওর সঙ্গে কথা বলে আসার পর তুমি শুনে যা করার করবে। এখন এ নিয়ে কোন রকম হৈ চৈ করো না।

প্রতাপ হাসপাতালের আউটডোর নিয়ে ব্যস্ত। তার পরীক্ষাও সব চুকে গেছে। এইবার রেজাল্ট বের হবে। দুপুরে হঠাৎ নিখিলবাবুকে হাসপাতালের লাগোয়া ডাক্তারদের হোস্টেলে আসতে দেখে প্রতাপ অবাক হয়।

— আপনি!

নিখিল এবার ওদের বাড়ির সমস্ত কথাই বলে। প্রতাপও চমকে ওঠে খবরটা শুনে। সে ভাবেনি যে ঝিলিককে নিয়ে ওই ভাবে মেলামেশার ফলে এমন একটা কান্ড ঘটবে। যা ভয় করেছিল তাই হয়েছে। আর বাড়িতে ঝিলিকও এবিষয়ে মুখ খোলেনি — আর তাই তাকে ঠাকুমা — বাবা চরম অপবাদ দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চায়। প্রতাপ অস্ফুট স্বরে বলে,

— বাবা এসব কি করেছেন ? এ তার হিটলারী মনোভাব।

নিখিল বলে,

— তাই তো, একটা অসহায় মেয়ে সে তোমার স্ত্রী — তুমি নিজে জানো ঝিলিক নিরপরাধ। তার পাশে তুমি দাঁড়াবে না ? নিজের স্ত্রীর প্রতি তোমার কোন কর্তব্য নেই প্রতাপ ?

প্রতাপ এবার বুঝেছে তাকে এবার একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বাবার অন্যায় শাসন এতদিন সে মুখ বুজে সহ্য করেছে। নির্দোষী ঝিলিককে বাবা অন্যায়ভাবে এতবড় অপবাদ দেবে — বাড়ি থেকে বের করে দেবে, এটাকে সে মেনে নেবে না। সে নিশ্চয়ই ডাক্তারী পাশ করবে। তখন এই হাসপাতালে ইনটার্ন হয়ে কাজ করে যা টাকা পাবে তাতে তাদের দুজনার কোনমতে চলে যাবে। প্রতাপ বলে,

— ঝিলিককে এই ভাবে অপমান করবে বাবা এটা আমি মেনে নেব না। বাবার এই অন্যায়ের প্রতিবাদ আমি করবো। দরকার হলে ঝিলিককে ওখান থেকে নিয়ে এসে নিজেরাই ঘর বাঁধবো। যেভাবে হোক আমাদের চলে যাবে।

নিখিল এবার বলে,

— ভালো ভাবেই চলবে প্রতাপ। ঝিলিকের মায়ের বিষয় আশয় ব্যাঙ্ক টাকা, আমারও কিছু আছে। এসবতো ঝিলিকেরই। তুমি শহরের বাড়িতে ক্লিনিক করবে। নিজের ক্লিনিক। তোমারও ডাক্তারীতে নাম ডাক পশার হবে। তুমিও তোমার বাবাকে দেখিয়ে দেবে যে তুমি কিছু কম নও। যে ঝিলিককে তিনি বিনা দোষে বাড়ি থেকে তাড়াতে চান। সেই ঝিলিক হবে তোমার ঘরের লক্ষ্মী।

প্রতাপও এবার যেন বাবার ওই কঠিন নিষেধের বেড়া ভেঙে নিজেদের মুক্তির স্বাদ পেতে চায়। প্রতাপকে নিয়ে আসে নিখিল লবঙ্গের কাছে। আজ লবঙ্গও এবার শান্তভাবে প্রতাপের সঙ্গে কথা বলে। এবার লবঙ্গও তৈরী হয়েছে কিরণকে চরম আঘাত করার জন্য। তবে তার লড়াইয়ের নীতিটা এবার স্বতন্ত্র।

প্রতাপ ও এবার বিপদের গুরুত্ব বুঝে মনস্থির করে ফেলে। বাবা ও তাকে বাড়ি যাবার জন্য ফোন করেনি। প্রতাপও সব খবর পেয়েও বাড়িতে ফোন করে না। জানে ঠাকুমা ঝিলিককে আর ফোনে কথা বলতেই দেবে না। প্রতাপ তবু ভাবে বিজিত দা - করুণাদির কথা। ওরা তাকে খুবই স্নেহ করেন। তাদেরও কথাটা জানানো দরকার। তারপর প্রতাপ তার পথেই চলবে।

ঝিলিকের উপর এতবড় অপবাদকে সে চুপ করে মেনে নেবে না। বাবার মুখোমুখি হবার সাহস তারও নেই। তাই আড়াল থেকেই বাবার এই ব্যবহারের প্রতিবাদই করবে।

লবঙ্গ বলে,

— প্রতাপ তোমাদের সব ভার আমার। তুমিও আমার ছেলের মতই। ঝিলিক, তোমার সব দায়িত্ব আমাদের। এ মাসেই তোমার পরীক্ষার ফল বেরোবে। তুমি নিজের ক্লিনিক করবে। চেম্বার করবে। আধুনিক যন্ত্রপাতী যা দরকার আনাবে। টাকার জন্য ভেবনা — তোমার বাবার এতবড় অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ তুমি করবে।

কিরণবাবুর, মিনতিদেবীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। ঝিলিক সকাল থেকে তার ঘরে রয়েছে। কাজের মেয়ে তার খাবার আনে। ঝিলিক বলে,

— খাবার কেন? বিষ আনো মানদা দি। তাই খেয়ে সব জ্বালা জুড়োই। এই কালো মুখ আর কাউকে দেখাতে চাইনা।

মানদা বলে,

— বালাই ষাট, ওসব কথা কেন বলছ দিদি। কর্তাবাবুর একগুঁয়ে স্বভাব, ঠাকুমাও কোথায় ভুল করছে। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

— এর একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া অবধি এ বাড়িতে জলগ্রহণই করবো না।

ঝিলিকের ব্যাপারটা নিখিল জানে। কিছুই মুখে দেয়নি সকাল থেকে। তার ব্যাপারটা ভালো ঠেকে না। মিনতি বুঝে পারেনা কিভাবে এর মোকাবিলা করবে। ওদিকে কিরণও কাজকর্ম ছেড়ে রাগে ফুঁসছে। প্রতাপকে ডেকে কিরণ ঝিলিকের চরম শাস্তির বিধান দিয়ে ডিভোর্স এর মামলা করবে।

মিনতি ঘরে এসে ঢোকে। বলে,

— ও কিরণ, এতো আরও ফ্যাসাদ হলো। ওই মেয়ে সকাল থেকে জলটুকু অবধি ছোঁয়নি। উপোস দিয়ে আছে — অসুস্থ শরীরে যদি শেষে একটা কিছু হয় সর্বনাশের আর বাকী থাকবে না। কি হবে এখন?

কিরণ গর্জন করে,

— যা হয় হোক। তাই বলে ওই মেয়ের পায়ে ধরে সাধতে হবে না। এতবড় মহাপাপ করে বংশের মুখে কালি দেবে আর তা মেনে নিতে হবে? আজই প্রতাপকে ডেকে ওর সামনে ওই মেয়েকে দূর করে দোব। ও মেয়েকে আর এ বাড়ির বৌ বলে স্বীকার করিনা।

লবঙ্গ ঢুকছে।

কিরণ লবঙ্গকে দেখবে তার বাড়িতে এটা ভাবতে পারে না। তার এতদিনের শত্রু আজ এসেছে তার বাড়িতে। এবার কিরণও নিশ্চিন্ত হয় যে লবঙ্গই কৌশল করে মেয়েকে দিয়ে তাকে চরম অপমান করেছে।

কিরণ বলে,

— এবার মনের সাধ মিটেছেতো। যেমন মা তেমন তার মেয়ে। আমার বংশের নাম ডোবাবে এই ভাবে। নিয়ে যান আপনার মেয়েকে। ও আর এ বাড়ির কেউ নয়।

লবঙ্গ আজ মনস্থির করে ফেলেছে কোনরকম ঝগড়া করবে না সে। তাই লবঙ্গ নিজের রাগ চেপে বলে,

— আমার মেয়েকে ভরণ পোষণ করার সাধ্য আমার আছে। ঝিলিক, আয় মা। চলে আয় এই রাবণপুরী থেকে। এ ভদ্রলোকের ঘরের বৌ হয়েছিলি, এটা আমিও মেনে নিতে পারি না।

— তাই তো আপনার মেয়ের সব পরিচয় মুছে দূর করে দিলাম।

ঝিলিকের চোখে জল। আজ যেন তার সব কিছুই হারিয়ে গেল। আজ এ বাড়ি থেকে, প্রতাপের জীবন থেকে সরে যেতে হবে তাকে বিনা দোষে। ঝিলিক কান্না ভেজা স্বরে বলে,

— আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন, ও...

— আমার ছেলের নামও মুখে আনবে না তুমি। নিজের সব পাপের বোঝা আমার ছেলের উপর চাপাতে চাও। লজ্জা করে না তোমার? যাও, দূর হয়ে যাও এখান থেকে। এত নীচ তুমি তা আমি স্বপ্নে ভাবিনি।

লবঙ্গ বলে,

— অনেক হয়েছে কিরণবাবু। যখন সব পরিচয় আপনি মুছেই দিয়েছেন, তখন আর কোন কথাই বলবেন না। ও অপরাধী না নিরপরাধ তা একদিন প্রকাশ পাবেই। এ নিয়ে আপনার কোন মন্তব্য নিষ্প্রোয়জন। এই মুহুর্তে তুই চলে আয় মা।

মিনতি নির্বাক দর্শকের মতো দেখছে। কি করবে সে জানে না। লবঙ্গ ঝিলিককে নিয়ে এসে গাড়িতে তোলে। অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে ঝিলিক। কিরণবাবু ইচ্ছা করেই প্রতাপ কে খবরটা দেননি। এসব সিদ্ধান্ত সে নিজেই নিয়েছে। আর তার কথাই এ বাড়িতে শেষ কথা। তাই ঝিলিককে চলে যেতে হয় এ বাড়ি থেকে।

বিজিত দুপুরে তার অফিস থেকে ফিরেছে বাংলোয়। করুণা বলে,

— স্নান করে নাও, খাবার রেডি। হঠাৎ ফোনটা বাজে।

বিজিত বলে,

— দেখো, হয়তো আমার অফিসের ফোন। ওদের জন্য শান্তিতে খেতেও পারব না।

— আমি ধরছি।

করুণা ফোন তোলে। ওদিক থেকে প্রতাপের গলাটা ভেসে আসে।

করুণা বলে,

— কি রে প্রতাপ? বাড়ির খবর সব ভাল তো? ঠাকুমা — বাবা।

প্রতাপ ওদের কুশল সংবাদ দিয়েই এবার বাড়ির নতুন সমস্যার কথা জানাতে করুণা এবার চমকে ওঠে। প্রতাপ বলে,

— আমি বাবার এত বড় অন্যায়কে মুখ বুজে মেনে নেব না। ঝিলিককে আমার জন্য এতবড় কলঙ্ক সইতে হবে — আমি বাবার কথামতো তাকে ত্যাগ করবো — এহতে পারে না। তাই ঠিক করেছি আমিও বাড়ি ছেড়ে চলে আসবো নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই। আর ফিরবো না। করুণা সব শুনে ফোনটা নামিয়ে গম্ভীর হয়ে যায়।

সে এমন একটা ভয়ই করছিল। সেদিন তাকে না জানিয়ে প্রতাপ এখানে এসেছিল। আর তাদের দুজনকে অবাধ মেলামেশা করে এ বাংলো সে বাংলোতে ঘুরে বেড়াবার ব্যবস্থা করে দেয়।

বিজিত খাওয়া শেষ করে এবার করুণার দিকে চেয়ে বলে,

— কি ব্যাপার, কার ফোন? তখন থেকেই দেখছি মুখ ভার করে বসে আছো। কোন খারাপ খবর নাকি?

করুণা বিজিতের খাবারের সময় কোন কথাই বলেনি। এবার করুণাও বলে,

— তুমি কতবড় সর্বনাশ করেছ আমাদের বাড়ির তা এবার শোন — সেদিন আমি বারবার তোমাকে নিষেধ করেছিলাম — বাবার অমতে কিছু করতে যেও না — তা না শুনে প্রতাপকে এখানে ডেকে আনলে আমাকে না জানিয়ে।

— আরে বাবা, কোন অন্যায় কাজতো করিনি। ওরা তো স্বামী স্ত্রী।

— তা তো বুঝলাম। এখন সামলাও —

— কেন কি হলো?

— যা হবার তাই হয়েছে। ঝিলিক মা হতে চলেছে।

— বাঃ। এতো দারুণ খবর। তোমার বাবার বংশধর আসছে।

— আজ্ঞে না, বংশদন্ড হয়ে গেছে ঝিলিকের কাছে। সে ও মুখফুটে প্রতাপের এখানে আসার কথাটা বাবাকে বলতে পারেনি প্রতাপের জন্য। ফলে এবার বাবা, ঠাকুমাও বিশ্বাস করছে ঝিলিক অন্য কোন ছেলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রাখে। আর তারই পাপের বোঝা ঝিলিক নাকি আমাদের সংসারে আনতে চায়। বাবা তাই ঝিলিককে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চান।

— সেকি! বিজিত অবাক হয়।

করুণা বলে,

— প্রতাপও তাই বাড়ি ছেড়ে দেবে স্ত্রীর জন্য। ঝিলিককে নিয়ে সে অন্যত্র থাকবে।

বিজিত বলে ওঠে,

— দ্যাখো পুরুষের স্ত্রীর জন্য কতবড় ত্যাগ সেটা দ্যাখ করুণা। তোমার জন্যও আমি কত ত্যাগ করেছি তা জানোনা। সাবাস প্রতাপ। যুগ যুগ জিও —

করুণা তিক্ত কণ্ঠে বলে,

— একটা মেয়ের জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। একটা সংসার তছনছ হয়ে যাবে। বাবা ছেলের মধ্যে সংঘাত বাধবে তোমার জন্য আর তুমি মজা দেখবে? এসবের জন্য তুমি দায়ী।

বিজিতও এবার ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারে। সে ভাবছে — এবার বলে,

— সত্যিই করুণা একটা দারুণ প্রবলেম হয়ে গেল। তোমার বাবাও ব্যাপারটাকে ঠান্ডা মাথায় বুঝতে চাইছেন না। ঠিক আছে এই রবিবারেই চলো তোমার বাবার কাছে গিয়ে যা সত্যি তাই বলবো।

করুণাও চেনে তার বাবাকে। ভীতকণ্ঠে বলে সে,

— তারপর কি হবে তা ভেবেছ?

বিজিত বলে,

— তা ভাবতেই শিউরে উঠেছি। হয়তে কিরণবাবুর বন্দুকের এক গুলিতে আমিও ফিনিশ হয়ে যাবো। আর তুমিও বিধবা হবে। হয় হোক — তবু প্রতাপ আর ঝিলিকের জন্য আমরা শহিদ হবো। তবু ওদের সংসারে শান্তি ফিরিয়ে দেব।

করুণা বলে,

— সত্যি আমার ভয় করছে গো।

বিজিত বলে,

— ফরেস্ট অফিসার হয়ে দু - একবার ভালুক - সাপ - বাইসন - মায় বাঘের মুখোমুখি হয়েও বেঁচে গেছি। দেখি এবার রয়্যাল বেঙ্গলের মুখোমুখি হয়ে তোমার শাঁখা সিঁদুরের জোরে বেঁচে ফিরে আসতে পারি কিনা। এই রবিবারই চলো —

ঝিলিক মায়ের সঙ্গে তার বাড়িতে ফিরে এসেছে। প্রতাপও এসেছে সেখানে। আজ সে ও ঝিলিকের এই চরম দুর্দশা দেখে নিজেকেই অপরাধী বলে মনে করে। তারও রাগ হয় বাবার উপর, ঠাকুমার উপরও। ওদের কাছে স্নেহ, মায়া মমতার কোন দাম নেই। বড় হয়ে উঠেছে তাদের নিজেদেরই সেই মিথ্যা অহংকার, বংশ মর্যাদা। তার জন্য ঝিলিককে ও তারা বের করে দিয়েছে — দরকার হলে প্রতাপকেও তারা এই ভাবে বের করে দেবে।

ঝিলিক প্রতাপকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। প্রতাপ বলে,

— এতবড় অপমান সহ্য করে চলে এলে তবু আমার কথাটা জানাওনি?

— ওরা এমন একগুঁয়ে হয়ে উঠলো তখন ভাবলাম তোমার কথা বললে হয়তো তোমাকেও বাড়ি থেকে বের করে দেবে। তোমার এত বড় ক্ষতি করতে পারবো না তাই—

প্রতাপ বিস্মিত হয়।

— তাই তুমি চরম কলঙ্ক মাথায় নিয়ে ঘর থেকে বিতাড়িত হলে? ঝিলিক আমারও কর্তব্য আছে। আমি আমার স্ত্রীর প্রতি অবহেলা করি কি করে। দাঁড়াও বাবা আর ঠাকুমাকে এর উপযুক্ত জবাব দেব। তুমি কোন অন্যায় করোনি। আর সেজন্য আমাকে ঐ বাড়ি ছাড়তে হলে তাও ছাড়বো।

ঝিলিক আজ এত দুঃখ আর অপমানের মধ্যেও যেন একটু স্বান্তনা পায়। ঝিলিক বলে,

— দ্যাখ, তুমি আমায় ভুল বুঝোনা। তবু বলবো বাবা - ঠাকুমার উপর অবিচার করোনা।

এর মধ্যে নিখিলও খবর পেয়েছে যে মেডিক্যাল পরীক্ষার ফল আজ বের হয়েছে। নিখিলও ছুটে আসে মেডিক্যাল কলেজে। এখানে অফিসে তার পরিচিত দু - একজন ছেলে কাজ করে। তারাই বলে,

— নিখিল দা, তোমার জামাই তো দারুণ রেজাল্ট করেছে। মিষ্টি মুখ করাও।

নিখিলও খুশী, বলে

— কাগজপত্রগুলো পারোতো জেরক্স করে দাও, তোমাদের মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা করছি। ওরিজিনালগুলো প্রতাপই এসে নিয়ে যাবে।

ওরাও মিষ্টি মুখের আশায় সে সমস্ত জেরক্স করে দেয় নিখিলকে।

নিখিল সে সব কাগজ নিয়ে রিক্সা করে চলে এসেছে লবঙ্গের কাছে। লবঙ্গও কোর্ট থেকে সকাল সকাল কেস সেরে ফিরেছে। প্রতাপও রয়েছে। নিখিল বাড়িতে ঢুকে প্রতাপের হাতে ওইসব কাগজপত্র দিয়ে বলে,

— প্রতাপ, তোমার রেজাল্টের কপি। মেডিক্যাল বোর্ডের তোমার দুরন্ত ফলাফলের জন্য কনগ্র্যাচুলেশন।

লবঙ্গও খুশী। ঝিলিকও আজ তার সব দুঃখ অপমান ভুলেছে প্রতাপের এই কৃতীত্বে।

লবঙ্গ বলে,

— প্রতাপ। তোমার ইনটার্নশিপ শেষ হবার পরই নিজের ক্লিনিকে বসবে। তার আগেই ওসব তৈরী করতে হবে। মেসিন পত্র যা যা লাগে আনতে হবে। আমার ঐ বাজারের ওদিকে বড় বাড়িতেই তোমার ক্লিনিক হবে। তুমিও কাজে নেমে পড়ো। সঙ্গে তোমার বন্ধু

আরও দুচারজন ডাক্তারকে নেবে। টাকার জন্য ভেবনা — ঝিলিকের জন্য আমার দশলাখ টাকা রাখা আছে। তোমার বাবার ক্লিনিকের চেয়েও ভালো ক্লিনিক করতে হবে।

নিখিল বলে, — তবে কাজ শুরু করে দিই।

প্রতাপ কি ভাবছে। তার মনে হয় বাবাকে পাশের খবরটা দিয়ে প্রণাম করে আসবে ওদের। তাই প্রতাপ বলে,

— বাবা, ঠাকুমার কাছে একবার যাই — পাশের খবরটা ওদের জানিয়ে আসি।

লবঙ্গ বলে,

— নিশ্চয়ই যাবে। আর তোমার নিজের ক্লিনিক খোলার কথাটা জানিয়ে আসবে। একটু ভেবে লবঙ্গ বলে, — তোমার বাবা তো এম বি বি এস।

— হ্যাঁ।

— তুমি হবে এফ আর সি এস, লন্ডন। বাবাকে বলো তুমি এফ আর সি এস পড়তে লন্ডনে যাবে। সব খরচ আমার। তোমার বাবাকেও টেক্কা দিতে হবে।

প্রতাপ যেন স্বপ্ন দেখছে নতুন করে।

কিরণবাবু বসার ঘরে গুম হয়ে ব.সে আছেন। আজ সোমবার। সকালে চেম্বারেও যাননি। দুপুরেও ছটফট করেছেন। মিনতিও চুপ করে গেছে। ঝিলিক সারা বাড়িটা মাতিয়ে রাখতো হৈ চৈ করে। আজ সে নেই — তার ঘর শূন্য। সারা বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করছে। কিরণ নিজের ঘরে। মিনতির মহাভারত পড়াও আজ বন্ধ। নিস্তব্ধ দুপুর — হঠাৎ প্রতাপকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে মিনতি দেবী এগিয়ে আসেন। কিরণবাবু চাইলেন ছেলের দি'কে।

মিনতির মনে হয় এবার প্রতাপকে সব জানাবে। প্রতাপ বাবা-ঠাকুমাকে প্রণাম করে পরীক্ষার ফলের কাগজটা হাতে তুলে দেয়। প্রতাপ এর মধ্যে কলেজে গিয়ে তার পরীক্ষার কাগজপত্র নিয়ে এসেছে এবাড়িতে। কিরণ বলে,

— খুব খুশী হয়েছি প্রতাপ।

মিনতিও খুশী হয়, — তাহলে দাদুভাইও ডাক্তার হলো। কিরে কিরণ বলিনি দাদুভাই ভালো রেজাল্ট করবে।

কিরণ বলে,

— আমি কলকাতায় সব কথা বলে রেখেছি। তুমি বিলেতে যাবে পড়তে। আরও বড় ডাক্তার হতে হবে তোমাকে। কি খুশী তো?

প্রতাপকে একথাটা লবঙ্গ আগেই বলেছে। তার সেই সামর্থও আছে। তাই বাবার এই কথাটা প্রতাপের কাছে নতুন বলে মনে হয় না। বরং মনে হয় বাবা তার নিজের স্বার্থ

সিদ্ধির জন্য প্রতাপকে কিছু ঘুষই দিতে চায়। এবার কিরণ আসল কথাটা বলে,

— ঝিলিক সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে গেছে প্রতাপ। ওকে আর বিশ্বাস করা যায় না। ও এবাড়ির চরম সর্বনাশ করেছে। ওকে নিয়ে তোমারও বিপদ হবে। তাই ওকে আমি ওর মায়ের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। ও আর এবাড়ির কেউ নয়। আমি বলছি ওকে তুমি ডিভোর্স দেবে।

মিনতি দেবী বলে,

— ওরে ও ভালো মেয়ে নয়। অন্য ছেলের সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে। ওর কথা ভুলে যা তুই।

কিরণ বলে,

— ওর মামলা চলে চলুক। তুই বিলেতে চলে যাবি পড়াশোনা করতে। ওই মেয়েকে আর এবাড়িতে আনা যাবেনা।

প্রতাপ এবার বলে,

— ঝিলিককে ত্যাগ করতে হবে আর তার জন্য তোমরা আমাকে বিলেতে পড়ার সুযোগ করে দেবে। তাইনা?

— তোর ভালোর জন্যই বলছি।

— বাবা বিলেতে পড়তে আমি যাচ্ছি। আর তার জন্য কোন মতে আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করার প্রশ্ন ওঠে না। সে কোন দোষ করেনি, তা আমি জানি। তাই স্ত্রীকে ত্যাগ করার কথা আমি ভাবতে পারিনা বাবা।

কিরণ অবাক হয়ে যায় ছেলের কথায়। সে বলে,

— প্রতাপ!

— বাবা। এতদিন আপনার কথামতো আমাকে চলতে হয়েছে। মুখ বুঝে অনেক কিছু মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। আজ নিজের ভালোমন্দ ভবিষ্যৎ সব কিছু গড়ে তোলার মত শক্তি আমার হয়েছে। এবার আমার পথেই আমাকে চলতে দিন।

মিনতি বলে,

— ওরে প্রতাপ। বাবার কথা শোন। এত সব বিষয় আশয় টাকা বিলেতে পড়ার খরচা।

প্রতাপ বলে,

— তোমাদের কাছে কিছুই আর আমি চাই না। কোন প্রত্যাশাই আমার নেই। তাই তোমাদের শর্ত মানার প্রয়োজন আমার নেই। আমাকে আমার নিজের পথেই চলতে দাও বাবা। ঠাকুমা চলি —

প্রতাপ ঠাকুমাকে প্রণাম করে বের হয়ে যায়। কিরণ ভাবতে পারেনি যে প্রতাপ

তাকে এইভাবে জবাব দিয়ে যাবে। মিনতি কান্নায় ভেঙে পড়ে,

— ওরে কি সর্বনাশ হলো রে। একমাত্র ছেলেটাও পর হয়ে গেল। একি করলে ঠাকুর!

সারা বাড়িতে স্তব্ধতা নেমেছে। বিজিত করুণারা এসে পড়ে। মিনতি ওদের দেখে আরও জোরে কাঁদতে থাকে।

— ওরে করুণা, ভাই বিজিত। সারা বাড়ি আমার শূন্য হয়ে গেছে। প্রতাপ ডাক্তারী পাশ করে চলে গেল এবাড়ি ছেড়ে। ঝিলিককে প্রতাপের বাবা ওর মায়ের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে — ও মা হতে চলেছে। ও মুখপুড়ি এই বাড়ির মুখ পুড়িয়েছে।

করুণা বিজিতের মধ্যে চোখাচোখি হয়। বিজিত বলে,

— ঝিলিক প্রতাপ সবাই চলে গেছে এবাড়ি থেকে?

কিরণ ওদের আসতে দেখে ছুটে এসেছে। সে বলে,

— হ্যাঁ। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ভালো। তাই ওদের চলে যাওয়াতে কোন দুঃখ পাইনি আমি। বরং এ বাড়ির মান সম্মান বেঁচেছে।

করুণা বলে,

— না, বাবা। তুমি ঠাকুমা দুজনেই মস্ত ভুল করেছো। ঝিলিক নির্দোষ — দোষ যদি কিছু করে থাকে সে প্রতাপ আর তোমার নাত জামাই। ঝিলিকের কোন দোষ নেই। তোমরা এবাড়ির প্রকৃত বংশধরকে, এ বাড়ির নিজেদের উত্তরাধিকারীকে তুমি বঞ্চিত করে, চরম অপমান করে কলঙ্কের ভাগী করেছ।

— কি বলছিস করুণা। এ বাড়ির বংশধর!

কিরণও ধাঁধায় পড়ে। বলে,

— কি বলতে চাস করুণা?

প্রতাপের ফোনে আমি সব শুনে ওখান থেকে ছুটে এসেছি তোমার জামাইকে নিয়ে। ও এর জন্য দায়ী।

করুণা এবার বিজিতকে বলে,

এবার বিজিতই বলে সেই অতীতের কথা।

— আমিই ঝিলিককে এখান থেকে ঘাটশিলায় নিয়ে যাবার পর প্রতাপকে কদিনের জন্য ওখানে যেতে বলেছিলাম — ওরা দুজনে একটু মেলামেশা করতে পারে। বিয়ের পর তো কোথায়ও যায়নি। তাই — আর, ইয়ে মানে প্রতাপই হোস্টেল থেকে মাঝে মাঝে এবাড়িতে রাতে আসতো।

মিনতি অবাক হয়।

— ওমা! ওরে কিরণ শুনেছিস? তাহলে ঠিকই দেখেছি — ওই ছোঁড়াই সেই রাতে

মাধবীলতা বেয়ে পালিয়েছিল। আর দুজনে কালাপাহাড়ের বাংলোতে থেকেছে। ওরে করুণা এসব কথা আমায় আগে বলবিতো। আর, প্রতাপ তো পড়াশোনার ত্রুটি করেনি। ওটা বয়সের দোষ। ঘি — আর আগুন। না জেনে শুনে একি সর্বনাশ করেছিসরে কিরণ।

কিরণ গুম হয়ে বলে,

— এসব কথা আমাকে কেন জানাওনি? বিজিত —

— আজ্ঞে, আপনার বন্দুকের ভয়ে। যদি গুলিটুলি করে দেন। সত্যিই খুব অন্যায় হয়ে গেছে। যদি এবারের মত আমাদের মানে আমি আর প্রতাপ ও ঝিলিককেও মাফ করে দেন। আমিই যাচ্ছি প্রতাপ — ঝিলিকের কাছে।

কিরণ কি ভেবে বলে,

— চলো আমিও যাবো। আমাকেও যেতে হবে ওদের কাছে। সত্যিই একটা ভুল করে ফেলেছি হে। ভুল তোমরা নয় — আমিই করেছিলাম, আজও করেছি। ঘরের মানুষকে বাইরে ঠেলে অন্যায় করেছি।

বেলটা বেজে ওঠে।

ঘরে ঢোকে বিনু সঙ্গে ডি. এম সাহেব। কিরণ অবাক হয় ডি. এম সাহেবকে দেখে।

— আপনি! আসুন - আসুন —

ডি. এম বলে,

— স্যার, কলকাতা থেকে চিফ মিনিস্টার ম্যাসেজ পাঠিয়েছেন আপনি এবার হেলথ্ মিনিস্টার হচ্ছেন। দু'তিনদিনের মধ্যে গিয়ে আপনি আপনার চার্জ বুঝে নেবেন।

ফ্যাক্স বার্তাটা কিরণের হাতে তুলে দিয়ে এবার ডি. এম সাহেব শুভেচ্ছা জানায়।

— কনগ্র্যাচুলেশান স্যার। এই জেলা থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রী হলেন আপনিই প্রথম। বেস্ট অবদি লাক স্যার।

খবরটা এর মধ্যে শহরেও ছড়িয়ে পড়েছে। ফোন আসছে, আসছে শহরের বহু গণ্যমান্য লোক। কিরণ বেরিয়ে পড়েছে। রেডিও টিভিতে খবরটা প্রচার করা হয়েছে।

লবঙ্গের বাড়িতে তখন ওদের জরুরী আলোচনা চলছে। প্রতাপ — লবঙ্গ — নিখিল — ঝিলিকও রয়েছে।

হঠাৎ দুতিন খানা গাড়ির শব্দ শুনে ওরা চাইল। দেখে শোভাযাত্রা করে আসছে কিরণ — মিনতি — বিজিত — করুণা। লবঙ্গ ওদের দেখছে।

মিনতি ঝিলিককে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

— ওরে না জেনে না শুনে তোকে যা — তা বলেছি ঝিলিক। আমাদের মাফ করে দে ভাই। আর প্রতাপ এত চুরি ডাকাতি করার সাহস হলো, আর সত্যি কথাটা আমাকে জানাতে

পারলি না ? বিজিত - করুণা না এলে কি যে হতো! সব শুনেছি, এবার ঘরে চল ভাই —

লবঙ্গকে বলে কিরণ,

— মিসেস গাঙ্গুলী, আমি হেরে গেছি আপনার কাছে — তাই মাথা নীচু করে এসেছি। আর বৌমা ছেলেকে ঘরে ফিরে যেতে বলুন। আমি — মা ওদের নিতে এসেছি। আজ আমি সত্যিই আপনার কাছে হেরে গেছি। তাই আর লড়াই নয় — এবার চাই প্রীতির সম্পর্ক গড়তে।

লবঙ্গ আজ দীর্ঘ লড়াইয়ের পর সত্যিই জিতেছে। কিরণ নিজে তার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে। আজ লবঙ্গ শান্তি চায়, তার মেয়েকে সুখী দেখতে চায়। লবঙ্গলতিকা আজ এতদিন পর লড়াই করে বিজয়িনী হয়েছে। তার চিরশত্রু কিরণ আজ মাথা নীচু করে তার কাছে এসেছে, তার ছেলে বউকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

লবঙ্গ বলে,

— তাহলে কিরণবাবু যুদ্ধ শেষ।

মিনতি বলে,

— হ্যাঁ, মা। অনেক যুদ্ধই হয়েছে। এবার শান্তি ফিরে আসুক। চল ঝিলিক, ঘরে চল ভাই। ওরে কিরণ তোর দাদুভাই এর জন্য তুই মন্ত্রী হয়েছিস।

বিজিত — করুণাও খুশী। বিজিত বলে,

— তাহলে অল কোয়াইট ইনদি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট।

কিরণের আজ সম্বর্ধনা সভা। সারা শহরের লোক ভেঙ্গে পড়েছে এই সভায়। দেখা যায় মঞ্চে শহরের নামী দামী লোকেদের মাঝে বসে আছে লবঙ্গলতিকা। কিরণবাবুর সম্বর্দ্ধনা সভায়। ওই দুই চিরশত্রুর মেলবন্ধন দেখে লোকে অবাক হয়।

নিরাশ হয় কেশববাবুর দল। তাদের তরজার লড়াইও থেমে গেছে — দুজনার মধ্যে লড়াই বাধিয়ে কিছু আমদানীর যে পথ ছিল তাদের, তাও বন্ধ হয়ে গেল। লবঙ্গ-লতিকা মঞ্চে তখন কিরণ ডাক্তারের কর্মকুশলতার ফিরিস্তি দিয়ে চলেছে। দর্শকের আসনে বিজিত — করুণা — ঝিলিক ও প্রতাপ রয়েছে। বিজিত বলে,

— **কি ভায়া, এখনো কি প্রবলেম ? দেখলে তো আমার খেলা —**

সমাপ্ত